

বাংলাদেশ:
গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

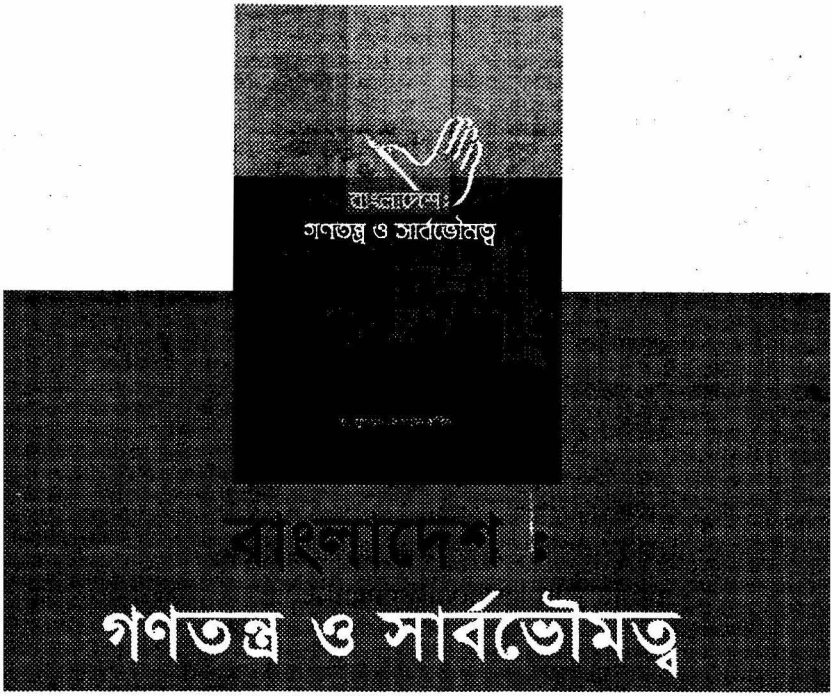

বাংলাদেশ : গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা
প্রত্যয় প্রকাশনী

www.amarboi.org

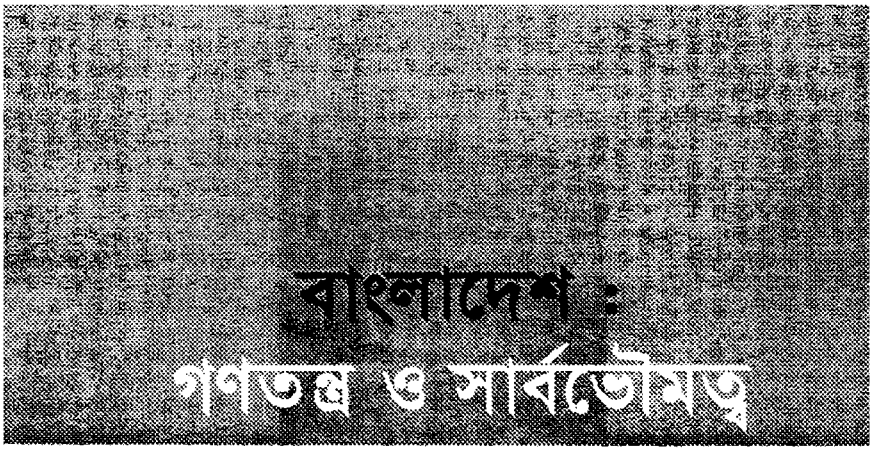

প্রকাশক
মু. আতাউর রহমান সরকার
প্রত্যয় প্রকাশনী
৬৫, নিউ সার্কুলার রোড (৪র্থ তলা)
মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা।
টেলি ও ফ্যাক্স : ৯৩৩৯২৪৬, ০১৬৮৪-৫১১৬৬৮
prottoyprokashoni@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ১০আগস্ট ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ:
দিগন্ত প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
১৬৭/২-ই ইনার সার্কুলার রোড
মতিঝিল, ঢাকা।

বিনিময় মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র।

www.amarboi.org

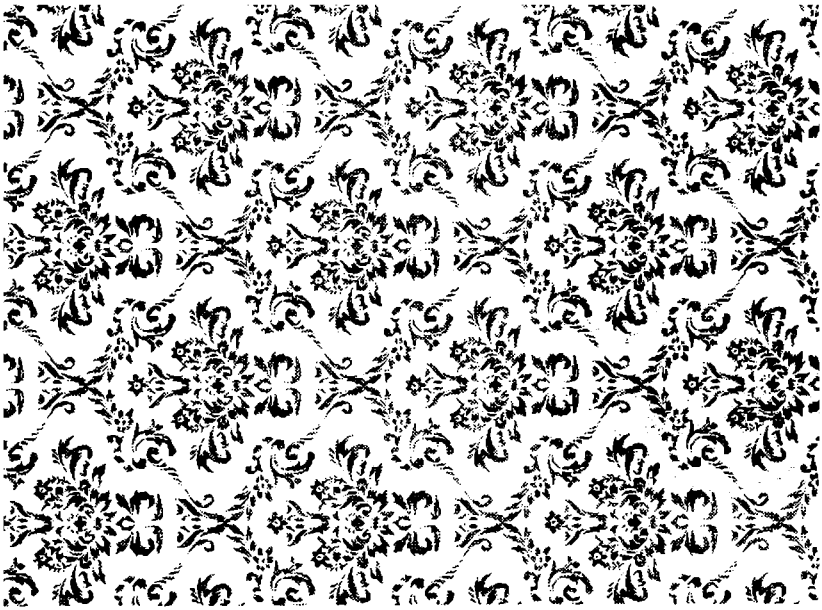

আমার পরম শ্রদ্ধেয়
আব্বার জন্য
মহান আল্লাহ রাব্বুল
আলামীনের কাছে
জান্নাতের সর্বোচ্চ
মর্যাদা কামনা করছি

www.amarboi.org

মুখবন্ধ

পৃথিবীতে সব পরিবর্তন করা যায় কিন্তু ইতিহাস পরিবর্তন করা যায় না। যদিও অনেক মানুষই ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত। আমাদের সামনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনাই কোনো না কোনোভাবে ইতিহাসেরই খণ্ডিত অংশ। সে হিসেবে চলমান প্রতিটি ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। আর সে সময়টি যদি হয় আলোচিত সমালোচিত, অথবা দুঃশাসনের ইতিহাস, তাহলে তো কোন কথাই নেই। বর্তমানে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি সেই সময় অতিক্রম করছে।

একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব অনেক, সেই দায়িত্ববোধ আর সোনার বাংলা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে এই সামান্য লেখাজোখা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলোকে এক জায়গায় করে প্রকাশ করার তাগিদ দিয়েছেন অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠকবৃন্দ! তাই আজ তাদের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি-আলহামদুলিল্লাহ। আর এই দুরূহ কাজটিকে বই আকারে আলোর মুখ দেখিয়েছেন প্রত্যয় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আতাউর রহমান সরকার। তার জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম পুরস্কার কামনা করছি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, প্রিয় ভাই আশরাফুল আলম, আবদুর রহমান, আব্দুল বাশির, বাদল, আবুল কালাম খানসহ সবাইকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং সুন্দর প্রচ্ছদ আঁকার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন রইল প্রিয় ভাই শিশিরের প্রতি। আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাদের সময় ও সহযোগিতায় এই কাজটি সফলতার মুখ দেখেছে। লেখাগুলো বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতির আলোকে রচিত বলে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সেই দিকটি মাথায় রেখে অধ্যয়ন করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

সর্বোপরি বইটি পড়ে যদি কেউ সামান্যও উপকৃত হন তাহলেই আমাদের কষ্টের সার্থকতা মিলবে। ভালোর কৃতিত্ব আমাদের সকলের আর ত্রুটিবিচ্যুতির সকল দায়ভার একান্ত-ই আমার। আল্লাহ হাফেজ।

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম
mrkarim_80@yahoo.com

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আমাদের দেশ আজ এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসনে দেশবাসী আজ নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। হত্যা, ষড়যন্ত্র, নির্যাতনে মানুষ আজ শঙ্কিত। গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় মানুষ আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত। চরম নিরাপত্তাহীন এই জনপদের প্রতিটি প্রান্তরে সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, লাঞ্ছিত বোনের কান্না মানবতাকে বিরাট এক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। হত্যা, খুন, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, নির্যাতন, ছিনতাই নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। দেশ গড়ার কারিগর যুবসমাজের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ভারতীয় পৌত্তলিক সংস্কৃতির অবাধ আমদানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস, নামাজী ও হিজাব পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ থেকে বের করে দেওয়া ও নামাজ কক্ষে তালা, মসজিদে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে চরম নৈরাজ্য। সিট দখল ও হল দখলসহ টেন্ডারবাজির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ শিক্ষাঙ্গনে নারকীয় পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। দেশের প্রথিতযশা আলেমদের ওপর সরকারি নির্যাতন পরিচালনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমকে দলীয় প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার ভারতীয় বাহিনীর হামলায় প্রতিনিয়ত প্রাণ দিচ্ছে বর্ডার গার্ড সদস্য ও সাধারণ জনতা। আমাদের বোন ফেলানীকে হত্যা করে কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা ঘটেছে। দেশের এই চবম ক্রান্তিকালে একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সহকারী সম্পাদক সময়ের সাহসী সন্তান ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম যে কলাম লেখেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তার লেখার সবগুলোকে একত্রিত করে বর্তমান সময়ে মানুষের সামনে পেশ করার মাধ্যমে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জাতি জানার সুযোগ পাবে। সে দায়বদ্ধতা থেকে এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করবো এ বইটি অধ্যয়নের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর জুলুম নির্যাতন সম্পর্কে দেশবাসী অবহিত হবেন। পাঠকই আমাদের শক্তি, পাঠকই আমাদের প্রেরণা। আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে দেশপ্রেমিক মানুষকে সামান্য খেদমতও যদি আমরা করতে পারি এতেই আমাদের সার্থকতা। বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তারপরও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, আমরা পরবর্তীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো। মহান আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

মু. আতাউর রহমান সরকার
ataur.sarker@gmail.com

www.amarboi.org

সূচিপত্র

- বাংলাদেশ : গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব ১-২৬
- সিন্ডিকেট নিউজ কার স্বার্থে? ২৭-৩৪
- মহাজোট সরকারে বামদের অদৃশ্য দাপট ৩৫-৪০
- ইসলাম ও গণতন্ত্র রক্ষার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ৪১-৪৮
- জনমনে ক্রুসেডার আতঙ্ক: দেশে বিদেশে সমালোচনা ৪৯-৫৫
- একজন ভাষাসৈনিকের কারাবাস ৫৬-৬৩
- ভারতের নগ্ন সংস্কৃতির করাল গ্রাসে আক্রান্ত তরুণ প্রজন্ম ৬৪-৭০
- হতাশার তরীতে ভাসছে আওয়ামী লীগ ৭১-৭৬
- সত্য প্রকাশ যেন বন্ধ না হয় ৭৭-৮১
- এবার ছয় সাংবাদিককে পেটাল ছাত্রলীগ ৮২-৮৯
- আমরা স্বাধীন দেশের বন্দী নাগরিক ৯০-৯৬
- মহাজোট সরকারের শুরুতেই যেন গলদ ৯৭-১০২
- মুসলমানরাই কি যত সমস্যার মূল? ১০৩-১০৭
- ঢাবি ভিসি মহোদয় পিতার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করলেন! ১০৮-১১১
- জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের কলামের ওপর কিছু কথা ১১২-১১৮
- বেপরোয়া ছাত্রলীগ দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠেঙানোই আসল টার্গেট ১১৯-১৩৩
- সত্যপন্থীরাই যেন অপরাধী ১৩৪-১৩৭
- মুজিবের বাকশাল আর নিজে প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার নিরাপদ কৌশল ১৩৮-১৪৪
- মোহাম্মদ (সাঃ) কে কটাক্ষ করার আসল হেতু কী? ১৪৫-১৫১
- পরমসহিষ্ণুতায় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি ১৫২-১৫৫
- কুরআনের আন্দোলন জুলুম নির্যাতন চালিয়ে স্তব্ধ করা যায় না ১৫৬-১৬০
- মহাজোটে মহা-বিপদ সংকেত ১৬১-১৬৪
- যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল: বিতর্ক দেশে-বিদেশে ১৬৫-১৭৪
- আক্রোশের রাজনীতির শেষ কোথায়! ১৭৫-১৮০
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার: রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব ১৮১-১৮৮
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের তথাকথিত জ্ঞান ও নতুন প্রজন্ম ১৮৯-১৯৪
- সংবিধান সংশোধনী : সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের সবক ১৯৫-২০১

www.amarboi.org

বাংলাদেশ : গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব

ভূমিকার পরিবর্তে

সার্বভৌমত্ব যা ইংরেজিতে SOVEREIGNTY ল্যাটিন Suparanus হতে আগত। এর অর্থ চরম ক্ষমতা। Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছেঃ Sovereignty, in political theory, the ultimate over-seer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order.

OXFORD DICTIONARY তে বলা হয়েছে : Complete power to govern a country; the county claimed Sovereignty over the island; the Sovereignty of parliament; the idea of consumer Sovereignty; the state of being a country with freedom to govern itself; The declaration proclaimed the full Sovereignty of the republic.

আমেরিকার খ্যাতনামা অধ্যাপক বার্জেস বলেন, "সার্বভৌমত্ব হচ্ছে প্রত্যেক প্রজা ও প্রজাদের সকল প্রকার সংঘের ওপর মৌলিক, চরম, অসীম ও সর্বাত্মক ক্ষমতা। "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের আদেশ দেওয়ার এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।" সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য, যার জন্য ইহার নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার দ্বারা আইনত ইহাকে বাঁধা যায় না এবং নিজের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি দ্বারা সীমিত করার যায় না। ব্লেক স্টোন ইহাকে চরম অপ্রতিরোধ্য শর্তহীন সীমাহীন কর্তৃত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পোলক এর মতে, সার্বভৌমত্ব সেই ক্ষমতা যা সাময়িক নহে, যা অন্য কারো নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা নহে, যা এমন কোন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে যা রাষ্ট্র বদলাতে পারে।

মূলত মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই ভূমি ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি ও বিরোধের সূচনা ঘটে। ভূমিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এ লড়াই কালক্রমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ যখন রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শুরু করে ঠিক তখন থেকেই মূলত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্বের জন্য দেশে দেশে আন্দোলন-সংগ্রাম, যুদ্ধ, রক্তপাত, সংঘর্ষ চলে আসছে। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই তামাম দুনিয়ার যিনি স্রষ্টা তিনিই সার্বভৌমত্বের প্রকৃত মালিক এবং রক্ষক। আর এর উপেক্ষা করাই যত সমস্যার মূল। আন্তর্জাতিক আইনের আদি গুরু হুগো গ্রোসিয়াস এর নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, ইহা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, যার কোন কার্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। রাষ্ট্রযন্ত্র যখন কোন দিক থেকে দুর্বল অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের নীতি বা Pollicy র-নিকট হেরে যায় বা নতিস্বীকার করে তখন-ই সার্বভৌমত্ব মানে চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কথাটি

www.amarboi.org

চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। তখন এই সার্বভৌম রাষ্ট্র তার আসল রূপ, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। আর এমন রাষ্ট্রকে-ই উপাধি দেয়া হয় নতজানু রাষ্ট্র বা নতজানু পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে। আসলে রাষ্ট্র অনেকটা মানুষের শরীরের মতই। মানুষের শরীর যখন রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখনি নানা রোগব্যাধি শরীরকে আক্রান্ত করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখননি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো দানবের মত আক্রমণ চালায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবির মতে, "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা দারুণভাবে আক্রান্ত। এদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা এখন তথাকথিত সমাজপতি, মিডিয়া, এনজিও, একশ্রেণীর প্রগতিশীল আর সুশীলদের উপর ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একথা আজ অনেকেই বলে থাকেন এদেশের প্রায় সব সেক্টরেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত কেনা গোলাম রয়েছে। এটা দেশের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়াবহ হুমকি। মূলত একটি দেশের সার্বভৌমত্ব যদি বহিরাষ্ট্রের আক্রমণের মুখে পড়ে যায় তাহলে সেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রজাতন্ত্রের কোন কিছুই তার আসল লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।

এছাড়া মানব জীবনে কার সার্বভৌমত্ব কার্যকর হবে তা নির্ধারণের ভিত্তিই রাষ্ট্র দর্শন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য বিষয়-ই আমাদের রাষ্ট্রে উপেক্ষিত। সেটি নির্ধারণ না করে শতাব্দী কাল চেষ্টা করেও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব জীবন ঐশী সার্বভৌমত্বের অধীন, না মানবীয় সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। যদি ঐশী নির্দেশ হয় তাহলে এর পদ্ধতি কিভাবে মানব সমাজে প্রচারিত ও কার্যকর হবে, তা বিবেচনা করতে হবে। আবার মানবীয় সার্বভৌমত্বের অধীন হলে তার রূপরেখাই বা কী হবে অর্থাৎ সেই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা প্রয়োগকারী কে হবে? তিনি কি একক ব্যক্তি হবেন, না কোন গোষ্ঠী হবে। এদের নিয়োগকর্তাই বা কে হবেন। কিসের ভিত্তিতে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শক্তি বিবেচনায় আনা হবে অথবা সাধারণ জ্ঞান অথবা অলৌকিক অথবা বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান বিবেচনায় আনা হবে। এই সব কিছুর ওপরই নির্ভর করছে সার্বভৌমত্বের প্রকৃত শক্তি এবং এর অবস্থান ও অবস্থিতি। কিন্তু এই সার্বভৌমত্ব কার নির্দেশে চলবে আল্লাহ সে সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন, "ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ" জমিন যার আইন চলবে তার। তা যদি না হয় তাহলে বন্য প্রাণীয় ন্যায় এখানে সংঘাত অনিবার্য।

রাষ্ট্র নিজেই একটি সত্তা। এই সত্তার রয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও শক্তি। এই অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস তার অতীত ইতিহাস। আমাদের ইতিহাস অনেক গৌরবের। অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত আবার অনেক বেদনাবিধুরও বটে। এই জনপদের মানুষের ইতিহাস অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। এই বিস্ময়কর সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নিকট-অতীতে এখানে আর্যদের আগ্রাসন, ইংরেজদের শোষণ

www.amarboi.org

আর এদেশীয় মিরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবেলায় তীব্রতর লড়াই হয়েছে। প্রাণ দিয়েছে বটে মান বিকিয়ে দেয়নি।

এই জাতি রক্তে মাংসে সংগ্রামী, অস্তিত্বে স্বাধীনচেতা আর মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। কিন্তু এই চেতনা ও মূল্যবোধের ওপর আঘাত হয়েছে অসংখ্যবার। এই আঘাতের যাত্রা ১৬৩৪ সালে বাংলায় বাণিজ্য করার নামে ব্রিটিশ বেনিয়ারা এখানে এসে ইঙ্গ-হিন্দু মৈত্রী গড়ে তুলে মূলত মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এরই অংশ হিসেবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন, আর এদেশীয় মিরজাফর ও ঘসেটি বেগমদের অন্যের নিকট মাথা বিক্রি করে এই জনপদে যে বিভক্তির বীজ বপন করেছে তা আজ অঙ্কুরিত হয়ে বিভক্তির অনেক ডালপালা গজিয়েছে। সেই কালো রেখা আমাদের জাতীয় ঐক্যের মাঝে বিভেদের রেখাকে স্পষ্টভাবে আজ এখানে টেনে দিয়েছে। এই বিভক্তি রেখার এপাশ-ওপাশ ছিল এতদাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান। যদিও উগ্রতা ও জঘন্যতার পেছনে উগ্রবাদী হিন্দুরাই শতভাগ দায়ী।

কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এখানে অনেক দীর্ঘসময় যেমনি মুসলমানরা শাসন করেছে, আবার ১৯ শতকের প্রায় সকল আন্দোলন ও ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে হয়েছে, যেমন-ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, সানুসি আন্দোলন, ফুলানি আন্দোলন, ফাদুরী আন্দোলন, মুহাম্মদী, মাহদী আন্দোলন, তীজানিয়া আন্দোলন, জিহাদী আন্দোলন, আহলে হাদিস আন্দোলন, বেরলভী, সালাফী ইত্যাদি মুসলিম চেতনাসম্পন্ন আন্দোলন।

১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তানেরও বিভক্তি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। যদিও এখন ভারত এই চেতনা ইতিহাস থেকে মুছে দিতে সবচেয়ে বেশি তৎপর। আমাদের '৫২র ভাষা আন্দোলনও এদেশের ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আবার বঙ্গভঙ্গ রদের চেতনায় উজ্জীবিত উগ্রবাদী হিন্দুরা এখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ধর্মীয় মূল্যবোধ আর ইসলামী সংস্কৃতি, রাজনীতি, তাহজিব তমদ্দুনের বিরুদ্ধে আঘাত করে মুসলমানদের বিশ্বাস ও চেতনার শিকড় উপড়ে ফেলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংবিধানে যোগ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উঠিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস, শিক্ষানীতির নামে ধর্মবিমুখ নতুন সেক্যুলার প্রজন্ম তৈরি, নারীনীতির নামে পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের পরিবারপ্রথা ভেঙে দেয়া, ভয়াবহ অপসংস্কৃতির ছোবল, আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে প্রহসনের নাটক সাজিয়ে ইসলামী আন্দোলন ও নেতৃত্বকে নিঃশেষ করে ভারত এদেশে তাদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেজন্য তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা আর গভীর অন্ধকারের দিকে।

পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের জায়গা যত ছোটই হোক জাতি হিসেবে ইতিহাসে আমাদের স্থান ঈর্ষনীয়। স্বাধীনতা একটি জাতির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এই

www.amarboi.org

আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত সূচনা হয়েছিল পলাশীর প্রান্তরে আর সমাপ্তি হয়েছিল অনেক আত্মদান, ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা যে স্থান অধিকার করেছি তার মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য ছিল জাতি হিসেবে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বহাল রেখে আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হওয়া। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ৪০ বছরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রাপ্তির হিসাব কষতে গিয়ে আমরা হতবাক ও বিস্মিত আবেগাপ্লুত। মাত্র নয় মাসের সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। যেখানে ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লাভ করতে লাগে ২৬ বছর। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে চল্লিশ বছরের ওপর আন্দোলন করে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ফরাসি শক্তির বিরুদ্ধে নয় বছর ধরে লড়াই করে আলজেরিয়া পায় স্বাধীনতা। ইরেত্রিয়া রক্তাক্ত সংগ্রাম করে আজও ইথিওপিয়া থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারেনি। কাশ্মীরসহ ভারতের অনেক রাজ্য অব্যাহত রেখেছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বের ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের যে কয়টি অপরূপ স্বকৃতি পৃথিবীর মানচিত্রে ঈর্শ্বনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা আমাদের স্বাধীনতা লাভের আগেও বিশ্ববাসীর অজানা ছিল না।

বাংলাদেশের এই অপার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন এক বাক্যে প্রায় সকলেই। বাংলাদেশ এক সুমহান ঐতিহ্যের প্রশংসায় বিদেশীরা উচ্চকিত হয়েছেন। খ্রিষ্টাব্দ পূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রিক ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস বাঙালির রণসম্ভার, বিশেষত যুদ্ধহস্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আবার সতের খ্রিস্টাব্দের শেষে মির্জা নাথান বাহারিস্তান-ই গায়েবিতে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খার নৌবহরের তারিফ করেছেন–যে নৌবহরের অবস্থান ঢাকায়। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ডিগবী সাহেবের অভিমত ছিল বাংলাদেশ ব্রিটেনের চাইতে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী। খ্রিস্টজন্মের পূর্ব থেকে বাংলাদেশ শৌর্য-বীর্য ও সমৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিশ্রুত। প্লিনি, টলেমি, প্লুটার্ক, ডায়োডোরাস প্রমুখ গ্রিক ধ্রুপদী ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক কালের রুশ ঐতিহাসিকগণ এ তথ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুপ্ত শাসনাধীনে আসে। গুপ্তদের সময় এ দেশে এক উন্নত সভ্যতা, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা এবং জনসাধারণের মধ্যে অর্থ প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসবেত্তা টলেমি বলেছেন, গঙ্গে বন্দরের নিকট ছিল সোনার খনি। "নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা আর ফরিদপুরের সোনারং, সোনারগাঁ, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস সম্ভবত জড়িত। এই সব জনপদের নদীগুলিতে প্রাচীনকালে বোধ হয় গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা পাওয়া যেত।"মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন (১৫৩৮ খ্রিঃ)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদাবলি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হন এবং এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। এই জান্নাতাবাদ-ই যুদ্ধ পরবর্তীতে পরিণত হলো

www.amarboi.org

নরকে।

তাইতো বিদেশী শকুনদের এই লোলুপতা এখনো আমাদের সোনার বাংলার প্রতি আর ব্রিটিশদের দু'শো বছরের গোলামি শাসন, পাকিস্তানিদের শোষণ, আর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছিল একই সূত্রে গাঁথা। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত হাঙ্গরের মত তার আসল চরিত্র নিয়ে হানা দিচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর। এর অন্যতম কারণ আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি। ভারতের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা অবশ্য আওয়ামী লীগের ঐ নেতারাই বেশি প্রকাশ করেন, যারা যুদ্ধ না করে মুন্সিয়ানার মত ভারতে পালিয়ে লজিং ছিলেন। এই জন্য অনেক আওয়ামী লীগারদের-ই সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ভালো লাগে না, মহাজোটের এক মন্ত্রীতো সেদিন বলেই ফেললেন "ভারত ও বাংলাদেশ চেতনায় এক ও অভিন্ন।"

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলমন্ত্র হবে গণতন্ত্র। এটি সংবিধানে খচিত হলেও দেশ পরিচালিত হয়েছে কখনও একনায়কতন্ত্র তথা বাকশাল, কখনো সামরিক জান্তা, আবার কখনো স্বৈরশাসনের অধীনে। অনেক আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের অবসান হয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হলেও জনগণের চাহিদার সত্যিকারের প্রতিফলন এখনো ঘটেনি। কারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় এগিয়ে যাওয়া এই অপরূপ ও অবারিত সম্ভাবনার বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ও বহিঃবিশ্বের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বিভক্তি, হিংসা, বিদ্বেষ ও নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি পরিবারতন্ত্র ও অনৈতিকতার সুযোগকে পুঁজি করে ষড়যন্ত্রকারীরা এগিয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। আর দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যতটুকু; তার থেকে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে এদেশের মিরজাফরদের উত্তরসূরিদের কারণে।

যারা আমাদের কলোনিভুক্ত করে ভিক্ষাবৃত্তি ও ঋণের ভোক্তা করে রাখতে চায়, তাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে বারবার। চারদলীয় জোটের সঠিক ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের অভাব এবং পরিকল্পিত মিডিয়া আগ্রাসন ও কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিবর্জিত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে "দিন বদলের বাংলাদেশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্ন-জাগানিয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ১৩তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৬ জানুয়ারি ৩২ সদস্যের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। মহাজোট সরকার জাতির কাছে স্বপ্নের এক উঁচু পাহাড় দাঁড় করিয়েছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ, দিন বদলের বাংলাদেশ ইত্যাদি স্বপ্নাতুর শ্লোগানের মাধ্যমে।

কিন্তু বিজয়ের ৪০ বছরেও বাংলাদেশ একটি 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি, ফলে জনগণের অধিকাংশের জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা

www.amarboi.org

সাংস্কৃতিক মুক্তি রচিত হয়নি। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা যে শ্রেণীটির হাতে করতলগত হয়, সেই শ্রেণীটির অন্তর্নিহিত অগণতান্ত্রিকতাই এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে সক্রিয় থেকেছে-রয়েছে এখনো। স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো সরকারই, কি দলীয় কি নির্দলীয়, কি সামরিক-কি বেসামরিক, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের জনস্বার্থপরায়ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের অনুকূলে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আসল বিষয় হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ও এর মালিকানা নির্ধারণ-ই আজ যেন মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। মানুষ আজ প্রভুর আসনে আর মালিককে বানিয়েছে ভৃত্য। এই করুণ অবস্থা আজ মানবতার।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের মাধ্যমে দেশ থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার এক গভীর নীলনকশায় মেতে ওঠে বর্তমান সরকার। কিন্তু দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সোচ্চার আন্দোলনের ফলে সরকার জায়গা থেকে হটতে বাধ্য হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর আইনমন্ত্রীর কথা অনুসারে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পরও যদি সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকে এবং রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল থেকে যায়; তাহলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ হওয়ার কোনো যুক্তি বা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদি রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় ও একই সাথে সংবিধানে বিসমিল্লাহ রাখা হয় এবং রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল থাকে তা হবে স্ব-বিরোধিতা। এর অর্থ আদালতের রায় যাই হোক এবং সরকার মুখে যাই বলুক পুরোপুরি বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব কি? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ভারতসহ ইসলামবিদ্বেষী দেশগুলোকে তুষ্ট করার জন্যই সরকারের এই ধনুকভাঙা পণ।

এই জন্য সংবিধান সংশোধন করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। উঠিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী শুধু রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগেরই নন, আইনসভা তথা জাতীয় সংসদেরও প্রধান নেতা। অন্যদিকে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আপন আপন রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তের বাইরে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে, জাতীয় সংসদে উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবের ওপর, কিংবা প্রস্তাবিত আইনের ওপর, ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন না। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবের জন্যে ২০১০ সালের জুন মাসে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি' গঠন করা হয়। সেই কমিটি দেশের 'বিশিষ্ট নাগরিকদের' সঙ্গে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন, যেখানে প্রায় সকলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অক্ষত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত এমনকি সংসদীয় কমিটির লীগ

www.amarboi.org

সদস্যরাও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, ২০১০ সালের ৩১শে মে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা উল্টে দেন। (নিউ এইজ ১লা জুন-২০১১)

পরবর্তীকালে, ২০১১ সালের ৩০শে জুন, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান উপড়ে ফেলে রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তন করা হয়। এই বিধানটি উপড়ে ফেলার প্রক্রিয়ায়, দেখা যাচ্ছে, শেখ হাসিনা দেশের সকল বিরোধী দল, ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, তার আপন দলের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ, সমাজের 'বিশিষ্ট' নাগরিকবৃন্দ এবং সর্বোপরি, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে আপন মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এ কথা কে না জানে যে, দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কোন সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। দলীয় প্রধানগণের ক্ষমতা সেখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের অধিকর্তার মতোই অপরিসীম। অর্থাৎ অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিলেমিশে এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র একই ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রধান, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান এবং জাতীয় সংসদ কিংবা আইনসভার প্রধান হিসেবে সর্বময় ক্ষমতাধর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে; আর তার মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকেই একটি 'নৈর্বাচনিক স্বৈরতান্ত্রিক' ব্যবস্থায় অধঃপতিত করেছে।

বিদ্যমান 'নৈর্বাচনিক স্বৈরতন্ত্র' কিংবা 'সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র' কিভাবে একজন শীর্ষস্থানীয় নির্বাচিত রাজনীতিককে চরম অগণতান্ত্রিক আচরণ করার জন্যে এমনকি আইনসিদ্ধ পথ উন্মুক্ত রাখে, তার একটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সিদ্ধান্তে, দেশের পুরো জনগোষ্ঠীর মতামত উপেক্ষা করে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সাংবিধানিক বিধান বাতিল করা। (সূত্রঃ নৈর্বাচনিক স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের সংগ্রাম, নূরুল কবীর)

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রবল আন্দোলনের মুখে জাতীয়তাবাদী দলের তৎকালীন সরকার বাধ্য হয়ে, ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের সাংবিধানিক বিধান প্রণয়ন করে। জাতীয়তাবাদী দলের শীর্ষ নেত্রী খালেদা জিয়া তখন তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু, ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতা লাভের পর শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দলসহ দেশের সকল বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ওদিকে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক রায়ে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি অগণতান্ত্রিক, কিন্তু দেশে বিদ্যমান প্রতিকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আরো দু'টি সাধারণ নির্বাচন নেতৃত্বাধীন

www.amarboi.org

ক্ষমতাসীন জোটের প্রায় সকল সদস্য দলগুলোও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান চায়। উল্লেখ্য, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবর্তক ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেই। এই বিধান প্রবর্তনের জন্য জামায়াত ইসলামী আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করে বিএনপি থেকে এই দাবি আদায় করে। এখন আবার সেই দাবি আদায়ে বিএনপির সাথে রাজপথে আন্দোলন করছে বিএনপি-জামায়াতসহ ১৮ দলীয় জোট। ভাগ্যের নির্মমতা হচ্ছে এই কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার অধ্যাপক গোলাম আযম এর আগে জেল খেটেছেন বিএনপির আমলে আর আওয়ামী লীগের আমলেও এখন তিনি কারাগারে। আর কেয়ারটেকার দাবিতে জামায়াতকে সব সময় থাকতে হচ্ছে রাজপথের আন্দোলনে। এর মধ্যে জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি থ্রিংকট্যাংক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে- বনে গেছে পাওয়ার অব ব্যালেন্স, ক্ষমতার অংশীদার হয়ে দলের শীর্ষ দু'ব্যক্তি তৈরি করেছেন ক্লিন ইমেজ, আর এই ইমেজে সবার মাথা খারাপ। কথায় বলে 'গরম ভাতে বিড়াল বেজার'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অটল মনোভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে নতুন সংকট তৈরি করেছে, তা অদূর ভবিষ্যতে গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। হুমকির মুখে পড়তে পারে দেশের গণতন্ত্র। দেশের - অর্থনীতিকে করে তুলতে পারে বিপর্যস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা পরববর্তী এদেশের গণতন্ত্র হোঁচট খেয়েছে অনেকবার। ১৯৭২ সালে একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, অত্যন্ত অল্প সময়ে অধঃপতিত হয়ে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে যে নির্মম রক্তাক্ত অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, শেষ পর্যন্ত তা বাংলাদেশকে এক দীর্ঘ সামরিক শাসনের অধীনস্থ করে ফেলে-যা বিভিন্ন অবয়বে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অধ্যাপক লিকক স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রে ভাগ করেছেন। তার মতে সরকার যখন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং জনকল্যাণকর কাজ করে তখন তাকে গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। কিন্তু যখন সমগ্র জনসাধারণের কথা না ভেবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য দেশ শাসন এবং জনমতকে উপেক্ষা করে তখন স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক ছদ্মাবরণে এখন সেই স্বৈরতান্ত্রিকতারই আরেক রূপ।

গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন একনায়কতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিউম্যানের মতে, "একজন বা কতিপয় ব্যক্তি যখন দেশের সকল প্রকার শাসন ক্ষমতা অধিকার এবং তা প্রতিরোধহীন ব্যবহার করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়।" এ সরকার স্বেচ্ছাচারী এবং জনমতের কোন গুরুত্ব প্রদান করে না। এটি একদেশ, একনেতা এবং এক দলে (One state, one leader and one party) বিশ্বাসী। বিরোধী দলের কার্যপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আওয়ামী লীগ এই দলটি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই চেতনাকে লালন করে আর এই ঘৃণ্য তার চেতনা

www.amarboi.org

থেকেই কায়েম করেছে বাকশাল।

গণতন্ত্র-ই একমাত্র স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার গতিরোধক। স্বৈরাচারী শাসক জনগণ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। আর জনগণ যখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে তখন রাষ্ট্রের সকল শক্তি তার উপর নির্যাতন চালাতেও এই শাসকরা দ্বিধা করে না।

ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কুর মতে একজনের শাসন যখন স্বীয় খেয়াল-খুশিতে পরিচালিত হয় তখন তাকে বলা হয় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে ভীতি। ভয় দেখিয়ে শাসন করাই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রধান নীতি। বর্তমান মহাজোট সরকার সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর উপর রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে দমন নিপীড়নের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে শাসন করার চেষ্টা করছে।

বেন্থামের মতে,"শাসক ও শাসিতের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল সাধনের সমস্যাই হল সুশাসনের প্রধান সমস্যা। শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।" তাই আমরা লক্ষ্য করছি- গণতন্ত্রকে চাপা দিতে চাইলে সে নিজেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে নিজেই একটি শক্তি। ইতিহাস থেকে কোন শাসক-ই শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

মহাজোট সরকারের শুরুটা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর একটা অংশ বিডিআরের নজিরবিহীন বিদ্রোহ দিয়ে, যার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন মেজর জেনারেল থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ৫৭ জন চৌকস সেনা অফিসার। তৎকালীন সেনাপ্রধান ও তার সমর্থকদের দিয়ে পরিচালিত ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই বিডিআর বিদ্রোহ ও পিলখানার নির্মম হত্যাকাণ্ড গোটা জাতির জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে বিডিআরের নজিরবিহীন বিদ্রোহ দিয়ে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে ভারত। হুমকির মুখে পড়েছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এর ফলে সশস্ত্র বাহিনীতে যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও তার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনও এর নিরসন ঘটেনি। সেনা তদন্তের পুরো রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে, জনগণ অন্তত জানতে পারত বিদ্রোহের পুরো চিত্রটি। কিন্তু তা না হওয়ার ফলে এই বিদ্রোহের ঘটনা মানুষের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে গেছে। জনগণ উদগ্রীব হয়ে আছে এই ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের কারণ জড়িতদের সম্বন্ধে জানতে। পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও চায় তারা।

২০০৯ সালের ১৫ জুন মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে বাংলাদেশের এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের চাপে বাংলাদেশকে এএইচ-১ বা এএইচ-২ এর যেকোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এএইচ-১ ভারতের মণিপুর-ইম্ফল থেকে বাংলাদেশের তামাবিল হয়ে যশোর হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে। এএইচ-২ ভারতের মণিপুর-ইম্ফল থেকে আসাম ও শিলং হয়ে বাংলাদেশের তামাবিল ও পঞ্চগড় হয়ে ভারতের শিলিগুড়িতে ঢুকেছে। আর এটি বাংলাদেশের ভেতর ভারতের করিডোর স্বরূপ। বাংলাদেশ এই রূপে যুক্ত হলে ভারত বাংলাদেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এ নিয়ে দেশের ভেতরে

www.amarboi.org

সচেতন মহলে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় এবং আন্দোলন গড়ে ওঠে। অথচ বিগত চারদলীয় জোট সরকার এএইচ-৪ এর মাধ্যমে এশিয়ান হাইওয়েতে প্রবেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল যেটা হলে বাংলাদেশ বহুলাংশে লাভবান হতো। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশবিরোধী সকল কিছুতে বেশি সোচ্চার বলে মনে হচ্ছে। এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে নতি স্বীকার করে ভারতপ্রেমিকে পরিণত হয়েছে। এদিকে শত সমালোচনা ও এর বিরুদ্ধে মামলা হওয়া সত্ত্বেও সরকার অজানা উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়নসহ একটি সম্পূর্ণ ব্রিগেড প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে পার্বত্য এলাকায় সংঘাত বাড়ছে এই সবই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হতে পারে। কেউ কেউ বিভিন্ন কৌশলে পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নেও কাজ করে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেই দিল্লিকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি চালু করে। কূটনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতের সঙ্গে একতরফা বন্ধুত্ব গড়তে গিয়ে বর্তমান সরকার ভারতনির্ভর হয়ে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন, নতুন ধরনের কূটনীতি শুরু করতে হবে। না হলে বাংলাদেশকে চরম মূল্য দিতে হবে। জনগণের দুর্দশা আরও বাড়বে। এতে একদিকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে; অন্যদিকে এ সুযোগে ভারত তার অযৌক্তিক দাবিগুলো বাংলাদেশকে মানতে বাধ্য করছে। তারা বলছেন, বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শুধু একটি দেশকে অবলম্বন করে কোনো দেশের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে তার সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। শেখ হাসিনা সরকারের এক বছর পার হতে না হতেই ভারত তার দীর্ঘ ৪০ বছরের দাবিগুলো আদায় করে। সন্ত্রাস দমনের নামে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশকে ব্যবহার করা; করিডোর, ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা; চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার; সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অনুমতিসহ ভারত যা যা চেয়েছে তার সবকিছুতেই সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি সফরের সময় ভারতের এসব দাবি পূরণ করা হয়, তখন খোদ ভারতের বিখ্যাত দৈনিক দ্য হিন্দুর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, 'সুযোগ পেয়ে ঢাকার কাছ থেকে সবকিছু লুফে নিয়েছে দিল্লি।' এরপর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশকে পুরোপুরি ভারতনির্ভর করতে সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সই করিয়ে নেন বর্তমান সরকারকে দিয়ে।

অপদখলীয় ভূমি এবং ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি এবং টিপাইমুখ প্রকল্প নিয়ে

www.amarboi.org

রীতিমত বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতারণা করে চলছে ভারত।

ভারতের সঙ্গে একতরফা সম্পর্ক গড়তে গিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়নি ঢাকা। চীনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশ এখন আর বাংলাদেশের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে। সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন খারাপ। সব মিলিয়ে বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।

নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসকে অপমান-অপদস্ত করায় যুক্তরাষ্ট্রের রোষানলে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। যে ভারতমুখী কূটনীতি চালানো হচ্ছিল, সে ভারতই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতায় সর্বশেষ পেরেক ঠুকে দিয়ে টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ চুক্তি করে।

বড় বড় কূটনৈতিক ব্যর্থতা এখন বাংলাদেশের ঘাড়ে ঝুলছে। মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরকালে বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তা চুক্তি হয়নি; লাভের বদলে ভর্তুকি দিয়ে ভারতকে করিডোর সুবিধা দেয়া হয়েছে; একটি দেশেও বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি, বরং বড় শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে; সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে, ইউরোপীয় ইউনিয়নও সন্তুষ্ট নয় বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডে। এ সময় উন্নয়ন-সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো প্রতিশ্রুত অর্থ না দেয়ার মতো অবস্থানও নিয়েছে। গভীর সমুদ্রে বন্দর নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করলেও চীনের সঙ্গে এ ধরনের কোনো চুক্তি করা সম্ভব হয়নি। জাপানের মতো বন্ধু রাষ্ট্রও পদ্মা সেতু নির্মাণে তাদের সহায়তা স্থগিত করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন সফরে বাংলাদেশে আসেন। কিন্তু হিলারির এ সফরে বাংলাদেশ লাভবান হয়নি। বরং হিলারি তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু, খুন, গুম, ড. ইউনূস নিয়ে কথা বলায় সরকারের গাত্রদাহ দেখা দিয়েছে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে হিলারির সফর সরকারের আমন্ত্রণে হলেও এর মূলধন পড়েছে বিরোধী দলের থলিতে। দুর্নীতি ইস্যুতে ও বাংলাদেশের অব্যাহত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইইউ'র এ উদ্বেগ কমানোর মতো কোনো কাজ করেনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ও সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সম্ভব হয়নি সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সম্প্রসারণ; বরং বন্ধ রয়েছে কুয়েত ও সৌদি আরবের বাজার। বিভিন্ন কারণে ফিরতে হয়েছে লক্ষাধিক বাংলাদেশীকে। তাদের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোয় পাঠানোর চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। মূলত সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতায় জনশক্তি রফতানির এ বিপদসঙ্কুল অবস্থা। ভিন্নভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পাঠানো ছাড়াও আফ্রিকার দেশ কয়েকটি দেশে একাধিকবার সফর করেছেন দীপু মনি। সেখান থেকেও নেই নতুন শ্রমবাজারের ঘোষণা বা অন্য কোনো সুখবর। এছাড়া সম্প্রতি সৌদি এক কূটনীতিক ঢাকায় নিহত হয়েছেন। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে চিহ্নিত তো দূরের কথা, এ বিষয়ে অগ্রগতির

www.amarboi.org

কোনো খবর করতে পারছে না সরকার। বিষয়টি নিয়ে রিয়াদ চরম ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে।

ভারতের সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, 'মাঝে মধ্যে মনে প্রশ্ন জাগে, দীপু মনি কি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী? তিনি তিস্তা চুক্তির জন্য ভারতের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেনদরবার করবেন কেন? এটা কূটনৈতিক দেউলিয়াত্ব।'

সীমান্তে নিরস্ত্র নিরীহ বাংলাদেশীদের হত্যাকাণ্ডে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এতদিন গুলি করে বাংলাদেশীদের হত্যা করার সাথে এবার তার সাথে যোগ হয়েছে গ্রেনেড বোমা নিক্ষেপ এবং পাথর মেরে হত্যা করা। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করা হবে খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এসে কথা দিয়ে গেলেন কিন্তু তিনি কথা রাখলেন না। বরং সম্প্রতি বিএসএফ প্রধান উল্টো বক্তব্য রেখে সীমান্তে হত্যাকাণ্ডে বিএসএফকে আরো উস্কানি দিয়েছেন। পৃথিবীর কোন সীমান্তে বেসামরিক লোককে এত বিপুল সংখ্যায় হত্যা করার দৃষ্টান্ত নেই। তারপরেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিবাদ না হওয়ায় বিএসএফ এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সীমান্ত। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কিলোমিটার জুড়ে তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ড বরাবরই বিশ্বের দরবারে আলোচনার বিষয়বস্তু। বর্তমান সরকারের সাড়ে ৩ বছরে ফেলানী হত্যা ২ শতাধিক নিরীহ নিরস্ত্র বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বিএসএফ। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সোজাসুজি বলেছিলেন, সীমান্তে বিএসএফ আর গুলি করে কাউকে হত্যা করবে না।

সম্প্রতি বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মনের গোপন কথা বের হয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, "সীমান্তে গুলি বন্ধ করা কখনোই সম্ভব নয়।" তার পরপরই ঐ মন্তব্যের পরে বিভিন্ন সীমান্তে আরও অনেক বাংলাদেশী হত্যার শিকার হয়েছে। তার মধ্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর সীমান্তে। বিরামপুর উপজেলার দাউদপুর সীমান্তে বিএসএফ গ্রেনেড বোমা নিক্ষেপ করে সাইদুর রহমান চিকু নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে গুরুতর আহত করে। এটা হলো ভারতের সাথে বর্তমান সরকারের এক তরফা প্রেমের প্রতিদান। শক্ত প্রতিবাদ হলে হয়তো হত্যাকাণ্ড কমতো। এখন হত্যাকাণ্ড কমছে তো নাই উপরন্তু নতুন নতুন কৌশল নিয়েছে ভারত। এখন গুলির সাথে যোগ হয়েছে বোমা, গ্রেনেড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক এক্সপ্লোসিভ (বিস্ফোরক) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইতঃপূর্বে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে এ ধরনের শক্তিশালী গ্রেনেড ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। এ থেকে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যে, ভারত কি তাহলে বাংলাদেশ সীমান্তকে অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্র মনে করছে?"

(সূত্রঃ সংগ্রাম ২৮ মে-২০১২)

বর্তমান সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের একটি উদাহরণ হচ্ছে ক্ষমতায় আসার

www.amarboi.org

পর নিজেদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের হিড়িক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের কথা বলা হলেও বিরোধী দলের কোনো মামলা এ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়নি বা প্রত্যাহারের সুপারিশও করা হয়নি। বরং একের পর এক নিজেদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। পল্টন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে করা মামলাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সারাবিশ্ব যেখানে ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে সেখানে নিজেদের নাম থাকায় মামলা বাতিল করে দেয়া কোনো সু-সরকারের কাজ নয়। তবে জনগণ এই মামলাকে আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিচার ঠিকই করবেন।

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত নির্বাচনী ইশতিহারে পরিষ্কার করে অঙ্গীকার করেছিল যে, নির্বাচিত হলে 'রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহনশীলতা গড়ে তোলা হবে।' (অনুচ্ছেদ ৫.৪, দিন বদলের সনদ, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮)। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন রূপ। লীগের আপন শ্রেণীর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতাসীন সরকারের নানা অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে ২০১০ সালের ৭ই জুলাই সারাদেশে রাস্তার পাশে শান্তিপূর্ণ 'মানববন্ধন' কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান নাগরিকদের 'জনসভা ও শোভাযাত্রা' অনুষ্ঠিত করার অধিকার মঞ্জুর করলেও (অনুচ্ছেদ ৩৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান), লীগ নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী জাতীয়তাবাদী দলের 'মানববন্ধন' কর্মসূচিকে নির্মম লাঠিপেটার মাধ্যমে ভণ্ডুল করে দেয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, জুলাই৮ ২০১০),

পুলিশি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে। আর সরকারের নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য এ আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকাশ্যে দিবালোকে তরুণীর শ্লীলতাহানি, রাস্তায় সাংবাদিকদের পিটিয়ে হাত-পা গুঁড়িয়ে ফেলা, প্রকাশ্যে ছিনতাই-চাঁদাবাজি, নিরপরাধ মানুষকে দুর্বৃত্ত সাজিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলাসহ নানা অপরাধকর্মে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্য। অন্য দিকে, অপরাধীদের বিচার না হওয়ায় অসৎ পুলিশ সদস্যরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আবার কোনো কোনো ঘটনায় অপরাধী পুলিশ সদস্যরা শাস্তির বদলে পুরস্কৃত হচ্ছেন। সম্প্রতি পুলিশ সদস্যদের আচরণ পুরো পুলিশ বাহিনীকে বিতর্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পুরো বাহিনী সম্পর্কেই মানুষের মধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে পুলিশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভীতিরও সঞ্চার হয়েছে।, 'পুলিশ জনগণের বন্ধু' পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে এই প্রচারণা চালানো হলেও পুলিশের বাস্তব কর্মকাণ্ড এই বাহিনীকে বিতর্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সর্বশেষ ঢাকার আদালতপাড়ায় পুলিশের কতিপয় সদস্য যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাতে অনেকেই হতবাক হয়েছেন। বিচারপ্রার্থী এক তরুণীকে পুলিশ ক্লাবে নিয়ে সাংবাদিক ও আইনজীবীদের নির্মমভাবে পেটানো হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা

www.amarboi.org

নগর এলাকায় দৈনিক প্রথম আলোর তিন সাংবাদিককে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করে পুলিশ। সেখানে মহিলা পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ছবি তুলতে গেলে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তিন সাংবাদিকের হাত-পা গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আদিলুর রহমান খান বলেছেন, দীর্ঘ দিন ধরে দায়মুক্তি সংস্কৃতি, প্রত্যেক সরকারের আমলে পুলিশকে দলীয়ভাবে ব্যবহার এবং পুলিশের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কারণে পুলিশ দলীয় লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করছে পুলিশ। (নয়া দিগন্ত-৩১ মে ১২)

চারশত বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজধানী শহর ঢাকাকে হঠাৎ করে, জনগণের সম্মতি ছাড়া, এমনকি জাতীয় সংসদে কোনো রকম তর্ক-বিতর্ক ছাড়া, মাত্র চার মিনিটের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্তকারী আইন প্রণয়নের মতো সরকারি অগণতান্ত্রিকতার প্রতিবাদে বিরোধীদল আহূত সেই হরতাল পণ্ড করার জন্যে ইতিহাস-ও ঐতিহ্যবোধ বিবর্জিত সরকার মিছিলকারীদের ওপর শুধু তার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকেই লেলিয়ে দেয়নি, পুলিশের প্রহরায় রাস্তায় নামিয়েছিল আপন দলের সশস্ত্র কর্মীবাহিনীকেও। (দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ডিসেম্বর ৫, ২০১১)।

বিদেশী কোম্পানিকে দেশের ভূখণ্ড বাণিজ্যিকভাবে বেচাকেনা করতে দেয়া সংবিধানসম্মত? এই অভিযোগ আজ সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। সাহারা গ্রুপ বাংলাদেশে এপার্টমেন্ট ব্যবসা করার জন্য সরকারের কাছে এক লাখ একর জমি চেয়েছিল। সরকার তাদেরকে প্রাথমিকভাবে ৫০০ একর জমি দেবে বলে জানা গেছে। কিন্তু কোন বিদেশী কোম্পানিকে দেশের ভূখণ্ড বাণিজ্যিকভাবে বেচাকেনা করতে দেয়া সংবিধানসম্মত নয়। সরকারিভাবে বিদেশী কোম্পানিকে এপার্টমেন্ট ব্যবসায় ডেকে আনার প্রয়োজন কেন দেখা দিল, তাও আবার রাজউকের তত্ত্বাবধানে জমি হুকুম দখল করে দেয়াটা আমাদের বোধগম্য নয়। সরকার কোন দেশীয় বিল্ডারকে কখনও এমন উদারতা দেখিয়েছে বলে কোন দৃষ্টান্ত নেই। (নয়া দিগন্ত ২৯ মে-২০১২)

শুধুমাত্র নামেই আশুগঞ্জ আন্তর্জাতিক নৌবন্দর। কোন অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াই পালাটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করা হয়েছে। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় এক কোটি বিলিয়ন ঋণ সহায়তায় মধ্যে আশুগঞ্জ নৌবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম। বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যে খাদ্যপণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করা হবে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী নৌবন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় এক বিলিয়ন ডলারের যে ঋণ সহায়তা চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে আশুগঞ্জ আঞ্চলিক ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্র প্রকল্পটি হলো অন্যতম। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম. ৩১ মে-২০১২)

www.amarboi.org

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস-সম্পদ নিজস্ব প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তায় নিজেরাই আহরণ করে। বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে ইজারা দেয়ার প্রতিবাদে, 'বিক্ষোভ' প্রকাশ করার মতো নিরীহ কর্মসূচিতে পুলিশের নির্মম লাঠিপেটায় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের পা ভেঙে যায়, সাইফুল হকসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও মারাত্মকভাবে আহত হন। (নিউ এইজ সেপ্টে : ২০০৯)

সরকারি খাতে দেশে উৎপাদিত তরল পেট্রোলিয়াম (এলপি) গ্যাস বিপণন প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর অন্তত ১৫০ কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা সরকারের দেওয়া ভর্তুকি। বাকি টাকা লুটে নেয়া হচ্ছে গ্রাহকদের প্রতারিত করে। (সূত্রঃ ২৮ মে প্রথম আলো)

বৃটিশবেনিয়াদের মত এখানে উঁচু নিচুর ব্যবধান আকাশচুম্বী। তার উপর সন্ত্রাস দুর্নীতি সুদ ষুষ দরিদ্রতার কশাঘাতে মানুষ জর্জরিত। দরিদ্রতার বেড়াজাল বেঁধে রেখেছে দেশের ৯০% মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে। তার মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজের সংগ্রাম কিছু পুঁজিপতিদের সাথে যারা অসৎ উপায়ে উপার্জন করে কিন্তু আবার যাকাতও দেয় না। ফলে খাদ্য ,শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে সাততলার কোটিপতি আর গাছতলার জরাজীর্ণ মানুষের একসাথে। এই বৈষম্য পৃথিবীর মানব রচিত কোন মতবাদই মেটাতে পারেনি পারবেও না। আজ মানবতার বৈষম্য এমনই যে, কেউ খাদ্য সাগরে ঢালছে আর কেউ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কেউ আবার আবার ক্ষুধার জ্বালায় নিজের সন্তান আর শরীরের রক্ত বিক্রির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। কিন্তু একমাত্র ইসলামই মানুষের মধ্যে এই Humanity, equality and Personality তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। ধনীদেরকে শুধু গরিবের পাশেই দাঁড়াতে বলা হয়নি বরং ধনীদের সম্পদে গরিবের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটিই মানবতার জন্য ধর্মের ঐতিহাসিক অবদান। এবার দেখুন আমাদের এই সমাজের বৈষম্যতার পাহাড়সম ব্যবধান।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে খাদ্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে খাদ্যবহির্ভূত অপরাপর পণ্যের দামও বাড়তে শুরু করে। ২০১০ সালের নভেম্বরে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ছিল, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে, ৩.৩৩ শতাংশ। ২০১১ সালের অক্টোবরে খাদ্যবহির্ভূত দ্রব্যাদির মূল্যস্ফীতি ৯.০৫ শতাংশে উন্নীত হয়, আর নভেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০.১৬ শতাংশ। (সাপ্তাহিক বুধবার, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৪, ২০১১)। সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না, যেমন নেই সমকালীন বাংলাদেশে, মুদ্রাস্ফীতি তখন জনজীবনে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতে, খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নিপতিত হন। এই হিসেব যদি সত্য হয়, ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত

www.amarboi.org

সময়কালে, খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১১ শতাংশের বেশি হওয়ার কারণে, বাংলাদেশের প্রায় ৪০ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নিপতিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকা-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর এক বিশ্লে-ষণ অনুযায়ী, ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৮ সালে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৮.৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নিপতিত হয়েছেন। ২০০৪ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। ২০০৮ সালের মার্চের মধ্যেই তা ৪৮.৫ শতাংশে পৌঁছেছে বলে সিপিডি দাবি করেছে। বর্তমানের অবস্থা, বলার অপেক্ষা রাখে না আরো অনেক খারাপ।

মাসভিত্তিক পরিসংখ্যানে, সরকারি হিসাব অনুসারেই, ২০১০ এর নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১১.৫৮ শতাংশ পৌঁছেছে। এক বছর আগে, ২০১০ এর নভেম্বরে, মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৫৪ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতির অবস্থা আরো ভয়াবহ। ২০১০ সালের নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ৩.৩৩ শতাংশ। ২০১১ সালের নভেম্বরে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তেতে, খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১২.৪৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির চাপে পিষ্ট দরিদ্র মানুষকে 'কম খাওয়ার' জন্যে বাণিজ্যমন্ত্রী নসিহত দানের কিছুদিন আগে, ২৪ জুলাই, সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতও মানুষের দুর্দশা নিয়ে অনুরূপ এক নির্মম তামাশা করেছিলেন। মুহিত মানুষকে সপ্তাহে 'একদিন বাজারে না যাওয়ার' পরামর্শ বিতরণ করেছিলেন। (দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, জুলাই ২৫, ২০১১)।

সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের একাধিক মন্ত্রীকে ঠাট্টা-মশকরা করতে দেখেছি আমরা। উদাহরণ হিসেবে সরকারের অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর নাম করা যেতে পারে। দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি রোধ ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে, ২০১১ সালের ৪ আগস্ট, তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান প্রকাশ্যে মানুষকে 'কম খাওয়ার পারামর্শ' দিয়েছেন।(প্রথম আলো, ঢাকা, আগস্ট ৫, ২০১১)।

দ্রব্যমূল্য রোধে ব্যর্থ মন্ত্রীবাহাদুর সমস্যা সমাধানের জন্যে 'কম খাওয়ার' পরামর্শ দেয়ার পূর্বে তার দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে জনগণ লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছিল, তারা ভুলবে কেন তার প্রাক-নির্বাচনী অঙ্গীকার? নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 'দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখা হবে।... ভোক্তাদের স্বার্থে ভোগ্যপণ্য মূল্যে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হবে।' (অনুচ্ছেদ, ১.১ দিন বদলের সনদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার-২০০৮)।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন যখন বিনিয়গের জন্যে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত, তখন লীগ সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং

www.amarboi.org

সরকার ও সরকারি দল পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচনী বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার মুহূর্ত থেকে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সারাদেশে এক ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছিল, যা আজও বিদ্যমান রয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অবৈধ অস্ত্রের জোরে, সশস্ত্র পুলিশের নীরব সহযোগিতায় উৎখাত করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের মারধর করা থেকে ছাত্রীদের নানাবিধ যৌন নিপীড়নের শিকারে পরিণত করা পর্যন্ত এহেন অপকর্ম নেই যার মধ্যে লীগ এর ছাত্রকর্মীরা নিয়োজিত নয়। তাছাড়া, এরা বাজার-হাট, বাস-লঞ্চ টার্মিনাল, ইত্যাদি জবরদখল করে সারা দেশটাকে বেপরোয়া চাঁদাবাজির এক নরকে পরিণত করেছে। এ অবস্থা এখনো জারি রয়েছে। সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের লাগামহীন টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, ছিনতাই এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ প্রবেশ করে নতুন করে এক অনিশ্চয়তার দিকে। জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে ছাত্রলীগের এইসব কর্মকাণ্ড। বছরের শুরুতেই ছাত্রশিবিরের দুইজন মেধাবী ছাত্রসহ সারাদেশে প্রায় ২৫ জন ছাত্রনেতাকে হত্যা করে তারা। ফলশ্রুতিতে দেশের প্রায় শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই রাষ্ট্রীয় অপকর্মের সঙ্গে সম্প্রতি বরং যুক্ত হয়েছে আরেক ভয়াবহ উপদ্রব-গুম খুন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, নানা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, বন্দুকযুদ্ধ প্রভৃতি নামে বিচারবহির্ভূত রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড আজও অব্যাহত রেখেছে এবং লীগ সরকারের নানা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা ইনিয়ে বিনিয়ে তার সাফাই গেয়ে চলেছেন। এ পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর "স্ব-দম্ভোক্তি করে বলেন, বিগত ১০ বছরের তুলনায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ভালো।" আর আমি সফল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী টুকু বলেছেন, পুলিশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। এসব কথা যেন মানুষের অনেক কষ্টের মধ্যেও একটু হাসার সুযোগ করে দেয়া ছাড়া আর কি?

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারিতে লীগ সরকারের ক্ষমতারোহণের পর থেকে ২০১১ সালের ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে কমপক্ষে ৩৫৯ ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৮৯ জন নানা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে তথাকথিত 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' কিংবা 'বন্দুকযুদ্ধে' প্রাণ হারিয়েছেন। (নিউ এইজ ১০ ডিসেম্বর ২০১১)

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লীগ সরকার যোগ করেছে এক ভয়াবহ নতুন উপসর্গ-গুম খুন। পুলিশ ও র‍্যাবের পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকধারী সশস্ত্র ব্যক্তিবর্গ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তরুণদের তুলে নিয়ে যচ্ছে, কিন্তু তারা আর ফিরে আসছে না। কিছুদিন পর অপহৃত তরুণদের অনেকের লাশ পাওয়া যাচ্ছে দূরবর্তী নদী-নালায়, বন-জঙ্গল, কিংবা রাস্তার ধারে। আওয়ামী লীগের তিন বছরের শাসনামলে, ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে, কমপক্ষে ৫০ জন

www.amarboi.org

তরুণ এভাবে অপহৃত হয়ে গুম হয়ে গেছে। (যুগান্তর, ঢাকা, জানুয়ারি ৮, ২০১২)
এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কি সরকার কর্তৃক গঠিত 'মানবাধিকার কমিশন' এর চেয়ারম্যান, ড. মিজানুর রহমান, প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন যে, 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান দেশি-বিদেশি প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নতুন বিকল্প হিসেবে গুম খুনের আশ্রয় নিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে'। (নিউ এইজ ডিসেম্বর ১০/২০১১)
জনদাবির বিরুদ্ধে সরকারি সশস্ত্র আক্রমণের আরেকটি জঘন্যতম দৃষ্টান্ত হলো ২০১০ সালের ৩১শে জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জের আড়িয়াল বিলসংলগ্ন প্রায় ৪০টি গ্রামের হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশি সন্ত্রাস ব্যবহার করা। আড়িয়াল বিলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ একর জমির ওপর 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' তৈরী করার একতরফা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে, বিলসংলগ্ন ও বিলের ওপর জীবিকানির্ভর হাজার হাজার কৃষি ও মৎস্যজীবী নর-নারী 'মানব-বন্ধন' করতে সমবেত হন। কিন্তু সেই জনতার বিরুদ্ধে লাঠি আর কাঁদানে গ্যাসসহ পুলিশকে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রশাসনিক নির্দেশ দেয় সরকার, আর এহেন স্বৈরতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনতার সাথে সংঘর্ষে একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন, আহত হন শত শত গ্রামবাসী। (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, জানুয়ারি ১, ২০১০)
এরপর সরকার কয়েক হাজার মানুষের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে এবং সেই মামলার যাদের অভিযুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রগতিশীল লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে মোটেই ঘটনাস্থলে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর 'অপরাধ'- তিনি ওই অঞ্চলে জন্মেছিলেন এবং নির্মানবিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছেন।
আইনের শাসনের প্রতি লীগ সরকারের চরম অবজ্ঞার আরেকটি ভয়াবহ উদাহরণ হলো খুন-খারাবি ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্যে দায়মুক্তির সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তন। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত লীগ সরকার ৭ হাজার একশ'জন দলীয় নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করেছে। (ইত্তেফাক, ঢাকা, ডিসেম্বর ২১, ২০১১)
তাছাড়া, গত তিন বছরে সরকার রাষ্ট্রপতির প্রতিষ্ঠানকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে কমপক্ষে ২২ জন খুনের আসামিকে 'ক্ষমা' করে দিয়েছে, যাদের অনেকেই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শিবিরের নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে। (সাপ্তাহিক বুধবার, ঢাকা, প্রাগুক্ত) এহেন পরিস্থিতিতে, বলার অপেক্ষা রাখে না, আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ আইন তুলে নেয় নিজের হাতে। লীগ সরকারের তিন বছরে, মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' এর হিসাব অনুযায়ী, কমপক্ষে ৪৬২ জন মানুষ গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে। (যুগান্তর, ঢাকা, জানুয়ারি

www.amarboi.org

৮,২০১২)

রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর অব্যাহত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম-খুনের পাশাপাশি গণপিটুনিতে কয়েকশ' মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশের মানবাধিকার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে ভয়াবহ চিত্র মূর্তিমান হয়ে ওঠে, তা কোনো অবস্থাতেই পর্যাপ্ত বিনিয়োগের, কি দেশি-কি বিদেশি, অনুকূল পরিবেশের আশ্বাস প্রদান করে না। তবে আশ্চার্যের ব্যাপার হলো, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অব্যাহত নিপীড়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম-খুন এবং বিক্ষুব্ধ মানুষ কর্তৃক অব্যাহত গণপিটুনিতে অব্যাহত মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিষ্কম্প কণ্ঠে দাবি করে চলেছেন, 'দেশে গণতন্ত্র ঠিকঠাকভাবেই কার্যকর রয়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা বাংলাদেশে নেই।' (নিউ এইজ, জানু : ১২)

একটি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সে দেশ ও জাতির সভ্যতার দলিল। সে বিচারে আমরা আজ যেন প্রান্তিক সীমানায় অবস্থান করছি! বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে খ্যাতনামা সংবাদ সংস্থা আলজাজিরা, রয়টার্স, এএফপি ও ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান। একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক প্রচারিত নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ। নিউইয়র্ক টাইমসের লেখক ব্রু-গেও বেশ কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আলজাজিরা নেটওয়ার্ক প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে। "বাংলাদেশে রাজনৈতিক নিখোঁজের মহামারী" (পলিটিক্যাল ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স প্লেইগ বাংলাদেশ)। অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে গত বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১০০ মানুষ গুম হয়েছে, যাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। এদের মধ্যে আছেন সিলেট অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী। ইলিয়াসের স্ত্রী নিশ্চিত যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণেই নিরাপত্তা বাহিনী তাকে অপহরণ করেছে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনের শিরোনাম,"বাংলাদেশ পুলিশ আউট ইন ফোর্স অ্যাজ টেনশন রাইজেস ওভার মিসিং পলিটিশিয়ান।" এতে বলা হয়েছে, ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আরও বলা হয়, ইলিয়াস আলী নিখোঁজের জন্য সন্দেহের আঙুল তোলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দিকে। গত কয়েক মাসে ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপগুলো এসব ঘটনায় র‍্যাব ও পুলিশকে দায়ী করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধে বলা হয়, "শেখ হাসিনার সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয় পায়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, বৈষম্য বৃদ্ধি ও সম্প্রতি কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তার সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করেছে। নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ লিখেছে,

www.amarboi.org

২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে বিএনপির আরেক নেতা, ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর চৌধুরী আলম নিখোঁজ রয়েছেন। গত দুই বছরেও তিনি কোথায় আছেন বা তার কী পরিণতি হয়েছে, সে সম্পর্কে পুলিশ কোনো হদিস দিতে পারেনি। "অনলাইন রেডিফ" এনফোর্সড ডিসঅ্যাপেয়ারেন্সেস অন দ্য রাইজ ইন বাংলাদেশ শিরোনামে লিখেছে, ইলিয়াস নিখোঁজের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়ছেই। বার্তা সংস্থা পিটিআই বলছে, "ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারে অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হলেও এর প্রতি বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের আস্থা নেই।" বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এফএফপি সার্বক্ষণিক হরতাল ও আন্দোলন-সংগ্রামের আপডেট সংবাদ প্রচার করছে। রয়টার্স জানিয়েছে,"ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের প্রতিবাদে সিলেটসহ সারা দেশ উত্তাল।" এএফপি জানিয়েছে,"ঢাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। রাজনৈতিক নিখোঁজ নিয়ে সরব বিদেশি মিডিয়া।"

বিশ্বের প্রভাবশালী মানবাধিকার সংস্থাসমূহ ও শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মহাজোট সরকারকে নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত প্রতিনিয়ত। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বিপুলভাবে ক্ষুণ্ন হলেও তার পরিশোধনে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই বলেই মনে হয়। বরং সরকার সব অস্বীকার করেই চলেছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার, বিচারব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে এসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও প্রভাবশালী দেশের পার্লামেন্ট ও ফোরামেও সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ সম্পর্কিত 'মানবাধিকার রিপোর্ট", এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর বিবৃতি, বৃটিশ পার্লামেন্টের বক্তব্য, প্রভাবশালী পত্রিকা ইকোনমিস্ট ও দি হিন্দু'র প্রতিবেদন, বিবিসি ও আল-জাজিরার রিপোর্ট প্রভৃতি। ২৪ মে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ সম্পর্কিত 'মানবাধিকার রিপোর্ট। এতে বলা হয়েছে, নিখোঁজ, নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, খেয়ালখুশিমতো গ্রেফতার ও আটক রাখার জন্য দায়ী নিরাপত্তা বাহিনী। তারা মানবাধিকারের বড় সমস্যা। বিচার বিভাগকে অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এতে সমস্যা বেড়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে সরকার। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা সাংবাদিকদের হয়রানি করছে। সরকার সমাবেশ করার স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ সহিংসতা সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি মারাত্মক এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের অনিয়ম-দুর্নীতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আইন ও

www.amarboi.org

বিধিবিধান থাকলেও সরকার তার যথাযথ প্রয়োগ করে না। সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেই দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে দুর্নীতি করলেও শাস্তি হয় না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কে 'দন্তহীন বাঘ আখ্যা দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, '২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে শাসক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যেসব মামলা হয়েছিল কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে নির্বাহী আদেশের বলে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অথচ খালেদা জিয়া কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা খুব কম মামলাই প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এসময়ের আরেকটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। তারা অভিযোগ করে, বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করছে না। এ্যামনেস্টি ২০১১ সালের বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে গত ২৪ মে। সেখানে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনাল নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শুরুতে এই বিচার প্রক্রিয়ায় অনেক ত্রুটি ছিল, তার কিছু কিছু সংশোধন করা হলেও এখনও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে এবং এই ট্রাইব্যুনাল পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করতে পারছে না। প্রতিবেদনটির 'বাংলাদেশ' অধ্যায় নিয়ে এ্যামনেস্টির বাংলাদেশ গবেষক আববাস ফয়েজ বলেন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখনো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে পারেনি বলেই তারা মনে করেন। তারা আরো বলেন, ট্রাইব্যুনালে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে হলে এজন্যে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশাপাশি যাদের বিচার করা হচ্ছে, তাদের মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। যাদের বিচার চলছে তারা যাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন বা তারা যেন নির্যাতনের শিকার না হন, সেটি নিশ্চিত করাও জরুরি। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে সে দেশের অন্য কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এটি মানবাধিকারের জন্য একটি বড় সমস্যা বলে তিনি অভিহিত করেন। এতে বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার এবং অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার অধিকারের বিষয়টিও তোলা হয়। আরো উল্লেখ করা হয়, এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আসলে ঠিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সাথে খাপ খায় না। বলা হয়, 'আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যে এসব ক্ষেত্রে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচার প্রক্রিয়া এ্যামনেস্টি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানানো হয়।

২৭ এপ্রিল মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে বলে, তারা বাংলাদেশে মানুষ 'গুম' হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। তারা সিলেটের দু'জন ছাত্রদল নেতা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের দু'জন নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আমিনুল ইসলাম এবং বিএনপি

www.amarboi.org

নেতা ইলিয়াস আলীর ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাদের অনুসন্ধান শেষে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, গুম হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাদা পোশাকধারী সদস্যরা তুলে নিয়ে গেছে। তাদের পায়ে বুট পরা থাকায় ধারণা করা হয় তারা সবাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। আর তাদের চুলও ছোট করে ছাঁটা। ইলিয়াস আলীর গুম হওয়ার পর পুলিশকে তদন্ত করতে বলার পর আবার একে 'নাটক বলে মন্তব্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে এ্যামনেস্টি।

প্রায় একই সময়ে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী পত্রিকা দি ইকোনমিস্ট প্রকাশ করে তাদের একটি মন্তব্য প্রতিবেদনে। এতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এতে সরাসরি বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিপজ্জনক পথে নিয়ে যাচ্ছেন।' গত ২৫ মে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে রাজনৈতিক উত্তেজনা, দুর্নীতি, খুন, অপহরণ ইত্যাদি বিষয় তুলে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। একটির শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশস টক্সিক পলিটিকস: ইট ইজ আপ টু ইন্ডিয়া টু ট্রাই টু স্টপ শেখ হাসিনা রুইনিং বাংলাদেশ।" অপরটির শিরোনাম ছিল 'পলিটিকস ইন বাংলাদেশ : দ্য প্রাইম মিনিস্টার সেটস দ্য কান্ট্রি অন এ ডেঞ্জারাস পাথ'। এই প্রতিবেদনে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, 'পরবর্তী নির্বাচন কার তত্ত্বাবধানে হবে এবং তা আসলেই নিরপেক্ষ হবে কি না তা নিয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থান দেখা যাচ্ছে। এটা ইতোমধ্যে এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, অনেক পর্যবেক্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কোনো নির্বাচন আদৌ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশীরা ইতোমধ্যে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য, মারাত্মক লোডশেডিং এবং নতুন নতুন সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।' ইকোনমিস্ট আরো বলে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এক সৌদী কূটনীতিক গুলীতে নিহত হয়েছেন, এক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী নির্যাতিত ও খুন হয়েছেন, দুর্নীতির অনুসন্ধান করার পর এক সাংবাদিক দম্পতিকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কঠোর করতে জানুয়ারিতে অভ্যুত্থানের গুজব ছড়ানো হয়। আরো বলা হয়, বাংলাদেশের অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব গ্রামীণ ব্যাংকের মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্তা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা তাকে রাজনৈতিক হুমকি মনে করেন। সরকার গ্রামীণ ব্যাংককে কব্জা করতে চাচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়। সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়, দুর্নীতি এতো ব্যাপক যে, তা দাতাদেরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাপান তার উপ-প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি ব্যক্ত করেছে। সাম্প্রতিক এক দুর্নীতির ঘটনায় রেলমন্ত্রীর সহকারীর গাড়ি থেকে বস্তাভর্তি টাকা পাওয়ার পরে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু অল্প পরেই তাকে মন্ত্রিসভায় পুনর্বহাল করা হয়। ইকোনমিস্ট আরো উল্লেখ করে, '১৯৭১

www.amarboi.org

সালের যুদ্ধাপরাধ আধুনিক ইতিহাসের মধ্যকার রক্তস্নাত যুদ্ধগুলোর অন্যতম। কিন্তু অভিযুক্তদের বিচার করতে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সম্ভাব্য রায়ের উদ্দেশ্য এখন প্রতীয়মান হচ্ছে, বিএনপি ও তার ইসলামী মিত্রদের হেয় প্রতিপন্ন করা।'

বাংলাদেশের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে বৃটেনের পার্লামেন্টেও আলোচনা হয়েছে সেখানকার একটি সংবাদপত্র জানায়, বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীসহ সব গুমের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে বৃটেন। বৃটেন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউজ অব লর্ডসে লেবার পার্টির সদস্য লর্ড হ্যারিসের এক প্রশ্নের জবাবে দেশটির স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ মন্ত্রী লর্ড হাওয়েল এ কথা বলেন। লর্ড হাওয়েল বলেন, 'দেশটির জনগণের দারিদ্র্য নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগামী সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং তা যথাসময়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজনীতিকে স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশের চেষ্টাকে আমরা সমর্থন দিয়ে আসছি। তাই আমাদের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে যেকোনো মূল্যে ইলিয়াস আলীসহ গুম হওয়া সব মানুষকে খুঁজে বের করতে সরকারকে আহবান জানানো হয়।" বৃটেন বিশ্বাস করে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা অচিরেই কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। এছাড়া গত ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান বাংলাদেশ সফরকালে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অবিলম্বে নিরপেক্ষভাবে তদন্তের দাবি জানায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ২৭ এপ্রিল এই সংস্থার বিবৃতি প্রচার করে বিবিসি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই বিবৃতিতে বলে, বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়ছে এবং এ ধরনের সর্বশেষ ঘটনায় গত ১৭ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ রয়েছেন বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী। বিবৃতিতে বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামকে অপহরণ এবং কয়েকদিন পর তাকে হত্যার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র কেবল চলতি বছরেই এভাবে ২২ জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন বলে তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছিল। অন্যদিকে অধিকার নামের আরেকটি মানবাধিকার সংস্থার হিসেবে ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৫০ জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। বিবিসি গত সপ্তাহে বাংলাদেশে গুম-নিখোঁজের ওপর একটি সচিত্র প্রতিবেদনও সম্প্রচার করে।

এছাড়া প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরা 'বাংলাদেশ রাজনৈতিক গুমের মহামারীতে আক্রান্ত' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রচার করে। এতে বলা হয়, বিগত এক বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১০০ মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক নেতাকর্মী। এর আগে ১০ আগস্ট ২০১১ এবং এ বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে দু'টি

www.amarboi.org

প্রতিবেদন আল জাজিরা টিভিতে প্রচারিত হয়। শেষ প্রতিবেদনের একাংশে বলা হয়, 'বাংলাদেশের সাবেক রাজনীতিবিদ গোলাম আযম ৪০ বছরেরও বেশি সময় আগে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের মুখোমুখি। ৮৯ বছর বয়সী গোলাম আযম হাঁটতে পারেন না, দেখতে পান না, এমনকি শুনতেও পান না। তা সত্ত্বেও ১০ জন সশস্ত্র পুলিশ কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।"

এদিকে ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য হিন্দু'র অনলাইন সংস্করণে 'ডিসঅ্যাপেয়ারেন্সেস, কিলিংস ট্রিগার কনসার্ন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক রিপোর্টে সম্প্রতি বলা হয়, গুমের ঘটনা ও রহস্যময় হত্যার ঘটনা সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশে আতঙ্ক ও রাজনীতিতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ রিপোর্টে আরো বলা হয়, ক্রমবর্ধমান গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে এরই মধ্যে উচ্চ আদালত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার গ্রুপগুলো দাবি করছে, ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে শতাধিক মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২১ জনকে মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে গত সপ্তাহে ঢাকায় গাড়িচালকসহ সাবেক এমপি ও বিরোধী দল বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর রহস্যময় নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়, ২০১০ সালের জুলাই মাসে বিএনপির আরেক নেতা চৌধুরী আলম কোথায় আছেন সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পুলিশ কর্মকর্তা ও র‍্যাবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলন আদালত।

এশিয়ান মানবাধিকার কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর অব্যাহত নির্যাতনের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এ দেশটির সরকার কাউকেই নিরাপত্তা দিতে পারছে না, এখানে কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। হংকংভিত্তিক সংস্থাটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দোষীদের দায়মুক্তি থাকার কারণে এসব হামলায় তারা সাহস পাচ্ছে। সংস্থাটি আরো জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দায়িত্বহীন মন্তব্যেও সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হচ্ছে। সংস্থাটি এসব হামলার ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করেছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে আবারো সাংবাদিকেরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন। অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ ডট কমের অফিসে হামলা হয়।

এতে বলা হয়, এসব উপর্যুপরি হামলা বাংলাদেশে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে। এএইচআরসি জানায়, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি এক সাংবাদিক দম্পতির (সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি) খুনের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে বলেন, 'সরকার কাউকে বেডরুমে নিরাপত্তা দিতে পারবে না'। তারা ১১ ফেব্রুয়ারি তাদের বাসায় খুন হন। এতে প্রমাণিত হয় যে সরকার কাউকে কোথাও নিরাপত্তা দিতে পারে না, সেটা বেডরুম কিংবা প্রকাশ্য

www.amarboi.org

স্থান যেখানেই হোক। বিষয়টি নিয়ে নাগরিকদের স্থিরভাবে চিন্তা করা দরকার। সাংবাদিকদের ওপর অব্যাহতভাবে শারীরিক হামলা বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত মারাত্মক আঘাত। সাংবাদিক সংস্থাগুলো তাদের সহকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ করছে এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করছে। এশিয়ান মানবাধিকার কমিশন (এএইচআরসি) সাংবাদিকদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। এএইচআরসি সাংবাদিকদের ওপর হামলার সব ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত দাবি করছে। দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি হওয়া উচিত। (নয়া দিগন্ত ৩০ মে ১২)

গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উত্তম শাসনব্যবস্থা বলে পরিচিত। গোটা বিশ্ব আজ গণতন্ত্রের জয়গানে মুখরিত হলেও আমরা এখনো অন্যের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র আর কাগুজে গণতন্ত্রেও মধ্যেই অবস্থান করছি।

গণতান্ত্রিক শাসনের বিকল্প আজও কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেক শাসক শ্রেণীই তাদের নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতায় চৌহদ্দি ঠিক রেখে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমরা স্বাধীনতার ৪০ বছর অতিক্রম করেছি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে প্রকৃত গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারিনি। এর রহস্যাবৃত কারণ মিলিয়ে দেখা যাক এবার- গ্যাটিসবার্গে প্রদত্ত পূর্ণ বক্তব্য হল, 'That this nation, under God, shall have a new birth of freedom; and that the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth'। শাসন ক্ষমতায় যাবার একটিই মাত্র পথ হলো জনগণের রায়। জনগণের রায়ে শাসন ক্ষমতায় গিয়ে শাসক নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন করতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল জনমত, তাই জনগণের মত প্রকাশের অধিকার থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনে মত প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল গঠন মতপ্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত থাকে। রাষ্ট্রে বিরোধী দল অবশ্যই থাকবে। বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মেনে না নিলে তা গণতান্ত্রিক শাসন হতে পারে না।

জনগণ ইচ্ছামত সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি জনমত। তাই মত প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকতে হবে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "তোমার মতামতের সাথে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার আমি জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।"

গণতন্ত্রের মূলকথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার সার্বভৌম ইচ্ছার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি। এই ইচ্ছাকে অস্ত্রের জোরে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কেউ যদি দাবিয়ে রাখে তাহলে সেই নিপীড়ককে প্রয়োজনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করার অধিকারকে স্বীকার করাটাও গণতন্ত্র। আমার অধিকার যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কেউ হরণ করে নেয় তবে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে

www.amarboi.org

পুনরুদ্ধার করাটাকে নৈরাজ্য বলা যায় না। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারকে অপসারণের জন্য জনগণ যখন সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ প্রভৃতি আন্দোলনকারী সংস্থার মাধ্যমে যখন জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হতে থাকে, তখন একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উদ্ভবের সম্ভাবনাও ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করতে পারে। আন্দোলনকে বিকশিত করার এই পদক্ষেপগুলো মোটেও নৈরাজ্যমূলক নয় কিম্বা অনিয়মতান্ত্রিকও নয়। এটাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার।

আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সংস্থা যতো বেশি জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে ততই জনগণের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ক্ষমতা এই সংস্থার হাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তখন বিরাজমান রাষ্ট্র ও সরকারকে পরিবর্তন করাটাই তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি হিসেবে নাগরিকরা যে সংস্থাকে তাদের ইচ্ছার প্রতিনিধি গণ্য করে সেই সংস্থার বিজয়ই হলো সার্বভৌমত্বের বিজয়। বর্তমানে ১৮ দলীয় জোট, বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তারই অংশ।

জনগণের রায় যেহেতু ক্ষমতার মূলভিত্তি তাই গণতান্ত্রিক সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না। জনসাধারণের মতের বা স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করলে সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকার অযোগ্য। আবার সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে জনগণ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারে। প্রয়োজনে জনগণ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে। এই বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করার পথই হচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের পথ। অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থান মোটেও নৈরাজ্যের বা হানাহানির পথ নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এটাই সত্যিকারের নিয়মতান্ত্রিক পথ। যেটি আজ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হয়েছে।

বর্তমান মহাজোট সরকার দেশকে আজ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসলেও তাদের সফলতার তুলনায় ব্যর্থতার পাল্লাই অনেক বেশি ভারী। এই সরকারের নিকট এখন দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড ছাড়া ভালো কিছু প্রত্যাশা করা এখন দুঃস্বপ্নের মতই!!!

তাই আসুন খনিজসম্পদ ও মানবসম্পদে ভরপুর অপরূপ কৃর্তি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দেশ, জাতি সমাজ, মানবতা ইসলাম, গণতন্ত্র স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে গড়ে তুলি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। নিশ্চিত করি সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব। সকল বিভেদের অবসান ঘটিয়ে গড়ে তুলি জাতীয় ঐক্য। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার, এটাই হোক অনাগত প্রজন্মের নিকট আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং ষোল কোটি মানুষের শপথ।

● জুলাই ২০১২

www.amarboi.org

সিন্ডিকেট নিউজ কার স্বার্থে?

পৃথিবীতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এর বিচরণ, শিক্ষাসংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্ম-দর্শন, বিনোদন তথা মানবসভ্যতার বিকাশের মূল বাহন হচ্ছে সাংবাদিকতা। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ধ্যান-ধারণার বিবর্তন সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারক হলো সাংবাদিকতা। মানুষের জীবন আচরণের নিত্যসাথী সাংবাদিকতা শুধু ইতিহাসই নির্মাণ করে না, ইতিহাস নির্মাণেও সাহায্য করে। এ সকল বিবেচনায় সংবাদপত্রকে একটি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের কারিগর হিসেবে সাংবাদিকরা অনেক পরিশ্রম করে প্রতিদিন আমাদের সামনে অনেক অজানা খবর নিয়ে আসেন। দেশের উন্নতি, অগ্রগতি এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে সাংবাদিক, তথা প্রিন্টমিডিয়া ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের মানুষ এই সৎ, দক্ষ দেশপ্রেমিক, সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন পেশাদার এই শ্রেণীর সাংবাদিক ও মিডিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইদানীংকালে আরেক শ্রেণীর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়া অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণ তোষামোদ, মিথ্যাচার ও সিন্ডিকেট নিউজে জড়িয়ে পড়ছে। এটি ঐ সাংবাদিক ও মিডিয়ার জন্য যতটুকু না ক্ষতিকর তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতিকর আমাদের দেশ, জাতি ও সাধারণ নাগরিকদের জন্য। এর থেকে আরো ভয়াবহ ক্ষতিকর আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য, যারা অসত্য ও বিকৃত খবর ধারণ করে বেড়ে উঠছে। গণমাধ্যম আমাদের নাগরিকদের নতুন নতুন পথ দেখাবে তারা যদি বিপথগামী করে, যারা আমাদের হিংসা-বিদ্বেষ বিভক্তি দূর করে জাতীয় ঐক্য ও মূল্যবোধের পথ আবিষ্কার করবে, তারাই যদি আমাদের অসত্য বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে খবর পরিবেশন করে থাকেন, তাহলে তো আমাদের দাঁড়ানোর শেষ জায়গাটুকুও অবশিষ্ট থাকে কি?

সম্প্রতি এই কালচারটা যেন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক জুলিয়াস হ্যারিস ও স্ট্যানলি জনসন বলেছেন, "সংবাদ হচ্ছে সব চলতি ঘটনার সংমিশ্রণ, যে বিষয়টিতে সাধারণ মানুষের কৌতূহল আছে এবং পাঠককে আগ্রহী করে তোলে তাই সংবাদ।" কিন্তু আজ কতিপয় সংবাদপত্র পাঠককে কৌতূহলী ও আগ্রহী করতে অতিরঞ্জিত ও অসত্য এবং আজগুবি খবরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানোই যেন মূল উদ্দেশ্য। এখনতো অনেক মিডিয়ার মালিকই শিল্পপতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু কতগুলো পেশার ব্যক্তিদের ব্যবসায়ী চিন্তার উর্ধ্বে না উঠতে পারলে জাতি হিসেবে আমাদের কপালে অধঃপতন ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না। সেই পেশাগুলোর বিরুদ্ধে আজ কমবেশি বিস্তর অভিযোগ রয়েছে যেমন, ডাক্তার, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, বিচারক ও সেবা সংস্থার। তাদের পেশাদারিত্বের মূল্যবোধ

www.amarboi.org

বজায় রাখার মানেই জাতির শিরকে সমুন্নত করা কিন্তু তা কি আমরা পারছি? আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল পেশার মানুষেরই অর্থের টার্গেট হওয়া উচিত নয়, বরং জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু অর্থ না হলেই নয়। আমাদের গণমাধ্যম জগতের অনেকেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জাতির সামনে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন।

আজকাল রাজনীতিবিদদের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে কতিপয় গণমাধ্যম। এখনতো আমাদের দেশের ছোট একটি শিশুও জানে কোন পত্রিকা ও চ্যানেল কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী। কেউ আবার একটু নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করলেও সবাই মিলে টেনেহিঁচড়ে যে কোন দলে ভিড়তে বাধ্য করে। নচেৎ তার টিকে থাকায় যেন দায়।

আমাদের কতিপয় গণমাধ্যম যেন গোয়েবলসীয় সূত্রের বাতিকে দারুণ আক্রান্ত। গোয়েবলসীয় শব্দটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ পরিচিত। অধিক মিথ্যাচার করলে এ শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। মূলত গোয়েবলস জোসেফ ছিল হিটলারের অনুসারীদের অন্যতম। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। পরে বার্লিনের অন্যতম নাৎসি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মিথ্যা বারবার কিংবা দশ বার জোর দিয়ে বলতে পারলে তা সত্যতে রূপান্তরিত হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি তার এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান প্রচার যন্ত্রকে পরিচালিত করেন এবং বার্লিনের পতনের সময় হিটলারের এই বিশ্বস্ত সহচর তার সাথেই ছিলেন। গ্রেফতার এড়াতে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। তার এই কৌশল থেকে এখনও মিথ্যাচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু গোয়েবলসীয় এই মিথ্যাচারে যারা লিপ্ত হয়ে যাদের চরিত্র হননের কাজটি করা হয় তা কি আর ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব? এ সম্পর্কে আমি পাঠকদের নিকট তিনটি কেইস স্টাডি তুলে ধরলাম-

এক. প্রথমে আমার নিজের জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা মনে পড়ে, আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্ভবত ২০০১ সাল। একটি জাতীয় প্রভাবশালী ও প্রথম কাতারের পত্রিকায় একটি নিউজ ছাপা হলো। নিউজের হেড লাইন- "এমন নির্যাতন আইয়্যামে জাহিলিয়াতকে হার মানায়" রিপোর্টে বলা হয়, ছাত্রশিবিরের অমুক অমুক মিলে গভীর রাতে মাদার বকস হলে ছাদে অমুকের চোখে মরিচ ভেঙে দিয়ে হল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার অপরাধ তিনি হিন্দু– এভাবে বিস্তারিত নিউজ ছাপা হয়েছে। এ খবরে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় তোলপাড়। তা আবার মৌলবাদীদের দ্বারা সংখালঘু নির্য়াতনের ঘটনা বলে কথা । আওয়ামী--বাম জোটের ছাত্র-শিক্ষকরা ভিসির নিকট এ অমানবিক ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করল। তদন্ত কমিটি হলো। তদন্ত দেখা গেল, যে ছাত্রের চোখে মরিচ ভেঙে দেয়া নিয়ে নিউজ সে তখন হলে অনুপস্থিত। এর অনেক আগেই সে বাড়িতে

www.amarboi.org

গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছেলটিকে তলব করল। তখন সে বলল, এ রকম ঘটনা তো ঘটেইনি আমি তো তখন বাড়িতে। এবার পত্রিকার প্রতিবেদকে এ জাতীয় নিউজের কারণ জানতে চাইলে প্রতিবেদক বলল, স্যরি, শিবিরের অমুককে ফাঁসাতে এমন রিপোটটি করেছি। ঐ ছাত্র-শিবিরের নিকট অনুরোধ করে বলল, এই সেনসেটিভ নিউজের প্রতিবাদ গেলে পত্রিকা অফিস আমার চাকরি রাখবে না। স্যরি ভাই, অন্য সময় আরেকটি ভালো নিউজ করে আপনাদের পুষিয়ে দিব এইতো আমাদের রিপোর্টার নিউজের সত্যতা। আমি ঐ পত্রিকার নাম ও সাংবাদিকের নাম ইচ্ছা করে উল্লেখ করিনি। ঐ সাংবাদিক এখন ঢাকায় অন্য আরেকটা পত্রিকায় কাজ করেন। এই কিছুদিন আগেও প্রেস ক্লাবে তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তিনি অবশ্য এখনো পুষিয়ে দেয়া নিউজটি করেননি।

দুই. কিছু দিন আগে এক পরিচিত সাংবাদক ফোন করে বললেন, রেজাউল ভাই স্যরি আমাকে এইভাবে একটি নিউজ সাজাতে হচ্ছে। যদিও আমি জানি এই কথাগুলো অসত্য। কারণ কয়েকটি পত্রিকা ইতোমধ্যে এভাবে নিউজটি করে ফেলেছে বিধায় আমার করার কিছু নেই। স্যরি ভাই আমার পত্রিকার পলিসি। না হলে আমার চাকরি থাকবে না বুঝেন তো ভাই আমরা ইচ্ছা করলেও সব করতে পারি না। হায়রে হলুদ সাংবাদিক কাকে বলে।

তিন. গত ১৭ মার্চ মগবাজার আলফালাহ মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবিরি ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা কর্তৃক আয়োজিত সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিলে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী আমীরের বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে প্রথমে নিউজ করে একটি অন-লাইন পত্রিকা। যদিও পত্রিকা রিপোর্টার এই মিথ্যা রিপোর্টের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। এর পর শুরু হয় সিন্ডিকেট নিউজ। কথিত ইসলামী তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিবের দায়েরকৃত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার একটি মিথ্যা মামলা করা হয়, যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মজার ব্যাপার হলো ওই আলোচনা সভায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কেউই উপস্থিত ছিলেন না। অথচ মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূলের সাথে মাওলানা নিজামীর নাম তুলনা করা হলে তিনি টেবিল চাপড়িযে উল্লাস প্রকাশ করেন। মিথ্যা কাকে বলে কত প্রকার ও কী কী? সবই এই রিপোর্টে ধারণ করা হয়েছে। আর এই মিথ্যা মামলায় আমাদের বিচারক সরকার জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করে পরবর্তীতে এই যুদ্ধাপরাধ, দশ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র, ২১ আগস্ট মামলা দিয়ে রিমান্ড চালাতে থাকে। এই চেনা চরিত্র হননের মহোউৎসব। ইতিহাসের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার, আর কত চলবে তাই দেখার দিন।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দু'টি এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি মোট তিনটি কেসস্টাডি তুলে ধরলাম। আমার উদ্দেশ্য কাউকে ঘায়েল করা নয়। বরং অবিরাম যে সাংবাদিক ও মিডয়া ন্যায়-এর পক্ষে সংগ্রাম করছেন তাদের সাথে শরিক হওয়ার সামান্য প্রয়াস মাত্র।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য, প্রথমটি কেসস্টাডি টিতে সাংবাদিক বা রিপোর্টার নিজেই অসত্য নীতি অবলম্বন করেছেন, পত্রিকা নয়। আর দ্বিতীয়টিতে সাংবাদিক তার সত্য নীতির ওপর টিকে থাকতে দেয়নি পত্রিকার স্টানবাজি বা পলিসি। তৃতীয়টিতে রিপোর্টার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নিউজটি করেছেন। এই দুনিয়াতে এগুলোর বিচার না হলেও আল্লাহর আদালত থেকে এই মিথ্যাবাদীরা ছাড়া পাবে কি?

আমাদের সমাজে কিছু ভালো গণমাধ্যম ও সৎ পেশাদার সাংবাদিক না থাকলে আমরা এত দূর আসতে পারতাম না। আমাদের উন্নতি অগ্রগতি সত্যও-ন্যায় ঐক্য ও সংহতির আবিষ্কারক আমাদের সংবাদপত্র। সংবাদপত্র আমাদের জাতীয় দর্পণ এগিয়ে নেয়ার কারিগর। গণমাধ্যম আমাদের এগিয়েও দিতে পারে আবার ধ্বংসের অতল গহবরেও নিমজ্জিত করতে পারে। তাই দেখা যায় 'নিউইর্য়ক জার্নালের প্রকাশক র‍্যাডলফ হার্স্ট বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে আমেরিকা ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিলেন।

আবার ভলতেয়ারের বই পড়ে ফ্রান্সের জনগণ তাদের দেশে বিপ্লব ঘটানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

স্যার এরিখ হাজনস বলেছেন, সাংবাদিকতা হচ্ছে সঠিক, করিতজ্ঞাত ও ত্বরিতগতিতে তথ্যাদির এদিক ওদিক এমনভাবে প্রেরণ যাতে করে সত্য পরিবেশিত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও সব তথ্যের যথার্থই ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের অনেক সংবাদপাঠককে আশ্চর্যন্বিত উত্তেজিত করলেও পরবর্তীতে এর অসত্য ও বানোয়াট দিকটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত।

এরকম শত শত ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনা তুলে ধরলাম। সম্প্রতি জামায়াতের শীর্ষনেতাদের গ্রেফতারের পর কয়েকটি গণমাধ্যম অনেক আজগুবি বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে নিউজ পরিবেশন করে গোয়েবলসকে হার মানিয়েছে। হয়ত গোয়েবলস এখন জীবিত থাকলে কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ, সমকাল যুগান্তর আ-সময় এর সাংবাদিকদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। তাদের সাথে যোগ হলো আমাদের কিছু গোয়েন্দা সংস্থার অতিউৎশাহী কর্মকর্তা। যাদের বরাত দিয়ে সিন্ডিকেট নিউজ চলতে থাকল, জেএমবি নেতা সাইদুর, নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী মুখোমুখি। সারা দেশে তোলপাড়। তাও আবার কে কী বলেছে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বড় বড় হেড লাইনের খবর। অথচ কারাগারে নেয়ার সময় মতিউর রহমান নিজামী বললেন তাদের সাথে জেএমবি নেতা সাইদুরের সাক্ষাৎই হয়নি। এ হলো হলুদ সাংবাদিকতার নতুন রূপ। বলুন তো তাহলে ঐ সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সম্পর্কে দেশের জনগণ কী ধারণা লাভ করবে। সাঈদী সাহেবের সাক্ষীদের এ হেন মিথ্যা।

আমি বিনয়ের সাথেই বলব Freedom of speech বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা Freedom of press বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এ কথাগুলোর নেতিবাচক প্রয়োগ আজ সাংবাদিকতা পেশায় অহরহ। এর ফলে লাভবান

www.amarboi.org

একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল। অথচ যার কলমের মাধ্যমে এই বিকৃত উপস্থাপনা তার হয়ত নিতান্তই অজানা এই নিউজের বেনিফিশিয়ারি কে বা কারা। এটি ব্যক্তির লোভলালসা, হিংসা বিদ্বেষ, অশিক্ষা আর এই মহান পেশার দায়িত্বভার সম্পর্কে না জানার কারণে হয়ে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন মিডিয়া কর্মীকে চিনি। যারা খুবই অল্প শিক্ষিত ও নিম্ন পরিবার থেকে উঠে আসা। এখন অনেক পাওয়ারফুল সাংবাদিক। এটিও তা বিশেষ যোগ্যতা হতো যদি এত কম পুঁজি নিয়েও এই মহান পেশার মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পারছেন না। কেন? তিনি তার কলমের শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। তাই ঐ সাংবাদিক অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছে কখন এই ঢিলের আঘাতে ক্ষতিকর বস্তু নিঃশেষ হচ্ছে, আবার কখনও কোন কল্যাণকর জিনিস ধ্বংস করে দিচ্ছে ,আবার কখনও এ ঢিলের আঘাত কোন সম্মানিত ব্যক্তির চরিত্র হনন করছে, যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক। যার সম্পর্কে ঐ সাংবাদিকের জানাই নেই। এই জন্যই কথায় বলে- "বোকা বন্ধু থেকে বুদ্ধিমান শত্রু উত্তম।"

আজকাল পশ্চিমারা আমাদের মিডিয়া দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করছে। Freedom of speech বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা Freedom of press বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিজেদের অর্থ দিয়ে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সারাবিশ্বে মিডিয়ার বিষবাষ্প ছড়াতে প্রোপাগাণ্ডাকারীদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন অন্যতম ইহুদি চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী বানার্ড লুইস ও স্যামুয়েল হান্টিংটন, যারা 'Clash of Civilization (সভ্যতার দ্বন্দ্ব) তত্ত্ব বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে। বিশ্ব জায়নবাদীগোষ্ঠী এই তত্ত্বকে মিডিয়ার নিকট অর্পণ করেছেন। মিডিয়া বিভিন্নভাবে সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মনমস্তিষ্কে এ কথা মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের শত্রুতার গতিপথ এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রুখ করেছে।

১৯৯০ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ইহুদি গুরু হেনরী কিসিঞ্জার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার এক বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, 'এখন পরিস্থিতি হচ্ছে, বর্তমানে পাশ্চাত্যের সামনে নতুন দুশমন হলো ইসলাম, যা ইসলামী বিশ্ব ও আরব বিশ্বের বিশাল এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত।'

২০০১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে কিসিঞ্জার দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেন, ইসলামী সন্ত্রাস ও চরম পন্থার বিরুদ্ধে আগামীকালের পরিবর্তে আজই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।' 'একই তারিখে ব্রিটিশ দৈনিক সানডে টেলিগ্রাফ একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিলো, 'ইসলাম কি আমাদের দাফন করে দেবে?' একই তারিখে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইমস তার সম্পাদকীয়তে পাশ্চাত্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়ার চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইসলামী ফান্ডামেন্টালিজম তথা ইসলামী মৌলবাদ ফণা তুলেছে। অতি দ্রুত এই বিষাক্ত

www.amarboi.org

সর্পের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া উচিত।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ইকোনোমিস্ট পত্রিকা তার প্রথম পাতায় ইসলামকে টার্গেট বানিয়ে একটি কার্টুন ছেপেছে, যাতে এক আরব ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে একটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একই তারিখে সাপ্তাহিক টাইস একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যাতে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বকে ইসলামের বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। পত্রিকাটি তার কভার পৃষ্ঠায় মসজিদের মিনারার ছবি ছেপেছে, যার পাশে এক ব্যক্তি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯২ সালে অভিজ্ঞতার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথমবার হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার পর হলিউড 'প্রকৃত মিথ্যা' নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করে, যার মূল কথা ছিল, আমেরিকায় একটি গোপন আরব মিলিশিয়া সক্রিয় রয়েছে। যাদের শ্লোগান 'মুসলমানদের স্বাধীনতা'। এই মিলিশিয়া আমেরিকায় বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার আওতায় তারা আমেরিকার বিমান অপহরণ করে নিউইয়র্কে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করেছে। ইতোমধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক অফিসার ও তার স্ত্রী তাদের আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যান। তারা উভয়ে সন্ত্রাসীদের এই হামলা ব্যর্থ করে দেন। এভাবে তারা নিউইয়র্ককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান অপহরণ' নামে দ্বিতীয় আরেকটি ফিল্মে বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র দাগেস্তানের কিছু লোক দীর্ঘ দিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের আওতায় তারা বুশকে হত্যার জন্য তাঁর বিমান অপহরণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা ছড়ানোর অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে হলিউড আরেকটি ফিল্ম নির্মাণ করে। সেটি ছিল হলিউডের এ যাবৎকালে সবচেয়ে ব্যবসা-সফল ফিল্ম। তাতে দেখানো হয়েছে, শান্তি-নিরাপত্তার প্রবক্তা ও গোটা মানবতার কল্যাণকামী আদর্শ দেশ আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর মানবতার দুশমন মুসলমানরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এ কাজের সূচনা করেছে। গোটা দুনিয়ার যদি ভয় ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে তাহলে সে আশঙ্কা মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের থেকে।

বিশ্বব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর পশ্চিমা মিডিয়া, গবেষক, চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলো মুখে মুখে সর্বদা একই আলোচনা শুরু হয়, কমিউনিজমের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ পলিটিক্যাল ইসলাম (Political Islam) এ 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বটি মৌলিকভাবে বার্নার্ড লুইস (Bernerd Lewis) এর আবিষ্কার, যা স্যামুয়েল হান্টিংটনের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই তত্ত্বটির ফলে পশ্চিমা গবেষক ও চিন্তাবিদদের মন-মস্তিষ্কে এ কথা ছেয়ে গেছে, ইসলাম ও পশ্চিমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। আফগানিস্তান ও

www.amarboi.org

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে হয়েছে। সেটি আজ ধেয়ে আসছে এশিয়ার এ ভূখণ্ডের দিকে । এ অঞ্চলের সুপার-পাওয়ার হবে তাদের স্যোলএজেন্ট ভারত আর ভারতের পরিকল্পনায় পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের উপর এই অমানবিক নির্যাতন। আর তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মরিয়া তাদের পরিচালিত কতিপয় মিডিয়া ও বেতনভুক্ত কিছু বুদ্ধিজীবী।

একবার আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (ABC)-এর এক প্রতিনিধি জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালিকে সোমালিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে ড. ঘালি বলেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্য প্রেরণ এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাধারে দীর্ঘ ১০ মাস মিডিয়া ও গণমাধ্যমকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা ড. ঘালি বোঝাতে চেয়েছেন, সোমালিয়ায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্ববাসীর সামনে গ্রহণীয় বানানোর জন্য সর্বপ্রথম মিডিয়ার মাধ্যমে সোমালিয়ায় ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কাহিনী দুনিয়াবাসীর কাছে ভয়াবহ আকার বানিয়ে পেশ করা হয়েছিল। ড. ঘালি বলেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে কেবল এ সংবাদ ও চিত্রই পেশ করতে লাগলাম যে, সোমালিয়ার জনগণ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ-শোকে মৃত্যুবরণ করছে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ সোমালি জনগণের এমন করুণ ও মজলুম চিত্র দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করতে থাকে যাতে বিশ্ববাসী বুঝে, এই মরুভূমিতে না পানি আছে, না খাবার আছে, না মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, আর না আছে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানকার জনগণ সকল মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। যদি কোথাও থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসে তাও আবার অসভ্য ও জংলী মানুষগুলো সেগুলো নিয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এভাবে অব্যাহত প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে আগ্রাসনের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেলে বিশ্ববাসীর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সেখানে বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া জনগণকে রক্ষার আর কোন পথ নেই। আজও জঙ্গিবাদের জিগির তুলে অনেকেই বাংলাদেশে আসার স্বপ্ন দেখছেন।

ড. ঘালী বলেন, আমরা আমাদের শত্রুদের হাতে এমন কোনো কার্যকর ও শক্তিশালী সংবাদপত্র থাকতে দেব না, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতামত সক্রিয়ভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। আর না আমরা তাদের এমন যোগ্য হতে দেব, যাতে তারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনো সংবাদ সমাজ পর্যন্ত পৌছাতে পারে। আমরা এমন আইন প্রণয়ন করব, যাতে কোন প্রকাশক বা প্রেস মালিক আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো বিষয় ছাপতে পারবে না। এভাবেই আমরা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র কিংবা শত্রুতামূলক প্রোপাগাণ্ডা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবো।

আমাদের আয়ত্তে এমন সংবাদপত্র ও প্রকাশনা থাকবে, যা বিভিন্ন গ্রুপ, দল, পার্টি ও সম্প্রদায়কে সমর্থন দেবে। এসব দল, পার্টি ও সম্প্রদায় গণতন্ত্রের প্রবক্তা

www.amarboi.org

কিংবা বিপ্লব সমর্থক হোক। এমনকি আমরা এমন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতাও করব, যা অনৈক্য, বিপথগামিতা, যৌন সুড়সুড়ি, নৈতিক অবক্ষয়, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ও জালেম স্বৈরশাসকদের প্রতিরোধ ও সমর্থন করবে। আমরা যখন যেখানে ইচ্ছা জাতিগোষ্ঠীসমূহের চেতনা উত্তেজিত করব আবার যখন ভাল মনে করব তখন ঠাণ্ডা করে দেব। এর জন্য সত্য-মিথ্যা উভয়েরই আশ্রয় নেব। আমরা এমনভাবে সংবাদগুলো উপস্থাপন করব যাতে জাতি-গোষ্ঠী ও সরকারসমূহ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। বিরাট ধুমধাম ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করব। আমাদের লিটারেচার ও সংবাদপত্রগুলো হিন্দুদের দেবী বিষ্ণুর মতো হবে, যার শত শত হাত রয়েছে। আমাদের প্রেস প্রকাশনার মৌলিক কাজ হবে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে জনমত গঠন করা। আমরা ইহুদিরা এমন সম্পাদক, পরিচালক, সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের সাহস জোগাবো এবং উৎসাহ দেব, যারা হবে দুশ্চরিত্র এবং যাদের অতীত অপকর্ম ও দুষ্কর্মের রেকর্ড রয়েছে। ঠিক একই পদ্ধতি গ্রহণ করব দুশ্চরিত্র রাজনীতিক লিডার ও স্বৈরাচারী শাসকদের ক্ষেত্রেও।

এদের আমরা খুব কভারেজ দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করব, কিন্তু আমরা যখন উপলব্ধি করতে পারব, তারা আমাদের হাত থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তখন আমরা তাদের এমন শিক্ষা দেব যা অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয় হবে। যেমন সাদ্দাম হোসেন। আমরা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে ইহুদি প্রচার মাধ্যমেগুলো নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা বিশ্ববাসীকে যে রঙ দেখাব, তাদের তাই দেখতে হবে। অপরাধসংক্রান্ত সংবাদগুলো অসাধারণ গুরুত্বের সাথে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করবে, যাতে পাঠকের মেধা, মনন প্রস্তুত হয়ে সেও অপরাধীর সহমর্মী হয়।

আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের অপছন্দের নেতাকে যে চারটি উপায়ে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের এক নম্বর শত্রু হিসেবে তুলে ধরবো, তা-হলো: Stage one is the crisis-সংকট সৃষ্টি করা। Stage two is the demonization of the enemy leader-নেতাকে দানব হিসাবে তুলে ধরা, Stage three is the dehumanizing of the enemy as individual-ব্যক্তিগতভাবেও শত্রু মনুষ্যত্বহীন বলে প্রচার করা, Stage four is the atrocity stage- শত্রুর অত্যাচার ও নৃশংসতার গল্প তৈরি করা। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে পশ্চিমা অনুকরণে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে সে সংকট সৃষ্টির খেলায় মেতে উঠেছে। আর এ অশুভ খেলা খেলতে খেলতে যদি কেউ আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে আমাদেরকে পরাধীন জাতিতে পরিণত করে ফেলে, তাহলে হয়ত পরে আফসোস করেও এ জাতির কোন লাভ হবে না।

● **দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩ আগস্ট, ২০১০**

www.amarboi.org

মহাজোট সরকারে বামদের অদৃশ্য দাপট

মহাজোট সরকারের বামনির্ভরতার খবর প্রায় অনেকদিন থেকে আলোচিত হয়ে আসছে এবং এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অনেকেই ইতোমধ্যে আকারে ইঙ্গিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এখন অনেকটাই মিডিয়াতে আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। তা ছাড়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলায় আওয়ামী লীগের ডাকসাইটে নেতাদের রাজনৈতিক ভাগ্যবরণের বিষয়টিও তারা সামনে রাখছেন। তা ছাড়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটের মহাবিজয়, বিগত সময়ের আওয়ামী লীগের আলোচিত গডফাদার এবং ১/১১ পরবর্তী দলের মধ্যে শেখ হাসিনাকে দল থেকে বাদ দিতে তৎপর মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নে নেপথ্য নায়কদের এক লাঠি দিয়ে শাসন করে শেখ হাসিনা নিজ দলের মধ্যে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন শক্তিশালী অবস্থানে আছেন। কিন্তু 'ওভার এন্টিবায়োটিক' ফর্মুলায় বাস্তব রোগ যেমনি আপাতত ঢেকে থাকে, তেমনি শেখ হাসিনার 'ওভার পাওয়ার' কিছুটা দলের অভ্যন্তরীণ নাজুকতাকে আড়াল করে রেখেছে। অনেকেই মনে করছে যে কোন সময় তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তার আলামত হলো সম্প্রতি ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সাথে ভারতীয় দূতাবাসে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা বঞ্চিত চার নেতার গোপন বৈঠক।

যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের জন্য তা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয় এবং এ পথ ধরেই দলের অভ্যন্তরে স্বৈরতান্ত্রিকতার জন্ম হয় আর পরে তা একনায়কতান্ত্রিকতার পথকে সুগম করে। যেমনটি হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল কায়েমের ক্ষেত্রেও। শেখ মুজিবুর রহমান সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন নিজ দলের চাটুকারদের মাধ্যমে। যারা পীর-মুরিদানের মত সংশোধন, সমালোচনা, না করে অতি আনুগত্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে গিয়ে দলের বারটা বাজিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাদের আচরণ, আনুগত্য, ফোঁসফাঁস না মারার নীতি ভালো মনে হলেও সুদূরপ্রসারী তাদের নিকট অকল্যাণ ছাড়া কিছুই আশা করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই শ্রেণীর বামরাই প্রলুব্ধ করে বাকশাল কায়েম করিয়ে ছিলেন যদিও আজ ইতিহাসের বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য এটিই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ লগি- বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্য মানুষ হত্যা করে লাশের ওপর

www.amarboi.org

নাচানাচি করে উল্লাস প্রকাশ করেছে বাম ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা। ইতিহাসের এই জঘন্যতম তাণ্ডব গোটা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। অনেকেই মনে করছে ১/১১-এর আগে ও পরে নেপথ্যে বাংলাদেশের বামবুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের ভূমিকা আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে বেশি বিপথগামী করেছে। একথা সবার জানা, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য বামরাই দায়ী, এখন আবার সংস্কারপন্থী ও ক্ষমতাবঞ্চিতরা মিলে দলে কোন নতুন ছোবল মারা, তাও মনে হয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখন আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে আওয়ামী লীগকে গভীর সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কি না তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী!

সত্তরের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বাম রাজনীতির অনেকটাই ছন্নছাড়া অবস্থা দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রীরা ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা দখলেই তারা বিশ্বাস করে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা শুরু হয় মূলত ষোড়শ শতাব্দী থেকে। চার্লস ফ্যুরিয়ার, সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ এ ঘরানার দার্শনিক। প্রুধো অবশ্য নৈরাজ্যবাদিতায় বিশ্বাস করতেন। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০-এর দশক থেকেই শুরু হয় সমাজতন্ত্রের পতন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতন্ত্রকে বর্জন করে তাদের মুক্তির জন্য শাশ্বত বিধান আল-ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেখান থেকে সমাজতন্ত্রীদের আক্রোশের বস্তুতে পরিণত হয় ইসলাম। বিশ্বরাজনীতিতে এ পিছিয়ে পড়া ভাব কাটিয়ে উঠতে অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এর মধ্যে তওবা করে বাম অনেকে রাজনীতি ছাড়লেও বিরাট অংশ এখন অন্য দলের আড়ালে থেকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সবচেয়ে বেশি তৎপর। সেই অভিযোগটি এখন তুঙ্গে মহাজোট সরকারের বাম ঘরানা মন্ত্রী, এমপি এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

গত ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ২০১০ বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর এমনি এক রিপোর্টে নড়েচড়ে উঠলেন সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। রিপোর্টে বলা হয়- "শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের মন্ত্রিসভায় সাবেক কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থকরাই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। কমিউনিস্ট ছাড়াও সাবেক বামধারার সমর্থকদের অদৃশ্য জোট মন্ত্রিসভায় বিশেষভাবে আলোচিত। জ্যেষ্ঠতার তালিকায়ও সাবেক কমিউনিস্টদেরই অগ্রাধিকার। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন, তাদের প্রায় সবাই এসেছেন বামধারার রাজনীতি থেকে। আর মূল ধারার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বা এক সময় ছাত্রলীগ করতেন, এমন মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভায় তুলনামূলক গুরুত্বহীন। কারণ তাদের বেশির ভাগই

www.amarboi.org

এসেছেন মফস্বল এলাকা থেকে এবং সেখানেও তারা ছিলেন মধ্যম সারির নেতা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কার্যত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার চালাচ্ছে কমিউনিস্টরাই। সরকারে দলের নেতারা এখন গুরুত্বহীন।

মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পরই অর্থমন্ত্রীর গুরুত্ব। সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক আবুল মাল আবদুল মুহিত সেই সৌভাগ্যবান মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় জ্যেষ্ঠতার তালিকায়ও প্রধানমন্ত্রীর পরই অর্থমন্ত্রীর নাম। প্রভাবশালী এই মন্ত্রী এরশাদের জাতীয় পার্টির সরকারেও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। সিলেট সদর আসন থেকে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে হারিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে এবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন এই মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় আরেক প্রভাবশালী মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেও দলে মতিয়া চৌধুরী এখনো 'কমিউনিস্ট' হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ছাত্রলীগের সঙ্গে যখন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী। ছিলেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদকও। মন্ত্রিসভা গঠনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। শ্বশুরবাড়ির এলাকা শেরপুরের নালিতাবাড়ী থেকে মতিয়া 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে এবার এমপি নির্বাচিত হন, যদিও তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে বরিশালের পৈতৃক বাড়িতে। সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আর মন্ত্রিসভা গঠনের শুরু থেকেই এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন করা ডা. অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক। অর্থোপেডিকের খ্যাতনামা এই চিকিৎসক স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন দীর্ঘদিন। সাতক্ষীরা-৩ আসন থেকে এবার আওয়ামী লীগের টিকিটে এমপি নির্বাচিত হন তিনি। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে নিরক্ষরমুক্ত জাতি গঠনের অঙ্গীকার বিবেচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন নূরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ কেবল ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন না, আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সিলেট-৬ আসন থেকে 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে তিনি এবার এমপি নির্বাচিত হন। আইন মন্ত্রণালয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। আর এমপি না হয়েও টেকনোক্র্যাট কোটায় এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে হাতেখড়ি নেয়া ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। আওয়ামী লীগে তার আনুষ্ঠানিক যোগদান না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বরাবরই ভালো সম্পর্ক ছিল তার। স্ত্রী মাহফুজা খানমও ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী ছিলেন। ছিলেন ডাকসু ভিপিও। নানা কারণে পূর্ত মন্ত্রণালয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান। এ

www.amarboi.org

মন্ত্রণালয়ে এখনো কেউ পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পাননি বলে তিনিই কার্যত সংশ্লিষ্ট অলিখিতভাবে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাকে হারিয়ে এবার তিনি এমপি নির্বাচিত হন। প্রকৌশলী ইয়াফেস ওসমান। এমপি না হয়েও টেকনোক্র্যাট কোটায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছেন এক সময়ের ছাত্র ইউনিয়নের ডাকসাইটে এই নেতা। এক-এগারোর প্রেক্ষাপটে কারাবন্দী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ছড়া লিখে আলোচিত হন তিনি। দিলীপ বড়ুয়াকে কমিউনিস্ট ঘরানার লোক বলেই মনে করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। কারণ এখনো তিনি বামধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মহাজোটের শরিক দল হিসেবে টেকনোক্র্যাট কোটায় সরকার গঠনের শুরু থেকেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান দিলীপ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও তার বেশ ভালো সম্পর্ক। চীনে খালেদার সঙ্গে একবার সফরসঙ্গীও হয়েছিলেন তিনি। জনশ্রুতি রয়েছে, ওই সময় তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কাছে তারেক রহমানকে দেশের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। সাবেক বাম নেতা বর্তমান নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। বর্তমান মন্ত্রিসভায় তার অবস্থানও বেশ মজবুত। এর বাইরেও আরো দু-একজন প্রভাবশালী সদস্য বর্তমান মন্ত্রিসভায় আছেন, যারা কোনো না কোনো সময় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

একই পত্রিকা ঐ তারিখে জাসদ-নির্ভর প্রশাসন এর চিত্রটি এভাবে তুলে ধরেন ফসিহ উদ্দীন মাহতাব

'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের জনপ্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করছেন সাবেক জাসদ ছাত্রলীগ নেতারা। শীর্ষ আমলার পদে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এক সময়ের আলোচিত জাসদ ছাত্রলীগ নেতারা। স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন, অর্থ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে রয়েছে। এসব দাপুটে 'সচিব' পদাধিকারীর নেতৃত্বেই রাষ্ট্রের প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এদের কলকাঠিতে দলনিরপেক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তারা পদায়ন এবং পদোন্নতিবঞ্চিত থেকে শুরু করে জনপ্রশাসনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এসব আমলার ছলচাতুরীর লাগাম এখনই টেনে ধরা না হলে জনপ্রশাসনে আরো বিপত্তি দেখা দেবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

অভিযোগ থেকে জানা যায়, জাসদ ছাত্রলীগের একসময়ের এসব নেতা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে সরকারের জনস্বার্থমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচে দীর্ঘসূত্রতায় আটকে রাখছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনস্বার্থমূলক কর্মকাণ্ড দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য একাধিকবার মৌখিক

www.amarboi.org

নির্দেশনা দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পত্র দিয়ে সচিবদের তাগিদও দেয়া হয়েছিল। এর পরও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এসব সচিব পদাধিকারী ক্রীড়নক বিভিন্ন সময়ে উপেক্ষা করে আসছেন। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্ত্রীদের দেয়া নির্দেশনা তারা সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমলাতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত রাষ্ট্রের এই শীর্ষ পদাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফাইলে সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটানো এখন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সূত্র মতে, যে ফাইল সচিবদের দিয়েই নিষ্পত্তি হওয়ার কথা, সেই ফাইল এসব সচিবের অদৃশ্য ইশারায় মন্ত্রী পর্যন্ত তোলা হচ্ছে। ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ ঘটছে। প্রকারান্তরে জনপ্রশাসনে সমন্বয়হীনতা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ছাড়া প্রতিটি ফাইল মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রাখা যেন 'প্রথা'য় পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমলাদের ছলচাতুরীর এই লাগাম এখনই টেনে ধরা না হলে জনপ্রশাসনে আরো বিপত্তি দেখা দেবে বলে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। অপরদিকে জাসদ ছাত্রলীগ সমর্থিত এসব কর্মকর্তার কলকাঠিতে দলনিরপেক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তারা জনপ্রশাসনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। তারা পদায়ন ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঘুরেফিরে জাসদ ছাত্রলীগ সমর্থিতরাই পদায়ন ও পদোন্নতি পাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এক বছরে যেসব কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত কিংবা সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশই জাসদ ছাত্রলীগ সমর্থিত। তাদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী জনপ্রশাসনে পদায়ন ও পদোন্নতি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপনবিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামকে ভুল বুঝিয়ে তারা জনপ্রশাসনে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। ফলে তাদের পদায়ন ও পদোন্নতি অব্যাহত রয়েছে। জনপ্রশাসনে বড় প্যাকেজে যে পদোন্নতি হয়েছে, সেখানে তাদের অনুসারীদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। আর এসব করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপনবিষয়ক উপদেষ্টাকে অন্ধকারে রেখে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন সাবেক জাসদ ছাত্রলীগের ডাকসাইটে নেতা মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন আবদুস সোবহান শিকদার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের সচিবের দায়িত্বে শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আবু আলম শহীদ খান, বিএসটিআইয়ের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা ফজলুল আহাদ। এ ছাড়া জনপ্রশাসনের পাদপীঠ সংস্থাপনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন জাসদ ছাত্রলীগের অন্যতম সাবেক নেতা ইকবাল মাহমুদ। তারা নিজেদের অনুগত কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পোস্টিং দিয়ে জনপ্রশাসন পরিচালনা করছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তাদের অনুগত কর্মকর্তাদের পদায়নে সর্বদা তারা ব্যস্ত।

www.amarboi.org

এর সুযোগ নিয়ে এসব কর্মকর্তার আনুকূল্যে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জোট আমলে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তারা বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন, অর্থ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার বর্তমান সচিবদের সবাই জাসদ সৃষ্ট গণবাহিনীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার শিকার হওয়ার পর বিষয়টিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সাবেক জাসদ ছাত্রলীগের আদর্শের অনুসারী এসব সচিব পঁচাত্তর-পূর্ববর্তী ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ঘোর বিরোধিতায় ছিলেন। একানব্বইয়ের খালেদা সরকারের সময়ও ভোল পাল্টে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। পরে ছিয়ানব্বইয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তারা জনপ্রশাসনে ভালোভাবেই প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তাদের প্রভাবের জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তাদের নির্দেশেই বর্তমান মহাজোট সরকারের জনপ্রশাসনও পরিচালিত হচ্ছে। কৌশলে সরকারের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন জাসদ ছাত্রলীগের এসব সাবেক নেতা। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০)

মহাজোট সরকারের এতজন ক্ষমতাধর প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি বাম ঘরানারই হয় তাহলে আওয়ামী লীগ কোথায়? এটা আওয়ামী লীগের এক প্রকার রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব বটে। আর পাওয়া না-পাওয়ার বেদনাই কি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের এত বে-পরওয়া ও বিশৃঙ্খলতার কারণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার পিতাকে বামরাই সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলেছে, এখনও আপনার চতুর্দিকে তাদেরই আনাগোনা, দেখা যাক শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! লেখাটির ইতি টানছি-ইতালীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচির 'ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরি' গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠার কয়েকটি লাইন দিয়ে 'আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে বললাম, মি. প্রাইম মিনিস্টার, সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ.....'। তার কণ্ঠে দ্বিধা। তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কী বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'সমাজতন্ত্র'। তাতে আমার মনে হলো সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

ইসলাম ও গণতন্ত্র রক্ষার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রুশো আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও সে তার সর্বত্র শৃংখলাবদ্ধ। এর প্রায় দুই শত বছর পর ১৯৪৭ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন, "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা আজ দেখা দিয়েছে। কথাগুলো শুনে আপনার মনে হবে তারা দু'জনে হয়ত সম্প্রতি বাংলাদেশে এসে আওয়ামী দুঃশাসনের চিত্র দেখে এমনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা-না হলে হয়ত স্বপ্নযোগে আওয়মী দুঃশাসনের চিত্র কল্পনা করেছেন। 'Fundamental Rights, Basic human Rights, Birth Rights of man- প্রকৃতপক্ষে মানবিকতার উচ্চাকাংখা নিয়ে যার জন্ম তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক, মনুষ্যত্বহীনতা, অমানবিকতা ও পাশবিকতার গ্লানি এবং বিকৃত চেতনা নিয়ে এই অবৈধ সন্তানটি মানবসমাজে আজ জীবিত। এই মানব রূপী অক্টোপাসের জুলুম নির্যাতনের নিষ্পেষণে ক্ষত-বিক্ষত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ করেছে আওয়ামী সরকার। ক্ষমতা লাভের মুহূর্ত থেকেই তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সেই সঙ্গে খোদ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি-বাণিজ্য, চুরি-ডাকাতি, দখল, লুণ্ঠন, হত্যা, খুন, রাহাজানি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে। ফলে দেশজুড়ে সৃষ্টি হয় এক মারাত্মক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির। ভারতের সাথে কয়েকটি গোপন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে প্রিয় বাংলাদেশকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত প্রায় চূড়ান্ত। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী সরকারই পার্বত্য শান্তিচুক্তির নামে দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলকে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে ওই অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার

www.amarboi.org

করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাজোট সরকার। ভারতকে বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে বাংলাদেশের এক বৃহৎ অংশ (সিলেট অঞ্চলকে) মরুভূমিতে পরিণত করার নীল নকশা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশকে ধর্মহীন করার প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজও সম্প্রতি শেষ করেছে সরকার। এখনোও পর্যন্ত নতুন পাস হওয়া শিক্ষানীতি জনসম্মুখে প্রকাশ করেনি। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও অন্যান্য পেটুয়া সন্ত্রাসী-বাহিনী দ্বারা বিনা বিচারে হত্যার সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হিসেবেই ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে গত মার্চ পর্যন্ত ১২ মাসে রাজধানীতেই ৩০৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে খুন হয়েছেন ২৫ জন। দেশের জননিরাপত্তা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে সেটা স্বাধীনতা-পরবর্তী '৭২-৭৪ সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষমতার দাপট, সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতি ইত্যাদি সরকারের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধীদল ঘোষিত ও সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন জনসভা দলের অঙ্গসংগঠনের ক্যাডার ব্যবহার করে পণ্ড করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা পাল্টা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসন ও পুলিশ দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে 'শান্তিরক্ষা'র অজুহাতে বিরোধী দলের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, যা তাদের পুরনো ফ্যাসিবাদী ধারারই অনুসরণ। বাংলাদেশ এখন যেন পুলিশি রাষ্ট্র। রিমান্ডের নির্যাতন, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি এখন পুলিশের নিয়মিত কাজে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি মির্জা আব্বাসের বাড়িতে নারী-পুরুষের উপর নির্মম নির্যাতন, ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী ও ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কে সাদা পোশাকদারীরা ধরে নিয়ে গেছে। আসলে এক মাঘে যেমনি শীত যায় না, তেমনি এই সরকারও সম্ভবত শেষ সরকার নয়।

বাংলাদেশে নিম্ন আদালতের আইনের শাসন এখন নাকি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ সুবিচারের জন্য ছুটে যায় সর্বোচ্চ আদালতে। সেখানে অন্তত নিরাপত্তার আশাটুকু বুকে ধারণ করে বেঁচে আছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু শেষ আশ্রয়টুকুও এখন আর অবশিষ্ট থাকল না, জামায়াতের দু'জন শীর্ষ নেতা, সহকারী সেক্রেটারি ও প্রখ্যাত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ও জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেফতারের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সরকার কি ভুলে গেছে বিগত ম. ইউ আহম্মদ গোটা দেশে আদালত তৈরি করে, মামলা দিয়ে, গ্রেফতার করে নির্যাতন চালিয়ে ও শেষ টার্গেটে পৌঁছতে পারেন নাই। যার শিকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ আরো অনেকেই। তারা যতদ্রুত সব কন্ট্রোল করতে চেয়েছে, ততদ্রুত জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান

www.amarboi.org

করেছে। এ সরকারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক চরম সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। ক্ষমতাসীন সরকার নানাভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নানামুখী তৎপরতা শুরু করেছে। গ্যাস বিদ্যুৎ পানিসহ জনদুর্ভোগ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নির্যাতন, বিরোধী দলের ওপর দমন নিপীড়নের ও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসের ফিরিস্তি অল্প কথায় শেষ করা কঠিনই বটে। ছাত্রলীগের অত্যাচারে গোটা জাতি যখন অতিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই দিশেহারা। কখনও বলেন- ছাত্রলীগকে ত্যাজ্য করে দিলাম, কখনও বলেন- ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। সাধারণ সম্পাদক বলছেন, ছাত্রলীগের দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেবে না। সর্বশেষ আওয়ামীলগের কার্যনির্বাহীর সভায় আবার সিদ্ধান্ত ছাত্রলীগকে শুধরাতে হবে। যারা নিজেদের একটা ছাত্রসংগঠন চালাতে পারেন না, তারা দেশ চালাবে কিভাবে? মাত্র ১৮ মাসের শাসনামলে অপশাসনের এক কালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা। দিন গণনার সাথে সাথে দিন বদলের আসল রূপে ফিরে আসছে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ।

এদেশের মাটি ও ঐতিহ্যের সাথে ইসলাম মিশে আছে বিধায়, ইসলামী শক্তিই হচ্ছে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র রক্ষাকবচ। কারণ, জাগতিক কোনো শক্তির কাছে ইসলাম মাথা নত করে না। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলগুলোই মূলত এ দেশের বিভিন্ন সঙ্কটকালে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অভূতপূর্ব বিজয়, জামায়াতের বিভাগীয় পর্যায়ে জনসভা, টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যু, শিক্ষাব্যবস্থা , ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ এবং অতিসম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জামায়াত-শিবিরের সরব অংশগ্রহণ এই জালিম সরকারের বিরুদ্ধে সঠিক ভূমিকা রাখতে জাতিকে সহায়তা করেছে। ইদানীং হরতালগুলোতেও তো ছিল জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র সাথে রাজপথে জামায়াতের একাত্মতা ঘোষণাই এই সফলভাবে হরতাল পালনের নেপথ্য কারণ বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করে। যার কারণে জামায়াত-শিবির হয়ে ওঠে এই সরকারের সকল মাথা-ব্যথার কারণ। ফলে একটি ঠুনকো মিথ্যা ও জামিনযোগ্য মামলায় ২৯ জুন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করেছে সরকার। কথিত ইসলামী তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিবের দায়েরকৃত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার একটি মিথ্যা মামলা যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উল্লেখ্য ওই আলোচনা সভায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কেউই উপস্থিত ছিলেন না। অন্যায়ভাবে আটককৃত নেতৃবৃন্দের সকলেই প্রখ্যাত আলেম হিসেবে

www.amarboi.org

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশের একজন বরেণ্য আলেম, তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের আমীর। দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে ৫ বছর সফলভাবে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্‌সিরে কুরআন। তিনি দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার অন্য ধর্মাবলম্বী ইসলাম গ্রহণ করে শান্তির ছায়াতলে আসার সুযোগ পেয়ে আসছে। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ দলের সেক্রেটারি জেনারেল ছাড়াও একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক, গত ৫ বছর সৎ ও সফল মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সকলেই জাতীয় নেতা। তাঁদের সকলের বয়স ৬২-৭০ এর মধ্যে। তাঁদের মতো এমন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবীণ নেতাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো এ দেশের শুধু নয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কলঙ্কজনক ঘটনা। যাঁরা তাঁদের জীবনটাই ইসলামের জন্য নিবেদন করে দিয়েছেন, তাঁরাই কি-না ইসলামকে হেয় করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)! আর তাঁদেরকে নাজেহাল করার জন্য আদালতের মাধ্যমে সমন জারি করে তড়িঘড়ি গ্রেফতার করা হলো। অথচ সে মামলায় তাঁদেরকে জামিনও দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও ৮টি মিথ্যা মামলা তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা হলো এবং শোনা যাচ্ছে আরও কিছু মামলা প্রস্তুত করা হচ্ছে। ৫টি মামলায় কথিত জিজ্ঞাসাবাদের নামে ১৬ দিনের নির্মম নির্যাতনের রিমান্ডে নেয়া হলো। আসলে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুভূতি নয়, জামায়াত-শিবির ও ইসলামকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া আওয়ামী লীগেরই স্বভাব। সচেতন দেশবাসী, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগেরই স্বভাব। লক্ষ করুন, অতিসম্প্রতি ধর্মের ওপর তারা কিভাবে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে–

* যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রতিমন্ত্রী বলেন, "লাখ লাখ কোটি কোটি বছর পর আল্লাহ যদি আমাদের বিচার করতে পারেন তবে আমরা এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারব না কেন?" এটা কি আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাথে তার অংশীদারিত্বের দাবি নয়?

* ভোলা-৩ উপ-নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন নিয়ে সিইসি এটিএম শামসুল হুদা তো স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করেছেন এভাবে, "সেনাবাহিনী ফেরেশতা নয় যে তারা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেনাবাহিনী কেন, খোদ আল্লাহতায়ালা নেমে এলেও কিছু করতে পারবেন না।"

* কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী রাসূলের (সা) উম্মত সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র ধর্ম ইসলামের ওপর আঘাত হেনেছেন এভাবে, "বিএনপি কর্মীরা জিয়ার উম্মত আর

www.amarboi.org

জামায়াত কর্মীরা নিজামীর উম্মত। আর আমরা যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি তারা নবীজীর উম্মত।"

* পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কয়েকটি অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু করা হয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রতিষ্ঠিত রীতির ব্যতিক্রম। এটা ৯৫% মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নয়?

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনই মূল টার্গেট

ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বেশি জিঘাংসার শিকার হয়েছে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে তারা শঙ্কিত হয়ে এর নেতা-কর্মী সর্বোপরি নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করেছে। কেননা, এদেরকেই তাদের অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার পথে প্রধান অন্তরায় বলে তারা মনে করছে। ফলে দমন-পীড়ন, অত্যাচার-নির্যাতন এবং খুন-জখমের টার্গেটে পরিণত হয়েছে শিবিরের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। এ নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না বাড়িতে থাকা মা বোনেরাও। গত বছর ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সেক্রেটারি এমবিএ'র মেধাবী ছাত্র শরীফুজ্জামান নোমানীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ধারাল অস্ত্রের আঘাতে কেটে নেয়া হয় তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল এবং উপর্যুপরি কোপে দ্বিখণ্ডিত করা হয় আল্লাহর সামনে নতকারী মস্তক। কিন্তু জঘন্য নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করা হয়। জামালপুরে হত্যা করা হয় হাফেজ রমজান আলীকে। দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া এই মেধাবী ছাত্রকে হত্যা করে চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে দিয়ে দিখণ্ডিত করে দেয় নরপশুরা। এ বছর ৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যক্কারজনক ঘটনাটি পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রাণ দিয়েছেন গণিত শেষ বর্ষের দরিদ্র ছাত্র কথিত ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন। এটাকে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে পরিকল্পিতভাবে ফারুকের লাশকে ম্যানহোলে ফেলে দিয়ে মানবতার চরম লঙ্ঘন করেছে তারা। আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীর নিকট প্রিয় সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে বলির পাঁঠা বানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদেরকে চিরতরে উৎখাত করার নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উস্কানিতে পুলিশ প্রশাসন শিবির নির্মূলের অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গণগ্রেফতার আর অত্যাচারের ভয়াল থাবা বিস্তার করে শিবিরের নিরীহ শিক্ষীদের ওপর। এই ঘটনাকে পুঁজি করে সারাদেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলে কথিত "চিরুনি অভিযান"-এর নামে। মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে লাশে পরিণত হন দুই জন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান

www.amarboi.org

হাফিজুর রহমান শাহীনকে। এলাকার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে যখন সবাই শোকে কাতর, সেখানে জানাযায় পর্যন্ত বাধা দেয়া হয়, কবর জিয়ারত থেকে বিরত রাখতে র‍্যাব পুলিশ দিয়ে পাহারা দেয়া হয় কবর। কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর হলে মানুষ এমনটি করতে পারে! চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক মেধাবী ছাত্র শিবির নেতা হারুনুর রশীদ কায়সারকে শাটল ট্রেন থেকে অপহরণ করে জবাই করে ফেলে দেয়া হয়। এ সকল ঘটনায় মামলা দায়ের করতে গেলে মামলা নেয়া তো দূরের কথা উল্টো কয়েকশ' মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয় আমাদের নেতা ও কর্মীদেরকে। আক্রমণ-জখম, মামলা আর জেলে ভরে চলে মানবতার বিরুদ্ধে চরম অবমাননা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটিকে ছড়িয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশে। দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নামধারী গুণ্ডাদের নির্মম আক্রমণের শিকার হন ছাত্রশিবিরের হাজার হাজার নেতা-কর্মী। অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবনকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাইজুল ও ইকরামের কাছ থেকে মিথ্যা বক্তব্য আদায় করতে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া হয় তাদেরকে। রিমান্ডের নামে নির্যাতনে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে আরও অনেককে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও কায়েম করা হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব। ফলে শুধু রাজশাহী অঞ্চলেরই প্রায় ২০০টির মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে বন্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসে এটি একটি কালো অধ্যায় হয়েই থাকবে। এখনো স্বাভাবিক হয়নি ওই অঞ্চলের শিক্ষার পরিবেশ।

মিছিল, সমাবেশ এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ দাবিদার বর্তমান আওয়ামী সরকারের উপরোক্ত অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে চাইলে সরকার তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এমনকি খোদ নিজেরাই তা বানচালের ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে। পুলিশ প্রশাসনকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয় তারা। এখন যেন ছাত্রলীগের কাছে অসহায় পুলিশ। পুলিশের সামনেই মেরে আহত করে পুলিশে সোপর্দ আর কোন্ মামলায় গ্রেফতার এবং আরো কী করা যায় তার সব নির্দেশ আসে আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছ থেকে। অথচ পুলিশের দায়িত্ব ছিল চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ইভটিজিংসহ অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ বন্ধ করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো শিবিরের নেতা-কর্মী যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে এ সকল অন্যায়, অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ থেকে দূরে থাকছে এবং অন্যকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গড়তে চাচ্ছে মদিনার মত একটি সুন্দর সমাজ- তাদের দমন করাই প্রধান কাজ বানিয়েছে।

www.amarboi.org

মেসে-বাসাবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মিছিলে বাধা দান ও খুনের নেশায় আক্রমণ, চোরাগুপ্তা হামলা, অপহরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট পন্থায় ইসলামপ্রিয় শিবিরকর্মীদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক কালো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে চলেছে। এ দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের প্রাণের সম্পদ পবিত্র কুরআনে অগ্নিসংযোগ করতেও পিছপা হয়নি নরপশুরা। আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবিধান ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য আলেমদের সুচিন্তিত মতের আলোকে রচিত বিভিন্ন ইসলামী বইপুস্তককে তথাকথিত "জিহাদী বই" বলে প্রচারণা চালায় এবং তা সংরক্ষণ করার অজুহাত এনে গ্রেফতার করা হয় ১৩-১৪ বছরের বালক থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়া বৃদ্ধদেরকেও। জেলের অন্ধকারে আটকে রেখে, রিমান্ডের নামে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে অসংখ্য মা আর বাবার চোখের পানির ধারাকে প্রবহমান রেখেছে জালেম নরপশুরা। ইসলামের ধারক ও বাহক এইসব নিরীহ যুবকদের ওপরে শাসকদলের জিঘাংসার স্বরূপ দেখে আপনিও চোখের পানি আটকে রাখতে পারবেন কি? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দীন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে অন্যায়ভাবে আটকের ঘটনায় যখন ছাত্রশিবির ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে তাদের মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছে, তখনও পাশবিকতার স্টিম রোলার চালানো হয় তাদের ওপর। শীর্ষ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে সারাদেশে গ্রেফতার হয়েছে হাজার হাজার নেতাকর্মী, মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে শতশত। এ কেমন গণতন্ত্র! কেমন সভ্যতা! যাঁরা নিজেদের জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন মানবতার ধর্ম ইসলামকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে, সেই তাঁদের বিরুদ্ধেই যখন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কল্পিত অভিযোগে মিথ্যা মামলা হতে দেখা যায় এবং তার কারণে কারান্তরীণ হতে হয়, তখন বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ আসলে কোন দিকে এগুচ্ছে। আপনিও নিশ্চয়ই শঙ্কিত। কথিত ওই মামলায় তাঁদের জামিন হলেও রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশে আরোও কয়েকটি মিথ্যা মামলা দিয়ে রিমান্ডের নামে চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

রাজপথে আওয়ামী ঘরানার পুলিশ আর মানবরূপী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের হায়েনাদের তাণ্ডব দেখে আপনার চোখের কোনা কি চিকচিক করে ওঠেনি? অঝোর ধারায় নেমে আসেনি কষ্টের অশ্রুরা? ব্যথায় কি বুকের কোণটায় সামান্যতমও চিনচিন করে ওঠেনি? ওরাও তো কোনো না কোনো স্নেহময়ী মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন; প্রশস্ত দিলের কোনো পিতার বুকের মানিক, ভাই ও বোনের ভালোবাসা ও আদরে সিক্ত আপনার অনুভূতি, একসাথে পথ চলার কোনো সাথী! সহ্য করতে পারছেন কি এসব নির্মমতা? প্রকাশ্য দিবালোকে শরীর থেকে পাঞ্জাবি খুলে নেয়ার দৃশ্য দেখে আপনার ঈমানে কি সামান্যতমও দোলা লাগেনি? আপনার প্রিয় সন্ত

www.amarboi.org

ানও তো রাতে নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে পারছে না, গ্রেফতার আতঙ্কে পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিচ্ছে। এই সকল বিষয়গুলোই সকলকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আমাদের সাথে আপনিও দেশের ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নিয়ে ঘোর শঙ্কার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। আর বিনিদ্র রজনী পার করছেন এসব থেকে পরিত্রাণ চেয়ে মহান রবের দরবারে আকুল আবেদন জানিয়ে।

সরকারের দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যাতে কেউ কোনো আওয়াজ তুলতে না পারে সেজন্য জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কারাগারে আটক রেখে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরকে নির্মূল করতে চায়। এভাবে একে একে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে নির্মূল করে আওয়ামী সরকার একদলীয় বাকশাল কায়েম করে বাংলাদেশকে একটি করদরাজ্যে পরিণত করবে। সরকারের এ অভিযান শুধু জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে নয়- এ অভিযান দেশ-জাতি, গণতন্ত্র ইসলাম ও দেশপ্রেমিক সকল মানুষের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই জালেম সরকার ঈমান ও আক্বীদার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাই আসুন, অবিলম্বে আটককৃত জামায়াত-শিবির নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি, সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে ১৬ কোটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে ও আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের হাত থেকে দেশ, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, ঈমান ও আক্বীদাকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি। আজকের লেখাটি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এর গল্পটির মধ্যে দিয়ে ইতিটানতে চাই, গল্পটি হলো - ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ মহিলা সাহিত্যিক মিসেস মেরী শেলী (১৭৯৭-১৮৫১) তার উপন্যাসে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ডাঃ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এক মানবরূপী দানবের সৃষ্টি করেন, যে-দানব পরিণামে তার স্রষ্টাকেই হত্যা করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা কিংবা এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা বা কর্মকাণ্ড শুরু করাকে বোঝায়-যা পরিণামে তার স্রষ্টা বা উদ্যোক্তার জন্যেই ধ্বংস কিংবা মহাবিপদ ডেকে আনে। বাংলাদেশ এখন যেন পুলিশি রাষ্ট্র। রিমান্ডে নির্যাতন, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি এখন পুলিশের নিয়মিত কাজে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত খুব বেশি দূরে যেতে হবে-না বিগত সরকারের মহা-ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ও এ-সরকারের হাতেই কাবু হয়ে আছেন। ইতিহাসের নির্মম শিক্ষাতো এখানেই!

● দৈনিক আমার দেশ, ৩১ জুলাই ২০১০

www.amarboi.org

জনমনে ক্রুসেডার আতঙ্ক: দেশে বিদেশে সমালোচনা

Rights enumerated in the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR-এ ৬ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদে প্রত্যেকের ২২ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। বিশেষ করে ১.জীবন রক্ষার অধিকার (অনু: ৬) ২. নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি (অনু: ৭) ৩. স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাবার মানবিক অধিকার (অনু: ৯) ৪. আটক ব্যক্তির মানবিক আচরণ পাবার অধিকার (অনু: ১০) ৫. নিরপেক্ষ বিচার পাবার অধিকার (অনু: ১৪) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে (International Human Rights Law) তখন ঘটনাটিকে বলপূর্বক গায়েব করে দেয়া (Forced disappearance or enforced disappearance) বলা হয়।

'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম আইন (Rome statute of the International Criminal Court) অনুসারে যখন কোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলপূর্বক নিখোঁজ বা অদৃশ্য করে দেয়ার অস্ত্রটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন এরকম গুম করাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হবে । উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'গুম হওয়ার অর্থই প্রায়ই হলো খুন হওয়া। বাংলাদেশে যে গুম-খুনের ঘটনাগুলো ঘটেছে ও ঘটছে সেগুলো উপরিউক্ত অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়েন চার্লস মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তা, যেন আজকের বাংলাদেশের দৃশ্যটি-ই প্রতিপাদিত হয়েছে। তিনি বলেন "আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা আজ দেখা দিয়েছে।"

ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়া এখন "টক অব দ্যা ওয়ার্ল্ড" এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়াও সরব। প্রতিদিন কোন না কোন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় স্থান পাচ্ছে বাংলাদেশের খবর। কিন্তু ভালো খবর নয়, মন্দ খবর। যা বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। এটি কারো করুণা নয়। কিন্তু যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিক

www.amarboi.org

অধিকার নিশ্চিত করা সেই রাষ্ট্রের-ই বিরুদ্ধে যদি নাগরিক অধিকার লুণ্ঠনের অভিযোগ ওঠে তখন বিষয়টি প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা দিতে না পারে তা বড়ই আতংকের। আর মহাজোটের শাসনামলে গুমের ঘটনা চলে আসছে অনেকদিন থেকে-ই। এর সংখ্যা এখন শতাধিক। সম্প্রতি ইবিতে ছাত্রশিবিরের দু'জন মেধাবী ছাত্রের গুমের ঘটনায় **বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে লাগাতার ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন**। ইলিয়াছ আলী নিখোঁজ হওয়ার পর সারাদেশের আরো নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের খবর আলোচনায় আসতে থাকে। এরি পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকদিন ধরেই নানা ধরনের খবর প্রকাশ করছে মিডিয়াগুলো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার ভয়াবহতা তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে খ্যাতনামা সংবাদ সংস্থা আলজাজিরা, রয়টার্স, এএফপি ও ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়্যান। একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক প্রচারিত নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ। নিউইয়র্ক টাইমসের লেখক ব্রুগেও বেশ কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আলজাজিরা নেটওয়ার্ক প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে। "বাংলাদেশে রাজনৈতিক নিখোঁজের মহামারী" (পলিটিক্যাল ইন ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স প্লেইগ বাংলাদেশ)। অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে গত বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১০০ মানুষ গুম হয়েছে, যাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। এদের মধ্যে আছেন সিলেট অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী। ইলিয়াসের স্ত্রী নিশ্চিত যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণেই নিরাপত্তা বাহিনী তাকে অপহরণ করেছে।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনের শিরোনাম, "বাংলাদেশ পুলিশ আউট ইন ফোর্স অ্যাজ টেনশন রাইজেস ওভার মিসিং পলিটিশিয়ান।" এতে বলা হয়েছে, ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আরও বলা হয়, ইলিয়াস আলী নিখোঁজের জন্য সন্দেহের আঙুল তোলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর দিকে। গত কয়েক মাসে ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপগুলো এসব ঘটনায় র‍্যাব ও পুলিশকে দায়ী করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধে বলা হয়, "শেখ হাসিনার সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয় পায়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, বৈষম্য বৃদ্ধি ও সম্প্রতি কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তার সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করেছে। নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ লিখেছে, "২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে বিএনপির আরেক নেতা, ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর চৌধুরী আলম নিখোঁজ রয়েছেন। গত দুই বছরেও তিনি কোথায় আছেন বা তার কী পরিণতি হয়েছে, সে সম্পর্কে পুলিশ কোনো হদিস দিতে পারেনি।" অনলাইন রেডিফ "এনফোর্সড ডিসঅ্যাপেয়ারেন্সেস অন

www.amarboi.org

দ্য রাইজ ইন বাংলাদেশ"' শিরোনামে লিখেছে, "ইলিয়াস নিখোঁজের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়ছেই। বার্তা সংস্থা পিটিআই বলছে,"ইলিয়াস আলীকে উদ্ধারে অভিযানের নির্দেশ দেয়া হলেও এর প্রতি বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের আস্থা নেই।" বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এফএফপি সার্বক্ষণিক হরতাল ও আন্দোলন-সংগ্রামের আপডেট সংবাদ প্রচার করছে। রয়টার্স জানিয়েছে, "ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের প্রতিবাদে সিলেটসহ সারা দেশ উত্তাল।" এএফপি জানিয়েছে, "ঢাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে।" রাজনৈতিক নিখোঁজ নিয়ে সরব বিদেশি মিডিয়া।"

ইলিয়াছ আলী নিখোঁজের ঘটনায় সারা বিশ্বে যখন তোলপাড়। তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক সভায় ইলিয়াস আলীর অপহরণ সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বলেন যে, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশে ইলিয়াস আলী লুকিয়ে আছেন। সৈয়দ আশরাফ বললেন, আমরা ইলিয়াস আলীকে জীবিত অবস্থায় হাজির করব আইনপ্রতিমন্ত্রী কামরুল বললেন, "বিএনপি সিলেটের আন্তঃকোন্দল কিনা আমরা খতিয়ে দেখছি।" আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বললেন- "ইলিয়াস আত্মগোপন করে আত্তধ্যানে আছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন- "ইলিয়াস আলীর ঘটনায় সরকার বিব্রত। স্ব-রাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী বললেন- বিএনপির তৈরী করা জঙ্গিরা হয়ত ইলিয়াসকে গুম করেছে, আমরা খতিয়ে দেখছি।" এখানে আসলে কোন কথা ঠিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি? সরকারের দায়িত্ব যেখানে জনমনে আতঙ্ক শঙ্কার বেড়াজাল খোলা, সেখানে সরকারের শীর্ষকর্তাব্যক্তিরা নিজেরাই সৃষ্টি করছে এ জাতীয় হাজারো প্রশ্ন। এই হলো বর্তমান সরকারের আবস্থা।

আর আওয়ামী লীগের এসব বিপজ্জনক নেতা নেত্রী যা-ই বলুন, সারাদেশের আজ গুম বা অপহরণ যেভাবে হচ্ছে তা নিয়ে আতঙ্কিত দেশের সাধারণ মানুষ। শরিক দলের লোকেরাও এখন খুব আতঙ্কিত। মহাজোটের শরিক এরশাদ বললেন "দেশে আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভেংগে পড়েছে, বাসায় থাকলে খুন আর বাহিরে গেলে ঘুম।" মেনন আর ইনু সাহেব বললেন, "রাজনীতিবিদদের ঘুম হওয়ায় নিজেদের অ-নিরাপধ ভাবছেন তারা।" কাদের সিদ্দিকী বললেন দেশে এখন প্রধানমন্ত্রীরও নিরাপত্তা নেই।

A PROBE **magazine report**-Something is rotten in the state of Bangladesh. In a series of unfortunate events, the nation is sinking deeper and deeper into a dark chasm of crisis. BNP leader Ilias Ali is missing, some fear that he may have been killed. Veteran Awami League leader Suranjit Sengupta, who had recently been the Railways Minister for

www.amarboi.org

the shortest stint, has been implicated in a multi-million taka corruption scandal. Sohel Taj, the dashing young leader of the ruling party and son of one of the nation's founding fathers Tajuddin, has resigned from the parliament. He previously resigned as State Minister for Home Affairs. Then there are the gruesome murders -- the killing of the young journalist couple Sagar and Runi, and the gunning down of the Saudi Embassy official. The killers in both cases remain at large and the mysteries are yet to be solved.

And if people are waiting to see what the opposition does now, their eyes are equally trained on the government, to watch its next move. All indications are that the government is moving towards a very hard line. The government is adopting a 'zero tolerance' policy.

The government is in an aggressive mood. It has spent its tenure so far in building and nurturing a powerful police force. Unlike the past, now automatic weapons and APC's are being used to control the mobs. This does not bode well.

দেশের আমজনতাকে সবচেয়ে বেশি আঁৎকে দিয়েছে দেশের কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় যখন খবর ছাপা হলো 'র'র খাঁচায় আ'লীগের ১০০ কমান্ডো: গুম-খুন-অপহরণে প্রশিক্ষণ লাভ" রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ১০০ ক্যাডারকে খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে ছয় মাস মেয়াদি কমান্ডো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। গত জুন থেকে দেরাদুনের ট্রেনিং নেওয়া এসব (ছাত্রলীগ বা যুবলীগ) ক্যাডারদের গুপ্তহত্যা ও অপহরণের কৌশল শেখানো হয়েছে। (শ্রীলঙ্কা গার্ডিয়ান) 'ক্রুসেডার-১০০' ছদ্ম নামে পরিচিত এসব ক্যাডার রাজনীতিবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের হত্যা ও গুম করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এসব ক্যাডার ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ২০১০ সালের জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতের সেনাবাহিনীর কমান্ডো প্রশিক্ষণ নেয়। বিস্তৃত পরিসরে আওয়ামী ক্যাডারদের দেওয়া এ প্রশিক্ষণটিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ সদস্যকে' দেওয়া কমান্ডো ট্রেনিং হিসেবে চালিয়ে দেয়।

ক্রুসেডার-১০০ নামের পুরো প্রকল্পটি 'র' এর পরিকল্পনার ফসল এবং বাংলাদেশ সরকারের অতি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। ভারতের 'র' ও যুক্তরাজ্যের এম আই-৬ এর সঙ্গে নিবিড়

www.amarboi.org

যোগাযোগ রক্ষাকারী অবসরপ্রাপ্ত এক উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তা পুরো প্রকল্পটি দেখভাল করছেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কই এসব যোগাযোগ রক্ষা করতে তাকে সাহায্য করেছে। ক্রুসেডার-১০০ এর পুরো দলটি ছাত্রলীগ-যুবলীগ থেকে নেওয়া হয়। দলটি ওই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও তার বিশ্বস্ত কিছু সহকর্মীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদ, মিডিয়া কর্মী ও সুশীলসমাজের প্রতিনিধিদের একটি তালিকা দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ তালিকায় ৮৩ ব্যক্তির নাম রয়েছে, যাদের ক্রুসেডার-১০০ 'সাফ' করবে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ১০০ ক্রুসেডারকে ঢাকার গুলশান ও বারিধারা এলাকার কিছু ভবনে রাখা হয়েছে। বারিধারার ক্রুসেডাররা সেই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন ঘাঁটিতে অবস্থান করছে। এসব ঘাঁটি স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি ও নজরদারির নানা সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত। সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। বিএনপির সদ্য নিখোঁজ নেতা এম ইলিয়াস আলীর নামও ক্রুসেডার-১০০ এর তালিকায় ছিল। শ্রীলঙ্কা গার্ডিয়ানের নয়াদিল্লি সূত্র আরও কিছু নাম জানিয়েছে। এর মধ্যে আমান উল্লাহ আমান, মির্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, হাবিবুন নবী সোহেল, আব্দুল্লাহ আল নোমান, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, শফিউল আলম প্রধান, আসম আব্দুর রব, মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা ফজলুল করিম। আওয়ামী লীগ ও 'র' এসব লোককে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে খতম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব ব্যক্তির অস্তিত্ব আওয়ামী লীগের পুনরায় ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রুসেডার-১০০ স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার সাইলেন্সর যুক্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, গ্যাস বোমা ও যানবাহনে সজ্জিত। দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এদের অনেকেই স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে থাকে। এদের প্রত্যেক সদস্য নানা রকম সুবিধাসহ উচ্চ পারিতোষিক লাভ করে থাকে। সেই সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যদের ঢাকায় ফ্ল্যাট দেওয়া হয়। এদের দিনের বেলায় প্রকাশ্যে আসতে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং সাধারণত নিজ নিজ ঘাঁটিতেই রাখা হয়।

জরুরি অবস্থা তৈরি হলে বা রাস্তায় নেমে আসা প্রয়োজন হলে তাদের কালো হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। পর্যায়ক্রমে এ বাহিনীর সদস্যেরা ৭ থেকে ১০ দিনের ছুটিতে ভারত যায় আমোদ প্রমোদের জন্য। এসব ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের কোনও নথি প্রদর্শন করতে হয় না। পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় আরও স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে। সেগুলো নিরাপত্তার কারণে এড়িয়ে যাওয়া হলো। (সূত্র : দৈনিক আমাদের সময়)

প্রখ্যাত সাংবাদিক বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন-"আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশে বড় আকারে শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের পর থেকেই। সে সময় আওয়ামী-

www.amarboi.org

বাকশালী সরকার হাজার হাজার বামপন্থী, জাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গুম-খুন করেছিল। বাস্তবত বাংলাদেশে গুম-খুনের রাজনীতি শুরু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই। এ দেশের শাসকশ্রেণীর ঐতিহ্য অনুযায়ী অপহরণ ও গুম-খুন এখনও চলছে। কিন্তু এদিক দিয়ে এখনকার মতো পরিস্থিতির অবনতি আগে কখনও দেখা যায়নি।"

বামপন্থীদের ওপর হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর হক কথা লিখে, "একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষ প্রোগ্রামে এ দেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের হিসেব হলো, বাংলাদেশে সোয়া লক্ষ বামপন্থী কর্মীকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে শোষণের হাতিয়ার মজবুত করা যাবে না।" (২৬ মে-১৯৭২ : সাপ্তাহিক হক কথা)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্রুসেডার-১০০ নামের আজকের এই প্রকল্পের মত-ই ৭২-৭৫ সালের শাসনামলে শেখ মুজিব বাহিনী/বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএল এফ), ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এর তত্ত্বাবধানে ভারতের দেরাদুনে মেজর জেনারেল সুজন সিং উবানের ট্রেনিংয়ে প্রায় ১০ হাজার সদস্যের এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন তৎকালীন তিন ছাত্রলীগ নেতা। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানী কিংবা পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল অরোরা এর কমান্ডের বাইরে এই বাহিনী গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান ডানপন্থী ও চীনপন্থী বামদের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব কৌশলে ছিনিয়ে নেয়া। সেই লক্ষ্যেই তারা মাঠে নামে।

তাছাড়া জাতীয় রক্ষীবাহিনী ১৯৭২ সালে 'আর্মড পুলিশ এ্যাক্ট' সংশোধন করে মূলত মুজিব বাহিনীর একটি অংশ থেকে তৈরি এই সেনাবাহিনী প্যারালাল ওই মিলিশিয়া বাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশেও এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ ভারতীয় অফিসাররা দিতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের হাতে নির্যাতনে ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে। এছাড়াও এই সময় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় ১৯ হাজার মানুষ। গুম ও খুন হয় এক লাখ। পিটিয়ে মারা হয় ৭ হাজার মানুষকে। এর মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা থেকে শুরু নারী-শিশুও বাদ যায়নি। তাদের মূল টার্গেট ছিল বামপন্থী দলগুলো ও অবাঙালি বিহারীরা। কিন্তু দুঃখজন হলেও সত্য সেই বামপন্থীরা আজ আবার হালুয়া-রুটির প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের সাথে জোট বেঁধেছে, যদিও এটা অনেক বামপন্থী নেতা ও বুদ্ধিজীবী মেনে নিতে পারেনি এখনও। মূলত আওয়ামী লীগের আজকের শাসনামল ৭২-৭৫ এর মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তা আওয়ামী লীগের জন্য না যত বিপজ্জনক তার থেকে বেশি ভয়াবহ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আমজনতার জন্য। মহাজোটের শাসনামলে সাগর-রুনিসহ ১৪ সাংবাদিক হত্যা, সৌদি কূটনীতিকের খুন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের অর্থকেলেঙ্কারিতে পদত্যাগ, সোহেল তাজের সাংসদ ছাড়া, ইলিয়াসসহ শতাধিক বিরোধী দলের নেতা ও সাধারণ মানুষের গুম

www.amarboi.org

হওয়া নিয়ে বিরোধী দলের লাগাতার আন্দোলন, নেতা-কর্মীদের উপর হামলা মামলা দিয়ে দমন নিপড়ন আওয়ামী লীগকে দেশে-বিদেশে সমালোচনা মুখোমুখি আর অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

এই সব নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন মোর্চা ১৮ দলীয় জোট হরতাল করেছে। আন্দোলনে বেসামাল হয়ে ইতোমধ্যে সরকার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মকবুল আহমদ, সাদেক হোসেন খোকা, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমানউল্লাহ আমান, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, রুহুল কবির রিজভী এবং আরও তিরিশ-চল্লিশ জনের নামে থানায় মামলা করেছে। পুলিশ ইতোমধ্যে অনেক নেতার বাড়িতে বাড়িতে তল-াশি চালায়। এর উদ্দেশ্য বিএনপি ও তার সঙ্গী দলগুলো ইলিয়াস আলীর সন্ধান লাভ করার জন্য তথা গুম ও গুপ্তহত্যার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল তা নস্যাৎ করার জন্য সরকার এখন হামলা ও মামলা এই দুই পথেই বিরোধীদের ওপর জুলুমের স্টিম রোলার চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী জুলুম-নির্যাতন আন্দোলনের গতি বাড়িয়েছে সব সময়।

এ অবস্থায় ঢাকায় আসছেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। হিলারির সাথে থাকছে আওয়ামী লীগ কর্তৃক অপমানকৃত ড. ইউনূস এর জন্য মহা-সম্মান আর পুরস্কারের মহাবার্তা। বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংগঠন থেকে এ নিয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এ পরিস্থিতি অবসানের জন্য তাগিদও দিচ্ছে। কিন্তু সরকার বেপরয়াভাবে উপেক্ষা করছে সবাইকে। মনে রাখতে হবে সবাইকে উপেক্ষা করলেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে উপেক্ষা করা যায় না। তার পাকড়াও অনেক ভয়ঙ্কর যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আমরা আশাবাদীরা যদি ধরেও নিই জীবিত ইলিয়াস আসবে! কিন্তু বাকি শতাধিক গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের চোখের পানি মুছবে কে?

● প্যারিস নিউজ ভিশন ডট কম

www.amarboi.org

একজন ভাষাসৈনিকের কারাবাস

অহিংসবাদী ও সংগ্রামী নারী অং সান সুচি প্রায় পনের বছরের বন্দিজীবনের কালো অধ্যায় পেরিয়ে মুক্ত আলোয় ফিরেছেন। গত ২১ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ১৫ বছরই কাটিয়েছেন কারাগারে আর গৃহবন্দী হিসেবে। এ সময়ে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। হারিয়েছেন স্বামী ড. মাইকেল এরিসকে। নেলসন ম্যান্ডেলার পর এটাই হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত রাজবন্দীর মুক্তি। অ্যালান ক্লেমেন্টসের সাথে আলাপচারিতা 'দ্য ভয়েস অব হোপ' গ্রন্থে সাংবাদিক অ্যা.ক্লে অং সান সুচি কে রাজনৈতিক পলিসির স্থিরতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন -জনগণকে বোকা বানানো যাবে না, বোকা ভাবাও উচিত না। ১৯৮৯ সালে আমি একবার ইনবলী হ্রদ এলাকায় গিয়েছিলাম, সেখানে একজন ভিক্ষু আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পটি হলো–

"উ-পো সেইন বার্মিজ থিয়েটার ট্রুপ... এর একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। উ-পো সেইন এর ট্রুপে একজন কমেডিয়ান ছিলেন, যিনি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বলতেন দেখুন উ-পো সেইন, এখানে যে সব দর্শক আছেন তাঁরা কেউই আপনার মত অত-সুন্দর নাচতে জানেন না। কিন্তু আপনি যদি নাচে কোন ভুল করেন তাহলে দর্শকরা যে কেউ-ই তা ধরতে পারবেন।' তো এই কথাটা রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য। রাজনীতির প্রতি জনগণের বিতৃষ্ণা থাকতে পারে। রাজনীতি সম্পর্কে তারা উদাসীন হতে পারে কিন্তু আপনি যদি কোন ভুল পদক্ষেপ নেন তাহলে তারা তা বুঝতে পারবে, আপনি অস্থির।' পৃথিবীর ইতিহাসে অস্থির আর জনগণকে বোকা বানানো র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশ সম্ভবত শীর্ষে। আমাদের রাজনীতিবিদরা কত অস্থির আর কত ডিগবাজি খেলেন জনগণের সাথে, তার নমুনা পরীক্ষার জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। বর্তমান আলোচিত কেয়ারটেকার ইস্যু-ই যথেষ্ট। দেশের রাজনীতি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি নিয়ে। কিন্তু এই অস্থিরতার জন্য দায়ী জনগণ না, নেতৃত্ব?

বাংলাদেশে সবাই জানে, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতির রূপকার ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম। একদা তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান আওয়ামী সরকার বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন করেছিল জামায়াতকে সাথে নিয়ে। হাজার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি আর জনগণের অনেক দু'র্ভোগের মধ্যে দিয়ে সে দাবি আদায় করে বিএনপি থেকে। দুনিয়াতে সেই পদ্ধতির যথেষ্ট সুনাম হচ্ছে দেখে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদম্ভে দাবি করেছিলেন, তিনিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবক্তা। তদানীন্তন বিরোধীদলীয়

www.amarboi.org

নেত্রী ও রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিকে কটূক্তি করে বলেছিলেন, "একমাত্র পাগল ও শিশু ব্যতীত কেউ নিরপেক্ষ নাই।" বর্তমানে দেশে দিন বদলের হাওয়া লেগে দু'নেত্রী-ই বোল পাল্টিয়ে ফেলেছেন। সবকিছু উল্টো হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে গলা টিপে হত্যা করেছে আর সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। হায়রে পৃথিবী! হায়রে রাজনীতি! হায়রে দুর্ভাগা জনগণ! আর জামায়াত আওয়ামী লীগকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি আগেও আনলো, আর এখনও আন্দোলন করছে বিএনপির সাথে। রাজনীতির সরলীকরণ হচ্ছে যে কারণে খালেদা জিয়া কেয়ারটেকার সরকার দিতে বাধ্য হয়েছেন ঠিক একই কারণে শেখ হাসিনাকেও তা মানতে হবে, নাম যাই হোক না কেন। সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতিতে গোলাম আযম দূরদর্শিতার এক মূর্তপ্রতীক তাতে সন্দেহ নেই। আর এই ঐতিহাসিক নজির প্রত্যক্ষ করেছে সারা দুনিয়া। ব্যক্তিকে দমিয়ে রাখা যায় বিকৃত করা যায়, কিন্তু চিরতরে মুছে ফেলা যায় না। অধ্যাপক গোলাম আযম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর আল-জাজিরা এই মহান নেতাকে নিয়ে রিপোর্ট করলে আর জাতিসংঘের আর বিশ্বনেতৃবৃন্দ জামায়াত নেতাদের মুক্তি চাওয়া আওয়ামী লীগের জন্য কাঁটা গায়ে লবণ ছিটার মত। অনেকের আর যেন সহ্য-ই হয় না। আওয়ামী লীগের তা যতই অসহ্য হোক না কেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াত একটি বাস্তবতা, এটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে কি?

কিন্তু জাতি ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা দেখেছে সম্প্রতি। যেদিন অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারাগারে নিলেন সেদিন নেত্রী খালেদা জিয়া গোলাম আযমের বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রেসিডেন্টের দরবার হলে ঢুকেছেন! শুধু তাই নয়। অধ্যাপক গোলাম আযম কখনও এমপি, মন্ত্রী কিছুই হননি সুযোগ থাকার পরও। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভিনব এবং নির্যাতিত ব্যক্তি অধ্যাপক গোলাম আযম। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি, চাওয়া-পাওয়া বৃহত্তর স্বার্থে তার ত্যাগ এমন বহু বাস্তবতা এখন দৃশ্যের অন্তরালে। যিনি ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতাসীন সকলের অপবাদের দায়ভার কাঁধে পড়েছে। যিনি দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সব সময় ভূমিকা রেখেছেন কিন্তু তার বিনিময়ে সব সরকার থেকে উপহার পেয়েছেন কারাবরণ। বিশ্বজুড়ে তার অসম্ভব খ্যাতি, তাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৌতূহলের শেষ নেই তবে বাস্তবতা হচ্ছে সব সময়ই ঐতিহাসিক সত্য বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্র, তার আত্মনির্মাণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বেশকিছু এখন বাস্তবতা, এবং সমকালীন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ আজ স্বীকৃত। অবশ্য আমাদের দেশে এখন এগুলো খুবই স্বাভাবিক। যে দেশে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মেজর জলিল, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, আর কর্নেল অলিকে আওয়ামী লীগ রাজাকার আর যুদ্ধাপরাধী

www.amarboi.org

বলতে দ্বিধা করে না। সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাগ্যে কারাগার অতি নগণ্যই মনে করে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী বাকশালীরা।

১১ জানুয়ারি ২০১২ কারাগারে যাওয়ার আগে জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন- ১৯৮০'র দশকে এবং ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে বিএনপি'র বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াত ও আওয়ামী লীগ যুগপৎ আন্দোলন করেছিল। সকল আন্দোলনকারী দলের লিয়াজোঁ কমিটি একত্রে বৈঠক করে কর্মসূচি ঠিক করতো। তখন তো কোন দিন আওয়ামী লীগ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী মনে করেনি। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ জামায়াতের সহযোগিতা প্রার্থনা করে আমার নিকট ধরনা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতা আমির হোসেন আমু সাহেব জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের মাধ্যমে আমাকে মন্ত্রী বানাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তখনও তো আওয়ামী লীগের মনে হয়নি যে, জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধী! পরবর্তীতে, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী জামায়াতের সমর্থন লাভের আবদার নিয়ে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখনও তো তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত নেতৃবৃন্দ 'যুদ্ধাপরাধী' ছিল না। এরপর এমন কী ঘটলো যে আওয়ামী লীগ ও কতক বাম দল জামায়াতকে 'যুদ্ধাপরাধী' আখ্যা দিয়ে জামায়াতকে নির্মূল করার জন্য জেহাদে নামলেন? এরূপ দু'মুখো নীতি কোনো সুস্থ রাজনীতির পরিচয় বহন করে না। ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ৫৮টি আসনে বিজয়ী হয় আর বিএনপি ১৯৭টি আসন পায়। জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন হওয়ায় নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলসমূহের শতকরা ২০ ভাগ ভোট একতরফা বিএনপি পাওয়ায় এসব ভোট থেকে বঞ্চিত হয়ে আওয়ামী লীগ মাত্র পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে বহু আসন হারায়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার কারণ হিসেবে বুঝতে পেরেছিল যে, জামায়াতে ইসলামীকে ঘায়েল করতে না পারলে ভবিষ্যতে নির্বাচনে বিজয়ের কোনো আশা নেই। এ উপলব্ধি থেকেই ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে জামায়াত নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধীর অপবাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। যাদেরকে এক সময় 'কলাবরেটর' আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাদেরকেই এখন আওয়ামী লীগ 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে বিচার করতে চাচ্ছে। ২০০১ সালের পূর্বে কখনো জামায়াত নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়নি।"

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন সৎ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, খ্যাতিমান অহিংস রাজনৈতিক নেতা আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। এই মেধাবী চৌকস, ও অভাবনীয় নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ক্ষণজন্মা মানুষটি ১৯২২ সালে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাট্রিক ও

www.amarboi.org

ইন্টারমিডিয়েট ঢাকা থেকে পাস করেন। স্কুল, কলেজের গন্ডি পেরিয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সম্পৃক্ত হন ছাত্র আন্দোলনের সাথে। ১৯৪৭-৪৮ ও '৪৮-৪৯ সালে পরপর দু'বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর জিএস (জেনারেল সেক্রেটারি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে পাকিস্তান সরকার দ্বারা কারা নির্যাতিত হন। এই মহান নেতা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। শেখ মুজিব কর্তৃক '৬৬ সালের ছয় দফা দাবি তৈরিতে অংশ নেয়া ২১ সদস্যের অন্যতম। ১৯৫৪ সালে যোগদান করেন জামায়াতে ইসলামীতে এবং প্রত্যক্ষভাবে শুরু করেন রাজনৈতিক জীবন। পাকিস্তানে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কপ (COP- Combined Opposition Party), পিডিএম (PDM- Pakistan Democratic Movement), ডাক (DAC- Democratic Action Committee) ইত্যাদি আন্দোলনে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য সকল দলের নেতাদের সাথে অংশগ্রহণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৬৪ সালেও তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম একটি আন্দোলন, একটি জাগরণ, একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের নাম। একটি চেতনা ও বিশ্বাসের গগনজোয়ারী বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর। বিশ্বব্যাপী সমাদৃত কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলার রূপকার। মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ের একটি সম্ভাবনাময় দেশগড়ার চেতনার অগ্রপথিক। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার অন্যায়ভাবে তার জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকার হরণ করলেও পরবর্তীতে, ১৯৯৪ সালে, সুপ্রিম কোর্টের সর্বসম্মত রায়ে নাগরিক অধিকার ফিরে পান এবং তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এখন নতুন করে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আবার সেই একই অভিযোগের অবতারণা করা হচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ত্রিশ বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে থেকে সর্বশেষ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী পদের ও ক্ষমতার প্রতি নির্লোভ একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত। এ প্রবীণ মজলুম জননেতা ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণপুরুষ। আজ জীবন সন্ধিক্ষণে এ সংগ্রামী নেতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আর অপপ্রচারের শিকার। ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যার কালো পর্দার আড়ালে তার স্বর্ণোজ্জ্বল অনেক অবদানকে ঢেকে রাখার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে নিরন্তরভাবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রফেসর গোলাম আযম সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। গণতন্ত্র উত্তরণে ৯০ এ তার কেয়ারটেকার পদ্ধতি জাতিকে দিয়েছিল মুক্তির দিশা। জাতির জীবনে

www.amarboi.org

প্রফেসর গোলাম আযম এক জীবন্ত কিংবদন্তি। অধ্যাপক গোলাম আযম বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত একটি আওয়াজ। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে সংগ্রাম শুরু হয়, তার সাথে তিনি প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে তাকে হাজতবাসসহ শত সহস্র নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এ দেশের ছাত্র-জনতা যখন বুঝতে পারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে, বাংলা ভাষাকে নির্বাসনে পাঠানোর যে আয়োজন করছে, তা বাস্তবায়িত হলে বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কার্যত অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। এমন এক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিশেষ করে ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করে।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে এই সাহসী বীরপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে শরিক হন। এই দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালিত হয়। হরতাল সফল করতে অধ্যাপক গোলাম আযম ডাকসুর জিএস হিসেবে ছাত্রদের সংগঠিত করেন, বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে পিকেটিংয়ের জন্য রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অবস্থান নেন। হরতালে পিকেটিংয়ের সময় তাকেসহ ১০-১২ জনকে তেজগাঁও থানা পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ বিক্ষোভের মূলে ছিল প্রধানত ছাত্ররা। ভাষার দাবিতে প্রথম গণবিক্ষোভ, ধর্মঘট বা হরতাল এবং ১১ মার্চ ঐতিহাসিক মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে। (সূত্রঃ সোনার বাংলা)

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন- ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাকে ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সংবলিত একটি ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ স্মারকলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি (পরবর্তীতে বিচারপতি) আব্দুর রহমান চৌধুরীর ওপর। স্মারকলিপিটি ডাকসুর কাউকে দিয়ে পেশ করার ব্যাপারে চারটি হলের ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছেন। ডাকসুর ভিপি ছিলেন অরবিন্দু বোস। তিনি যেহেতু হিন্দু তাই তাকে দিয়ে পাঠ করালে সরকার বিষয়টিকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করতে পারে। এই দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত হয় ডাকসুর জিএস অর্থাৎ আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার কথাটি ছিল শেষের দিকে। এর আগে প্রাদেশিকতায় আমরা বিশ্বাস করি না এমনভাবে আঞ্চলিকতার নিন্দার কথা বলা ছিল এ প্যারাটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীরা তুমুল করতালি দেয়। করতালি শেষে আমার কানে এলো লিয়াকত আলীর স্ত্রী রানা লিয়াকত তার স্বামীকে বলছেন, 'ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ বাতা দেনা।" তার কথা শোনার পর আমি লেট মি রিপিট দিস বলে আবার ভাষার দাবি সংবলিত

www.amarboi.org

প্যারাটি পড়লাম। আবার মুহুর্মুহু করতালি শুরু হলো। আমি এবার করতালির জন্য একটু বেশি সময় দিলাম। আমি লিয়াকত আলী খান এবং রানা লিয়াকত আলী খানের খুব কাছে বসেছিলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে নেননি তিনি। আমি মনে মনে স্থির করলাম বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য তিনি তার বক্তব্যে করলে আমি সাথে সাথে প্রতিবাদ করে স্লোগান দেব। কিন্তু তিনি খুব ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে উপস্থিতির মনোভাব উপলব্ধি করে বিষয়টি চেপে গেলেন। তার মনে ক্ষোভ থাকলেও এমনটি তার স্ত্রী অনুরোধ করার পরও ভাষার প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেন না। শুধু বক্তব্যের একপর্যায়ে ক্ষোভের সাথে বলেন, ইফ ইট ইস নট প্রোভিনসিয়ালিজম, দেন হোয়াট ইস প্রোভেনসিয়ালিজম? তার এ কথাগুলো শুনে আমরা মনে করেছিলাম তিনি হয়তো ভাষার ব্যাপারে আরও কিছু বলবেন। কিন্তু না তিনি এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেন। আমার আর স্লোগান দেয়া হলো না।"

১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সাথে করা সাত দফা চুক্তির তোয়াক্কা না করে ঘোষণা করলেন বাংলা নয় উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কায়েদে আযমের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করার পরই শুরু হয় প্রতিবাদ বিক্ষোভ। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্বের ১৯০টি দেশে এখন প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপিত হচ্ছে। এদেশের মানুষ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য প্রাণ দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ৩০ কোটিরও বেশি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ বিশাল অর্জন একান্ত-ই আমাদের। বাংলাদেশ নামের ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের।

বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত ভাষার জন্য জীবন দেয়ার ইতিহাস আমরাই কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি। আবার বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত আমরাই প্রথম যারা ৯০ বছর বয়স্ক ভাষাসৈনিককে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছি। ১১ জানুয়ারি ২০১২ কারাগারে যাওয়ার পূর্বে তিনি লিখেছেন- প্রিয় দেশবাসী, ২০১১ সালের নভেম্বরে আমার ৮৯ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। বার্ধক্যে রোগের অন্ত থাকে না। আমার ডান পায়ে সায়াটিকা ও বাম হাঁটুতে আর্থরাইটিস। এর জন্য দু'বেলা এমন কতক ব্যায়াম করতে হয়, যা অন্য কারো সাহায্য ছাড়া করা যায় না। একা চলাফেরা করতে পারি না। ডান হাতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাম হাত একজনের কাঁধে রেখে মসজিদে যেতে হয়। তাই অত্যাবশ্যক না হলে কোথাও যাই না। ব্লাডপ্রেসারসহ নানা অসুখের কারণে রোজ নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। এ অবস্থায়ও সরকার ৯০ বৎসর বয়সে আমাকে জেলে নিচ্ছে। আমি জীবনে চারবার জেলে গিয়েছি। জেল

www.amarboi.org

বা মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না। শহীদ হওয়ার জযবা নিয়েই ইসলামী আন্দোলনে শরিক হয়েছি। মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিলে শহীদ হওয়ার মর্যাদা পাবো ইনশাআল্লাহ। এবার বার্ধক্যে ও অসুস্থতা নিয়ে বন্দিজীবন কেমন করে কাটবে সে ব্যাপারে মহান মাবুদের ওপর ভরসা করে আছি।"

আমি জেল, জুলুম, নির্যাতন, এমনকি মৃত্যুকেও ভয় পাই না। মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক, অনিবার্য। একদিন সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আখিরাতে বিশ্বাস করি, তাক্বদির বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না এবং তিনি যা করেন তা বান্দাহর কল্যাণের জন্যই করেন। সুতরাং, আমি আমার মৃত্যু নিয়ে সামান্যও শঙ্কিত নই। আমি নিশ্চিত, আমি এ দেশের মানুষের অকল্যাণের জন্য কোনো কাজ কোনোদিনই করিনি। নিরপেক্ষ তদন্ত ও নিরপেক্ষ বিচার হলে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হবো, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন, তারাও জানেন যে, আমি দোষী নই- এ সবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে যে রকম প্রহসনের বিচার হচ্ছে তেমন হলে তো আর কোনো বক্তব্য থাকে না। আমার দীর্ঘ ৫০ বছরের কর্মজীবনে সারাদেশে ব্যাপক সফর করেছি। জনগণের মধ্যেই বিচরণ করেছি। উন্নত নৈতিক চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। মানবতাবিরোধী যেসব অপরাধের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে তা কখনো জনগণ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ফাঁসি দিলেও জনগণ আমাকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবেই গণ্য করবে, ইনশাআল্লাহ।"

প্রিয়পাঠকবৃন্দ, সবমিলিয়ে আজ আমাদের মাঝে এমন এক গোলাম আযম উপস্থিত যার প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষমা; মহানুভবতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য এবং সহনশীলতার মতো যাবতীয় মহৎ গুণাবলির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে কালোত্তীর্ণ। নির্যাতিত-নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জনতার অধিকার এবং মর্যাদাবোধ সম্পর্কে এক আবহ তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার উদাহরণ নিকট অতীতে বিরল, একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ইসলাম, জাতিগত অধিকার এবং সচেতনতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ নিয়ে বিশ্ব যখন চরম সঙ্কটের মোকাবিলা করছে, ঠিক তেমনি একটি মুহূর্তে নিজের কর্মমহানুভবতার মাধ্যমে সমহিমায় নিজেকে এমনই এক প্রতীকে রূপায়িত করেছেন ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম।

আর ছোট একটি ঘটনা দিয়ে ইতি টানছি- দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগ তাকে সাজিয়েছে অন্যরকম এক মানুষ হিসেবে। এই রকম একটি মজার ঘটনা- লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে পার্লামেন্টের প্রাচীনতম অংশে সংবর্ধনা। এটি কারো জীবনে দু'বার দেখা বড়ই

www.amarboi.org

ভাগ্যের ব্যাপার। ১৯৬০ সালে-এ জেনারেল ডি গল এর। আর ১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার। তবে সংবর্ধনার সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল। দর্শকসারির অনেক রাজনীতিকই অতীতে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করতেন। কখনোই তার দেশের নেতৃত্বে আসা উচিত নয় বলে মনে করতেন। পার্লামেন্টের অনেক রক্ষণশীল সদস্য ম্যান্ডেলাকে একজন সন্ত্রাসী মনে করতেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেডি থ্যাচার, যিনি সামনের সারির কাছাকাছি বসেছিলেন। নয় বছর আগে তিনি বলেছিলেন যে, কেউ যদি ভেবে থাকে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস কখনো দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গঠন করতে পারবে তবে সে এক অন্ধকার অলীক রাজ্যে বাস করছে। আর এখন সেই অন্ধকার অলীক রাজ্য স্বয়ং লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে এসে ভর করেছে।" (সূত্রঃ এনথনি স্যাম্পসন ম্যান্ডেলা) বাংলাদেশেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তাই-ইবা কে জানে?

বাংলার বুকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক এখন ইসলামের পতাকাতলে সমবেত। যারা চিরদিন গোলাম আযমকে মনে রাখবে, চিরদিন ভালবাসবে, সম্মান করতে থাকবে নিজের গরজে। আপনাকে এই শ্রদ্ধা পেতে রাষ্ট্রের কোন আইনের প্রয়োজন পড়বে না। আপনার লিখনি অনাগত যুবকদের জন্য হবে নতুন পথের দিশা এবং ঘটবে নব উত্থান। আপনি দীর্ঘজীবী হোন সত্য পথে চলার অনুসারীদের কাছে। আপনি যে ভাষার জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন সে মাসেও আপনি বন্দী। এটি আমাদের ব্যর্থতা, জাতির জন্য লজ্জাজনক। শেষ বয়সে যখন অনেকের সহযোগিতায় নামাজ, খাওয়া আর নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ সারার কথা তখন আপনি একাকী নিভৃতে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে আছেন!। বাথরুমে পড়ে পায়ের চামড়া উঠে যাওয়ার খবর এবং প্রতিনিয়ত আপনার কষ্টের খবর কাঁদায় দেশে বিদেশে আপনার অনেক ভক্ত ও অনুরক্তকে। আমরা সকলে আপনার মুক্তির অপেক্ষায়...

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

ভারতের নগ্ন সংস্কৃতির করাল গ্রাসে
আক্রান্ত তরুণ প্রজন্ম

আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, "রাজনৈতিক আগ্রাসনের চেয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন অধিক মারাত্মক।" রাজনৈতিক আগ্রাসন হলে দেখা যায় হৈচৈ, ডামাডোল, আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিঃশেষ করে দেয় অতি গোপনে তিলে তিলে।

বলিউড তারকা কিং শাহরুখ খানের সম্প্রতি বাংলাদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠছে গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গন। বিশেষ করে শাহরুখ ভক্ত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তা উত্তাল তরঙ্গের মতো বিরাট এক আনন্দের ঢেউ খেলছে। তার আগমনে চতুরদিকে ছিল সাজসাজ রব। ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যা ছোটখাট কোন রাষ্ট্রপ্রধানের ভাগ্যেও জোটে না। একটি বেসরকারি সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। কিন্তু যদি আমরা বলি শাহরুখ খান আমাদের জন্য কী নিয়ে আসছেন। কী দিয়ে গেলেন। তিনি কি শুধু নিতেই এসেছেন? না ,আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কিছু দিবেন। শাহরুখ খান আমাদেরকে কী দিয়েছেন বা আমরা কী পেয়েছি তা পরের দিনের পত্রিকার এই নিউজের কয়েকটি লাইনের দিকে নজর দিলে হয়ত উপলব্ধি করা যাবে আমাদের লাভ-ক্ষতির অংশটি।

আমাদের দেশের একটি দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম ছিল- কেউ মাতোয়ারা কেউ ক্ষুব্ধ হতাশ। বলিউড কিং শাহরুখ খানের ২৫ হাজার দর্শকের আনুষ্ঠান ওম শান্তি ওম এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। সংক্ষিপ্ত নগ্ন পোশাকের ললনাদের উদ্বাহু নৃত্য আর প্রতিবেশী সংস্কৃতি তুলে ধরার এই প্রয়াসে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আবার গানে গানে মাতিয়ে রেখেছেন তিনি ভক্তদের। আবার অনেকেই সপরিবারে এসে এমন অশ্লীলতার দৃশ্যে দারুণ বিব্রত হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এটি নিতান্তই একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হলেও অনেকেই মনে করেন কিং শাহরুখ খান শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার নাম এমন একটি অশ্লীল অনুষ্ঠানে উচ্চারণ করে লাভের থেকে আওয়ামী লীগের ক্ষতিই বেশি হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ এখনো এই জাতীয় বেহায়াপনাকে ঘৃণা করে। তাছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি ইমামদের অনুষ্ঠানে আমেরিকান নর্তকী দিয়ে নৃত্য প্রদর্শনের পর শাহরুখ খানের অনুষ্ঠান আলেম উলামা এবং বিরোধী দলের জন্য সরকারের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের আরেকটি দলিল হবে। বাংলাদেশ সরকারকে আয়কর প্রদানের ধরন দেখে এটি আর কারোই বুঝতে বাকি নেই যে অনেক বড় আকারের অর্থ উপার্জন করে নিয়ে গেছে ভারতীয় শিল্পীরা। দেখা গেল আমাদের দেশের নামীদামি শিল্পীরা এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, আমরা পত্র-পত্রিকায় ও চ্যানেল গুলোর নিউজের ধরন থেকে যা প্রতীয়মান হলো বাংলাদেশের

www.amarboi.org

সংস্কৃতি প্রিয় ধর্মপ্রাণ মানুষ এই কনসার্টকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ ভারত আমাদের দেশের কোন সংস্কৃতি দেখানো তো দূরে থাক ভারতে বাংলাদেশের চ্যানেলও প্রচার অনুমতি পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এ প্রশ্নটি এখন ভালোভাবে দেখা দিয়েছে বর্তমান সরকার যেখানে আইন শৃংখলার অজুহাত তুলে দেশে ওয়াজ মাহ-ফিল করতে দিচ্ছে না, সেখানে সরকার পরিকল্পিতভাবে নিজেদের গুণকীর্তনের বন্দনার জন্যই কি এই কনসার্টের আয়োজন করেছে। যে সময় ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে- আমাদের মা-বোনেরা। মাদকসহ নানা রকম সামগ্রীর ছোবল গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্মের এক- একটি মেধাকে। ঠিক সে সময়ে এমন উলঙ্গপনা একটি অনুষ্ঠান তরুণ প্রজন্ম তথা গোটা জাতির জন্য অনেক বড় আত্মঘাতীর কারণ হতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে এখানে এইডসসহ অন্যান্য অসামাজিক কাজ একেবারেই কম। ভারতের অবস্থা এই দিক থেকে ভয়াবহ হওয়ায় ভারত পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র ও ভিডিও না যতখানি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর তার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর প্রবাসী কর্তৃক সংস্কৃতির আবর্জনা তথা আমদানি Live together (মুক্ত যৌনাচার)- এর ফল এইডসের মরণব্যাধির আগ্রাসন, নানা ধরনের কনসার্ট, ব্যান্ড বিশেষ করে পাশ্চাত্যের পোশাকের নামে উলঙ্গপনা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতির নামে ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে আজকে প্রতিটি ঘরে ঘরে ব্লু-ফিল্ম এমনকি টিভি সেক্স (?) দিয়ে আমাদের পারিবারিক বন্ধনে দারুণভাবে আঘাত হানছে, আর এই অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে আমাদের সমাজের কেউ রেহাই পাচ্ছে না।

পাঠকবৃন্দ এবার লক্ষ করুন ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ভয়াবহ চিত্র- দিল্লী থেকে প্রকাশিত মাসিক ইউজানার ১৯৯৫ সালের আগস্ট সংখ্যায় ড. সবিতা রাখেরীর একটি সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি ভারতীয় সমাজে সিনেমার নেতিবাচক প্রভাব- সিনেমা অশ্লীল মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যৌনতা, অশ্লীলতার প্রসার, সামাজিক ও নৈতিক অপরাধে প্রবৃদ্ধি, বাস্তবতার পরিবর্তে অলীক স্বপ্নের জগতে বিচরণ, বাস্তব সমস্যা সংকটের মোকাবেলা ও সমাধান করার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা, গুণ্ডামি, সন্ত্রাস, হত্যা ব্যভিচারসহ অন্যান্য চারিত্রিক ও নৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়া এবং যারা এসব অপরাধে জড়িয়ে আছে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উক্ত জরিপে বলা হয়েছে ৩৩% লোকের অভিমত, সিনেমা দেখায় আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়, ২৭% লোকের অভিমত, সামাজিক বিপর্যয় ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিতে সিনেমা বিরাট ভূমিকা পালন করে, ৩৪% লোকের অভিমত দশ বছর পূর্বেও

www.amarboi.org

সিনেমা বিনোদনের মাধ্যম ছিল, কিন্তু এখন তা যৌন ও চারিত্রিক বিপথগামিতা, সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা শেখানোর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আরেকটি জরিপে শুধু দিল্লির যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তা কোনো মন্তব্য ছাড়াই আপনি অনুমান করতে পারবেন, ভারতীয় সমাজ কোন কদর্যে ফেঁসে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক দাওয়াতে দিল্লী তার এক সংখ্যায় এটা ভারতের সংবাদ শিরোনামে নিম্নের সংবাদগুলো উপস্থাপন করেছে। দিলি-র পুলিশ কমিশনার ১৯৯৫ সাল তার বছর শেষের কার্যক্রম বিশ্লে-ষণ করতে গিয়ে এ বাস্তবতা স্বীকার করেছেন, ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে অপরাধের হারে ২৪% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আরও প্রকাশ থাকে, কেবল ২০% অপরাধ পুলিশের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। পুলিশ কমিশনার একথাও বলেছেন, পুলিশের হেফাযতে নেয়া অপরাধীদের মধ্যে ৮৮% এমন যারা প্রথমবার মাত্র অপরাধ করেছে। পূর্বে তাদের অপরাধের কোনো রেকর্ড নেই।

দৈনিক পাইওনিয়ার দিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪ এবং দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া-১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় লাখনৌ, দিল্লি ও উত্তর প্রদেশের অল্পবয়স্ক শিশুদের অপরাধ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়, নতুন প্রজন্ম কোন পথে ধাবমান।

যখন টিভি ও সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, 'এখন পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে ভবিষ্যতের পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচান। (অমৃতসরের ড. বিজ্ঞাপন) অর্থাৎ যদি পেটে মেয়ে সন্তান থাকে তাহলে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে ভবিষ্যতে তার বিয়ে-শাদির খরচ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচান। অমৃতসরে ৯৫% নারী তাদের গর্ভের কন্যাসন্তান বিনষ্ট করেছে। ১৯৯৫ সালে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিশ লাখ গর্ভ নষ্ট করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে সামগ্রিকভাবে কন্যাসন্তান জন্মের হার সাড়ে সাত লাখ হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসাবমতে শুধু যৌতুকের কারণেই প্রতিবছর গোটা দেশে আট হাজার নয়শ' সাতাশি জন নারীক আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়।

ভারতের বি এম এ্যাডেস ও মোম্বাই আইয়েট-এর মতো অশ্লীল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় ছয়শ' বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ফিসোলিস, পালে- দে এবং গায়েজ এন্ড গার্লসে মুদ্রিত এসব বিজ্ঞাপন নগ্নতা ও অশ্লীলতার সীমাহীন প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। এর বাস্তব প্রদর্শনী বড় বড় হোটেলগুলোতে স্ত্রীদের বিনিময় চাবির বিনিময়ের আকৃতিতে হচ্ছে এ সাধারণ যৌন মেলামেশায় না বয়সের আর না আত্মীয়তার শর্ত আছে। তাদের কথা হলো, জীবন স্বল্প সময়ের জন্য। এই স্বল্প সময়ে যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করে নাও। এ হিসেবে আমাদের সন্তানরাও তো যুবক যুবতী। তাদেরও প্রবৃত্তির চাহিদা আছে। তাদেরও অবাধ স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ সরবরাহ করা উচিত। আমরা যখন স্বাধীন তখন আমাদের সন্তানদেরও স্বাধীন ছেড়ে দেয়া কর্তব্য। তারা তাদের পথ অবলম্বনে তেমনি স্বাধীন, যেভাবে আমরা স্বাধীন। ইন্ডিয়া টুডে'র রিপোর্টার সবশেষে এ কথার ওপর তার রিপোর্টের

www.amarboi.org

ইতি টেনেছে, 'মোটকথা আমাদের তো একথা প্রমাণ করতেই হবে, ভারত কামশাস্ত্রের ভূ-খণ্ড'।

এক সিনেমা অভিনেতা খান ড্রেস পরিধান করেছে তো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই খান ড্রেস পরা শুরু করেছে। এক সিনেমায় এক মেয়ে তার প্রেমিকের সাথে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় দেয়ালে লেখে গেছে, 'প্রেম যখন করেছি তখন ভয় কিসের'। এর কিছু দিনের মধ্যেই ডজনের পর ডজন এমন ঘটনা ঘটে যায়। সিনেমায় যা কিছু দেখে নতুন প্রজন্ম তা বাস্তবায়ন শুরু করে দেয়। অভিনেতা চওড়া অথবা সংকীর্ণ প্যান্ট পরল তো এটা ফ্যাশন হয়ে গেল। সিনেমায় ডাকাতির দৃশ্য দেখে অল্প বয়স্ক শিশুরা ব্যাংকের ওপর হানা দিয়েছে, বাস লুটপাট করেছে। স্বয়ং দিল্লি সরকারের রিপোর্ট।

ভারতীয় আধিপত্যবাদের লক্ষ্যে এই নগ্ন সংস্কৃতি আমাদের জাতীয়তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সব সময় বিভ্রান্তি ছড়ায়। এজন্য বলা হয়, আমরা ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পেলেও তাদের চিন্তার কবল থেকে রেহাই পাইনি। তাদের আনন্দের বর্ণনা এভাবে- "We must at present do our best from a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indians in blood and colour, but in English in tastes, in options in morals and intellect." অর্থাৎ, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করছিল তাদের সাথে শাসক ইংরেজদের মধ্যে দূতের কাজ করা এবং রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় হলেও মেজাজে, চিন্তাভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে যাবে-এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করাই ছিল তাদের এই নতুন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। আজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের গোটা জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ভারতীয় ছায়াছবি, বই ও পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, বেসরকারি টিভি চ্যানেল, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, এনজিও, সাহিত্য, অশ্লীল ম্যাগাজিন ও কার্ড, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

অন্য আরেকটি রিপোর্টে দেখা যায়, দিল্লিতে প্রতি মাসে দুই হাজার অবিবাহিত মেয়ে গর্ভপাত ঘটায়। দিলি-র বিভিন্ন আদালতে ধর্ষণের ৮৯৩টি মামলা বিচারাধীন। ১৯৯৬ সালে গোটা দেশে চল্লিশ হাজার ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অথচ ৯০% ধর্ষণের ঘটনা বদনামের ভয়ে থানায় ডায়েরি করা হয় না। ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। ইন্ডিয়া টুডে'র ১৯৯৭ সালের ১৬ জানুয়ারি সংখ্যা থেকে জানা যায়, আমেরিকার মতো ভারতেও মিনিট ও ঘন্টার হারে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ প্রতি ৪৫ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, প্রতি ২৬ মিনিটে একটি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে, প্রতি ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটে একজন নারীকে যৌতুকের জন্য আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং প্রতি ৩৩ মিনিটে একটি জুলুমের ঘটনা ঘটছে। সাপ্তাহিক সানডে'র ১৯৯৭

www.amarboi.org

সালের জুন সংখ্যায় 'হেল্প লাইন' নামক একটি সংস্থা পরিচালিত এক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে পিতা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন, মামা-ভাগিনা ও চাচা-ভাতিজীর মাঝে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা ঘটছে। এ সংখ্যা বিপজ্জনক হারে বাড়ছে।

দক্ষিণ দিলি-র এডিশনাল পুলিশ কমিশনার মি. প্রমিরা বলেন, সিনেমা ও টিভি দুটোই যৌনতা ও উগ্রতাকে নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপন করার পরিবর্তে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করে। যা অল্প বয়স্ক শিশুদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে সিনেমা টিভি দুটোই সমান যিম্মাদার। তিনি বলেন, সিনেমায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উগ্রতা দেখানো হয়। নতুন প্রজন্মের মেধা-মননে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে উগ্রতা, বিদ্রোহ ও বিপথগামিতার দিকে ঠেলে দিতে একদিকে যেমন সিনেমা যিম্মাদার, অপরদিকে যিম্মাদার কঠোর আইনের অনুপস্থিতি।

'বাজিগর' সিনেমা একটি ব্যবসা সফল সিনেমা ছিল। এ সিনেমায় প্রভাবিত হয়ে মোম্বাইয়ের এক নওজোয়ান দানেশ কাজী তার প্রেমিকা ভারতী রামচন্দ্রকে হত্যা করার পূর্বে তার থেকে একটি আত্মহত্যার চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিল। এরপর একটি উঁচু ভবনের ছাদে নিয়ে সেখান থেকে নিচে ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। এমনিভাবে 'রঘুবীর' সিনেমার একটি দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে এক অল্প বয়স্ক নওজোয়ান তার সমবয়সী এক বন্ধুকে হত্যা করেছে।

মনস্তত্ত্ববিদ ডা. এল কে ভগত বলেন, সিনেমার দু'টি দিক রয়েছে, তা হলো, হিরো বা নায়ক ভাল ও সুন্দর দৃশ্যে আর ভিলেন খল চরিত্রে অভিনয় করে, কিন্তু জীবনের ভারসাম্যের দিকটি ধামাপাচা পড়ে যায়। বলিউডের রাজা শাহরুখ খান সিনেমায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে বেঁচে যায়। এতে করে নওজোয়ানদের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়ে। এছাড়াও নায়কের চরিত্র ও ভূমিকা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে লোকেরা নিজেদের সেসব চরিত্রের সাথে একাকার করতে প্রয়াস চালায়। মি. কলি আরো বলেন, সিনেমা শুধু মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ওপর প্রভাব ফেলে। তারা সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে প্রয়াস চালায়।

এক গবেষণায় অপরাধের কারণ ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা হলে নিম্নবর্ণিত কারণগুলো সামনে আসে– ক. অশ্লীল ও নগ্ন সিনেমা, খ. টিভি সিরিয়াল, গ. চরিত্রবিধ্বংসী অশ্লীল ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তক, ঘ. নাইট ক্লাব ও হোটেলগুলোতে নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারী নৃত্য ও ড্যান্স, ঙ. যৌন সুড়সুড়িমূলক পোস্টার ও ছবি, চ. যৌন উত্তেজক বিজ্ঞাপন, ছ. অর্ধনগ্ন লেবাস পরে নারীদের অবাধ চলাফেরা, জ. সহশিক্ষা, ঝ. বাজার, ক্লাব, স্কুল, কলেজ, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ঞ. মাদক ও নেশাজাত দ্রব্যের ব্যাপক প্রসার। আর পরিকল্পিতভাবে পেঁয়াজ-রসুন আমদানির মত

www.amarboi.org

আমাদের তাদের এই অপসংস্কৃতির রফতানি করছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার "Discovery of India" গ্রন্থে হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ হওয়ার পরও আমাদের ক্ষেত্রে এই নীতি মানা হয় না।

একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মুসলিম দেশসমূহের জীবনপ্রবাহে ইসলাম অনিবার্য তা স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়- "In Some Muslim lands here a deeps desire that state. Should is some fashion reflect the sprite of Islam." এসব দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করা যায়।

আরনাল্ড ম্যাথিউ বলেছেন, "পৃথিবী সম্বন্ধে যা উৎকৃষ্ট বলা বা চিন্তা করা হবে তা জানাই সংস্কৃতি।" ড. আহমদ শরীফের মতে, "সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রুত জীবন চেতনা। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।" নরেন বিশ্বাস এর মতে - "শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ বা কৃষ্টি যা তার মধ্যে নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত, বিনম্রীকৃত, শুষিত এধরনের মনোভাবসমূহ।" আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেছেন, "কালচার বা সংস্কৃতি মানুষের মন ও বিকাশের স্তরবোধক।" এ সকল সংজ্ঞায় স্পষ্ট যে কোন সমাজ বা জাতির মনে কোন একটা ব্যাপারে একটা Standard ব্যবহার বিধি, সার্বজনীন চরিত্র আচরণ বা আখলাকের রূপ পরিগ্রহ করলেই সেটাকে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে। এইচ.জে লাস্কি। বলেন- "Culture is that what we are". এতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক।

ই.বি. টেইলর বলেন : "That Complex whole which includes knowledge's, believe, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." "জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে আহরিত অন্য যোগ্যতা ও অভ্যাসের সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে।" T.S. Eliot-এর মতে, 'সংস্কৃতির দু'টি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ- একটি ভাবগত ঐক্য, আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক।' তার মতে ধর্ম সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির আয়নাস্বরূপ। এটা মানবগোষ্ঠীর রীতিনীতির পরিশীলিত, কর্ষিত এবং ঐতিহ্য পরম্পরাগত অনুভবের দৃঢ়তা থেকে উদ্ভূত হয়। সংস্কৃতিরও নানামাত্রিক উপাদান রয়েছে। ইসলামে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছে, তার মূল উপাদান হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাত। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি, পবিত্রতা, দায়িত্ববোধ ও ভারসাম্য। এগুলোর পরিপন্থী এমন কোনো উপাদান ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্গত হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ব্যাপ্তি যেমন

www.amarboi.org

বিশাল, তেমনি বিশাল এর সৌকর্য ও সৌন্দর্য।

স্বকীয় সংস্কৃতি হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। কোনো জাতিকে কমজোর করে পদানত রাখতে চাইলে আগে তার সংস্কৃতিকে দূষিত ও বিনষ্ট করতে হবে। কেননা সংস্কৃতি জাতির প্রাণশক্তি, আর এই প্রাণশক্তিই জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করায়। মূলত একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে, যে চেতনার বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সেই চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। একটি জাতি কতটা সফল হয়েছে তার নিরিখে তার সংস্কৃতি স্বাধীনতার পরিমাপ করা যায়। এদিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের এই দীর্ঘ কালকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে সংস্কৃতির চেতনায় সুকৌশলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে A Victory without war এবং এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিক হচ্ছে দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। বস্তুত বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে তিনটি ভাগে চলছে–এক. আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, দুই. পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র, তিন. অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র। এর মধ্যে আধিপত্যবাদী আগ্রাসনই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, যা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়। ভারত এবং পশ্চিমারা আমাদের ওপর সেই আগ্রাসনই চালাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা নিয়ে দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই বিভ্রান্তি চলছে। এ দেশের সরকারগুলোর অতিমাত্রায় ভারতপ্রীতি, সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা, হীনম্মন্যতা, পশ্চিমাদের প্রতি নমনীয়তা, তার সাথে আধিপত্যবাদীদের রাজনীতি অভিলাষ চরিতার্থের চক্রান্তই অন্যতম। এসব অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ করা আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। এ দাবি পূরণে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে। বুঝতে হবে আমাদের লালিত, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র মুসলিম সংস্কৃতিকে। আজ বাংলার মানুষের প্রত্যয় হোক আগ্রাসী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। আগামীর প্রজন্মকে তথা বর্তমান ছাত্রসমাজকে নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামী অনুভূতি জাগ্রত করে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থাই পাল্টাতে পারে আমাদের অপসাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা। বর্জন করতে হবে বিজাতীয় সংস্কৃতি। এখনই সময় এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। বাংলাদেশ হোক আগ্রাসী সংস্কৃতির দখলমুক্ত সুখী-সুন্দর-সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির ধারক-বাহক।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

হতাশার তরীতে ভাসছে আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ অতীব পুরাতন একটি নাম। অনেক উত্থান-পতন আর চড়াই উতরাই এর মধ্যদিয়ে তার পথচলা। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একক দাবিদার এই দলটি ক্ষমতার পালাবদলে দ্রুতগামী গাড়ির মত ব্যালেন্স হারিয়েছে অনেকবার। ক্ষমতা হাতে পেলেই এই দলটি একক কর্তৃত্ব কায়েম করতে গিয়ে "ওয়ানম্যান ও ওয়ানপার্টি" এই সূত্রটির প্রয়োগ করেছে অনেকবার। ফলে দেশ হয়েছে গণতন্ত্রহীন আর দলের মধ্যে ব্যক্তি হয়ে পড়েন ক্ষমতার একক নায়ক তথা স্বৈরাচারী। এর মধ্যে দিয়ে জাতির কাঁধে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল একদলীয় বাকশাল, আর ব্যক্তি স্বৈরতান্ত্রিকতার মানসিকতার কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের মত আকাশচুম্বী জনপ্রিয় নেতাকে নামিয়ে আনল মানুষের ভালবাসার শূন্যের কোঠায়।" শেখ মুজিব যখন বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন তখন লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফে পিটার গিল লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশ থেকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। ঢাকার পার্লামেন্টের (মাত্র) এক ঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না। .. শেখ মুজিব এম.পি.দের বললেন, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল "ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান।" তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে "ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী" বলে অভিযুক্ত করলেন। আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রের দাবি যে কতটা মেকি, সেটির প্রমাণ তারা এভাবেই সেদিন দিয়েছিল। দলটির নেতাকর্মীরা সেদিন দলে দলে বাকশালে যোগ দিয়েছিল, এরকম একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের বিবেকে সামান্যতম দংশনও হয়নি।

ঠিক সেই পুরনো পথেই হাঁটছে বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। বিগত ডিজিটাল কারচুপির নির্বাচনে আকাশছোঁয়া স্বপ্ন, আর বিশাল

www.amarboi.org

আসন লাভ করে বিজয়ের তরীতে উঠেছিল আওয়ামী লীগ। মাত্র তিন বছরের নেতা কর্মীর, চোখে-মুখে আজ হতাশার ছায়া। সামনের জাতীয় নির্বাচনে ফের ২০০১ সালের মতো ফলাফল বিপর্যয় ঘটে কিনা তা নিয়ে খোদ শাসক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালো মেঘ। আগামী নির্বাচন নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের সাম্প্রতিক উক্তি, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট, আর বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকার জনমত জরিপ সবটাই আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যাওয়ায় স্বয়ং আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকতা শংকিত হয়ে পড়েছেন।

দেশের অর্থনীতিতে ইতিহাসের সর্বগ্রাসী সংকট, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, কাবিখা-কাবিটার মতো গণমুখী কর্মসূচি, লুটপাট, শেয়ার কেলেঙ্কারি, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সহিংস ত্রাসের রাজত্ব কায়েম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীল পরিবেশ, টেন্ডারবাজি, দলীয়করণের সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। সিটি করপোরেশন, জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন নির্বাচনের ফলাফল বিএনপিকে উজ্জীবিত করেছে, তেমনি যুদ্ধাপরাধের ভাংগা টেপরেকর্ডার বাজিয়ে আর জামায়াত-শিবিরের উপর নির্যাতনের সকল কিছু প্রয়োগ করার পরও উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়নে ইতিহাসের সবচেয়ে ভাল ফলাফল লাভ করে জামায়াত। এতে দেশের জনগণকে বিরোধীদল দিয়েছে নতুন বার্তা আর আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে যোগ হয়েছে হতাশার নতুন মাত্রা। বাকশাল কায়েমের আদলেই আওয়ামী লীগ আবার ১ মিনিটে চারশত বছরের পুরনো সিটি কর্পোরেশন ভেংঙে দুই টুকরা করা হলো। আওয়ামী লীগ, জামায়াতসহ তৎকালীন বিরোধী দলের আন্দোলনের ফসল বিএনপি সরকারকে দিতে বাধ্য করা সেই কেয়ারটেকার সরকার এক ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটল জাতীয় সংসদে মাত্র কয়েক মিনিটে সংবিধান থেকে কর্তন করার মাধ্যমে। বিশ্বায়নের যুগে ড. ইউনূস ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের টানাপড়েন দলের কর্মীদের যেমন হতাশ করেছে তেমনি সীমান্তে নির্দয় বিএসএফের হাতে নিরীহ বাংলাদেশী নির্যাতন, তিস্তার পানি আদায়ে ব্যর্থতা, টিপাইমুখসহ নানা ইস্যুতে দুর্বল কণ্ঠের কথাবার্তা ব্যথিতও করেছে দেশপ্রেমিক অনেক নেতা-কর্মীকে।

চিত্রটি পত্রিকায় এভাবেই ফুটে উঠেছে-"সর্বত্র নেতা-কর্মীদের মুখে মুখে প্রশ্ন–এমনকি আলাদীনের চেরাগ নিয়ে দেড় বছর পর ভোটের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো, যাতে গণরায় লাভে বাজিমাত করবে? নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার মতো তুরুপের তাস তাদের হাতে দেখছেন না। এমনকি মহাজোটের শরিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ক্রমশ শেষ তলানির দিকে যাচ্ছে। হতাশা ক্ষুব্ধ কোনো কোনো কর্মীর কথা হচ্ছে, ভোটের ময়দানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে খালেদা-এরশাদ যাকে পায় তাকেই মানুষ ভোট দিয়ে দেয় কিনা সেই আশঙ্কা উড়িয়ে

www.amarboi.org

দেয়ার মতো নয়। একই সঙ্গে নেতা-কর্মীরা অভিন্ন সুরে বলছেন, বামরা যতবার আওয়ামী লীগে ভর করেছে ততবার তরীই ডোবেনি, বিপর্যয়ও এসেছে। চমক লাগানো মন্ত্রিসভা বলে শুরুতেই নিজেরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছিলেন, হতাশ কর্মীদের সমালোচনার তীর তাদের দিকেই। ক্যাবিনেট গঠনের শুরুতেই এককালের দেউলিয়া ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এসে আশ্রয় নেয়া আদর্শচ্যুত বামদের প্রায় সবাই ঠাঁই পেয়েছে এবারের মন্ত্রিসভায়। আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করা মুজিব অন্তঃপ্রাণ, শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল পথ চলা নেতা-কর্মীরা বড় ধরনের ধাক্কা খান। ইতিহাসের পরতে পরতে নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠা আর আওয়ামী লীগ রাজনীতির দুর্গম গিরিপথ হেঁটে আসা বড় বড় নেতা প্রথমেই ছিটকে পড়েন। তারপর দলীয় কাউন্সিলে বাদ পড়েন দলের আলোকিত মুখগুলো। মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল, আমু, সুরঞ্জিত, নাসিমসহ অনেকেই। লাখ লাখ হতাশ কর্মী আজ একদিকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অন্যদিকে গণবিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় নেতাদের দিকে ব্যর্থতার অভিযোগে আঙুল তুলে ঘরে-বাইরে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় তুলছেন। দল আর মহাজোটে সমন্বয়হীনতা, প্রশাসনসহ নানা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা, কোনো কোনো অকর্মণ্য উপদেষ্টা হঠাৎ মন্ত্রী-এমপি হওয়ায় সুযোগ সন্ধানী বিতর্কিত ভূমিকা আর মন্ত্রীর অতি কথনের অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। আবদুল জলিল যখন উপদেষ্টাদের নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। এখন উপদেষ্টারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র সমালোচিত। এখন এরশাদ, ইনু, মেনন বলছেন আমাদের উপদেষ্টারা কি বাংলাদেশের না ভারতের?

"শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের মন্ত্রিসভায় সাবেক কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থকরাই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। কমিউনিস্ট ছাড়াও সাবেক বামধারার সমর্থকদের অদৃশ্য জোট মন্ত্রিসভায় বিশেষভাবে আলোচিত। জ্যেষ্ঠতার তালিকায়ও সাবেক কমিউনিস্টদেরই অগ্রাধিকার। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন, তাদের প্রায় সবাই এসেছেন বামধারার রাজনীতি থেকে। আর মূল ধারার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বা এক সময় ছাত্রলীগ করতেন, এমন মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভায় তুলনামূলক গুরুত্বহীন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কার্যত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার চালাচ্ছে কমিউনিস্টরাই। সরকারে দলের নেতারা এখন গুরুত্বহীন। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পরই অর্থমন্ত্রীর গুরুত্ব। সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন সেই সৌভাগ্যবান মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় আরেক প্রভাবশালী মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেও দলে মতিয়া চৌধুরী এখনো 'কমিউনিস্ট' হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ছাত্রলীগের সঙ্গে যখন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মতে "মতিয়া চৌধুরী শেখ মুজিবের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে চেয়েছিল" এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন করা

www.amarboi.org

সাস্থ্যমন্ত্রী ডা. অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ কেবল ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন না, আওয়ামী লীগে যোগ দেয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এমপি না হয়েও টেকনোক্র্যাট কোটায় এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে হাতেখড়ি নেয়া ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। স্ত্রী মাহফুজা খানমও ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী ছিলেন। তিনি বিনিময়ে পেয়েছেন তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইজারা। পূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান। প্রকৌশলী ইয়াফেস ওসমান টেকনোক্র্যাট কোটায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব এক সময়ের ছাত্র ইউনিয়নের ডাকসাইটে এই নেতা। দিলীপ বড়ুয়াকে কমিউনিস্ট ঘরানার লোক বলেই মনে করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। সাবেক বাম নেতা বর্তমান নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। এর বাইরেও আরো দু-একজন প্রভাবশালী সদস্য বর্তমান মন্ত্রিসভায় আছেন, যারা কোনা না কোনা সময় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (সূত্র :১৬ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ প্রতিদিন .....)

এভাবে সরকারের তিন বছরের মাথায় এসে জনসমর্থন হারানোর পাশাপাশি মিত্রদের সমর্থনও হারাতে বসেছে ক্ষমতাসীন দল। সরকারের ব্যর্থতার নানা দিক নিয়ে বিরোধী দলের পাশাপাশি মুখ খুলছে ক্ষমতাসীন মহাজোটের শরিক দলগুলোও। অন্যদিকে সরকারের মেয়াদ যতই শেষ হয়ে আসছে, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে ততই অনীহা বাড়ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে- নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, রাজনীতির মাঠে ততই নিঃসঙ্গ হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলটি। ১৪ দলের শরিক দলগুলো সম্প্রতি আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে একটি বৈঠক করেছে। ওই বৈঠকে আওয়ামী লীগের 'একলা চলো' নীতির কড়া সমালোচনা করা হয়। ওই বৈঠকে সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা তুলে ধরা হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। মেনন প্রথম আলোকে বলেন। "বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন টিপাইমুখ বাঁধ, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জনজীবনের সমস্যা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার- এসব বিষয়ে সরকারের সঙ্গে শরিক দলগুলোর আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন থাকলেও তা হচ্ছে না।" বাম শরিকদের পাশাপাশি মহাজোটের অন্যতম প্রধান শরিক জাতীয় পার্টির সঙ্গেও আওয়ামী লীগের দূরত্ব বেড়েছে অনেক। জাতীয় পার্টি প্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ পরবর্তী নির্বাচন এককভাবে করার ঘোষণা দিয়েছেন। কোনো দলের সঙ্গে পরবর্তী নির্বাচনের আগে আর জোটবদ্ধ না হওয়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে ২০০ আসনে তাঁর দলের প্রার্থী চূড়ান্ত। এ ছাড়া এরশাদ সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রে দেয়া সাক্ষাৎকারে মন্ত্রিসভা এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের সমালোচনা করেন।

www.amarboi.org

পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে বলেন, মহাজোটের শরিকদের আস্থায় নেয়া দূরে থাক, ক্ষমতার রাজপ্রাসাদে একাই প্রবেশ করেছে আওয়ামী লীগ। অবশ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, জাতীয় পার্টির সঙ্গে কখনোই রাজনৈতিক ঐক্য হয়নি। দলটির মতে, জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী আঁতাত হয়েছিল, ঐক্য নয়। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা 'যুদ্ধাপরাধীদের' বিচারের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি পালন করা হয়েছে, তার কোনোটিতে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ ছিল না। নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সার্চ কমিটির বিষয়ে আওয়ামী লীগ অন্য শরিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেও মতামত নেয়নি জাতীয় পার্টির। ড. কামালের ভাষায় "এটা মহাজোট নয় মহাজট।"

হতাশাক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগাররা এক সময় আশা করতেন মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদল ঘটবে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও ওবায়দুল কাদেরকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ায় কর্মীরা খুশি হলেও পরিবর্তনটা বড় ধরনের না হওয়ায় হতাশ। কিন্তু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অর্থকেলেঙ্কারিতে পদত্যাগ, সোহেল তাজের সাংসদ ছাড়া, ইলিয়াসসহ শতাধিক বিরোধী দলের নেতা ও সাধারণ মানুষের গুম হওয়া নিয়ে বিরোধী দলের লাগাতার আন্দোলন আওয়ামী লীগকে দেশে-বিদেশে অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

উপজেলা নির্বাচনে দলের নিবেদিতপ্রাণ প্রায় সবাই দগ্ধ তেমনি সাধারণ মানুষও হতাশ আর ক্ষুব্ধ। সরকার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত সেদিকেও হাঁটছে না। শেষ পর্যন্ত অনেক জেলায় প্রশাসক পদে এমন সব দলবাজকে নিয়োগ দিয়েছে যারা স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হলে ভরাডুবি ঘটবে। এমনকি এদের কেউ কেউ সংসদের উপ-নির্বাচনে আবার কেউবা পৌর নির্বাচনে হেরে গেছেন। এতে স্থানীয়ভাবে মাঠকর্মীদের হতাশও করেছে। আওয়ামী লীগ ও সরকার ক্রমশ কর্মী বিচ্ছিন্নই নয়, মানুষ বিচ্ছিন্নই নয়, দুঃসময়ের স্বজন, বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিডিয়া থেকেও দূরে সরে গেছে। বিশেষ করে চ্যানেল বন্ধ করা ও সাগর-রুনি হত্যাকে কেন্দ্র করে। সরকার হারাচ্ছে জনমত, দুর্বল হচ্ছে দল। তাছাড়া সরকার এবং আওয়ামী লীগের সকল শক্তিব্যয় করার পরেও চারদলীয় সমমনা দলের গণমিছিল, আর চলচল ঢাকা চলো কর্মসূচি বিরোধী শিবিরে আশার সঞ্চার আর আওয়ামী লীগ হতাশার শক্তিশালী আঘাত হেনেছে। দেশের রাজনীতিতে পুরাতন ও পাকা খেলোয়াড় হিসেবে আওয়ামী একথা খুব ভালো করেই জানে নেতা-কর্মীদের মনোবল একবার ভেংগে গেলে তা কোন শক্তিশালী কোরামিন দিয়েও আর ফিরানো সম্ভব নয়। তাই নীতিনির্ধারণী ফোরামের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এখন জনসভা আর জেলাভিত্তিক মতবিনিময় করতে শুরু করেছেন। এখন দেখার বিষয় হতাশার দোলাচলে জনস্রোতের বিপরীতে আওয়ামী লীগ কত সময় টিকে থাকতে পারে।

www.amarboi.org

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এবার আসুন আমরা আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে আওয়ামী লীগের সেই শাসনামলের বর্ণনা বিদেশী লেখক "অ্যান্থনী মাসকারেনহাস তার বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি লাইন দেখে নিই। মনে হবে বর্তমান সরকারের চরিত্রের-ই বুঝি এপিঠ ওপিঠ। তিনি লিখেছেন, "ছোটখাট দোকানি থেকে বিজনেস ম্যাগনেট" আর ছোট কর্মচারী থেকে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি পর্যন্ত কেউ দুর্নীতিতে বাদ গেলো না। যে যেভাবে পারলো, লুটেপুটে রাতারাতি মহাসম্পদশালী হবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। যার যার সুবিধামত নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে নিল। কেউ আত্মীয় স্বজনের নামে, আবার কেউ পরিষ্কার নিজের নামে। শেখ মুজিবের নির্বোধ, ব্যক্তিত্বহীন চাটুকারের অভাব ছিল না। তিনি আওয়ামী লীগের দ্বারাই কোণঠাসা হতে বাধ্য হলেন। ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি সব জায়গায় তার দলীয় লোকদেরকে বসিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য যোগাযোগের দু'দিক রক্ষা করা। কিন্তু অতিমাত্রায় মোসাহেবিতে যোগাযোগের একটি পন্থা অচল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব চতুর্দিক থেকে কেবলই জনগণের দুর্দশার কথাই শুনছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলে তার চাটুকারেরা বেমালুম অস্বীকার করে বলতো, "এ সবই দুষ্ট লোক আর রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অংশবিশেষ।" এভাবে পুরাকালের গ্রিক দেবতাদের মতো, ওরা তাকে পাগল বানিয়ে ধ্বংস করে দিলো। আবার চল্লিশ বছর পর আওয়ামী লীগে যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

পৃথিবীর সব স্বৈরশাসকদের কেবলা যেন একমুখী। কথায় বলে "যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ।" আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু কাজে স্বৈরাচারী। বিশ্বাসে বাকশাল আর চরিত্রে ফ্যাসিস্ট। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বর্তমান মহাজোট সরকার তাদের অপকর্ম ঢাকতে আজ ফ্যাসিস্ট নীতিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এই সরকারের অন্যতম ফ্যাসিস্ট নীতি হলো, জেল জুলুম নির্যাতন আর মামলাবাজি। বিপরীত মতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর জুলুম নির্যাতন চালানো। এ জন্য তারা ব্যবহার করছে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে। বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ করতে কথায় কথায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা এ সরকারের অন্যতম হাতিয়ার। অবশ্য আওয়ামী লীগের এ চরিত্র অতীব পুরাতন। আওয়ামী লীগই বাংলাদেশে একমাত্র দল যারা বাকশালী চরিত্র থেকে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়ায়নি। আজ স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হলেও আওয়ামী লীগের চরিত্রের খুব একটা উন্নতি ঘটেনি। তাদের আজকের কার্যক্রম যেন পুরনো দিনের প্রতিধ্বনি-ই মাত্র।

তাইতো বিদেশী সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ" 'বাংলাদেশ লেগ্যাসি অব ব্লাড' এর ৪৩ পৃ' উল্লে-খ করেছেন। এভাবে- ১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছর। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, কালোবাজারি, চোরাচালান আর রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ, রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। শেখ মুজিব তাঁর রক্ষীবাহিনী আর সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মীদের দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। পক্ষে-বিপক্ষে চতুর্দিকে কেবল অস্ত্র আর অস্ত্রের ঝন্-ঝনানি। সাধারণ মানুষের মধ্যে করুণ নিরাপত্তাহীনতা। সেই সময় মাত্র ৬টি জেলা থেকে ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে কেবল রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ২০০০ অতিক্রম করে। শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল ছিল অত্যন্ত বদ মেজাজি। বাংলাদেশকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করত। এজন্য তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করতো।" আজো আওয়ামী লীগ সেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার পুরনো হাতিয়ার ব্যবহার করে বিরোধী দলকে দমন করে চলছে।

আমার মত একজন ক্ষুদ্র নাগরিকও সেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার আওয়ামী অক্টোপাস থেকে রেহাই পায়নি। ২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে লগি-বৈঠা ধারীদের আঘাতে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টনের ঐ লগি-বৈঠাধারীদের বুলেটবিদ্ধ হয়ে আমিও সেই

www.amarboi.org

দিন আহত হয়েছি। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ঐ আলোচনা সভায় উপস্থিত আমিসহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের একটি আদালতে দায়ের করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। আমার মত একজন নগণ্য বান্দাকে কে শামিল করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার এক নম্বর আসামি হিসেবে। বাকি আসামিরা হলেন- জনাব মকবুল আহমদ, এটিএম আজহারুল ইসলাম, শফিউল আলম প্রধান, আব্দুল লতিফ নেজামী, শেখ শওকত হোসেন নিলু, শামীম আল-মামুন, আনোয়ারুল হক প্রমুখ। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারকে উৎখাতের জন্য উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান।

এ কথা সকলেরই জানা আওয়ামী লীগ কখন-ই বিপরীত মতকে সহ্য করে না। এ মামলায় আমরা সকলেই মহামান্য হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন লাভ করে যথারীতি হাজিরা প্রদান করে আসছি। পথিমধ্যে গত ২০ জুন চট্টগাম আদালতে হাজির হলে আদালত আমার জামিন না মঞ্জুর করে আমাকে জেলহাজতে পাঠায়। মজার ব্যাপার এই মামলাবাজ সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ঢাকার রমনা থানার একটি হত্যা মামলাসহ মোট ছয়টি মামলায় শ্যোন এরেস্ট দেখিয়ে ঢাকা নিয়ে আসে। এবার শুরু হয় এ সরকারের বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার রিমান্ডের পালা। ৬ মামলার প্রতিটিতে দশ দিন করে ষাট দিন পুলিশ রিমান্ড দাবি করলেও আদালত দুই মামলায় সাতদিন মঞ্জুর করে। আর বাকি চার মামলায় আদালত রিমান্ড নামঞ্জুর করে।

অথচ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা আমাকে ছয় দিনে পরিবর্তে দশ দিন রিমান্ড খাটিয়ে নেন। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এ সরকারের আমলে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। আমার মত এই নগণ্য বান্দার কপালেও তার বিপরীত কিছু জুটলো না। বিশেষ করে ১/১১ পথ ধরে এগিয়ে চলছে মহাজোট সরকার। জরুরি সরকারের শাসন ছিল গ্রেফতার, মামলা রিমান্ডের নামে নির্যাতন, হিংসাত্মক প্রতিশোধ, আর দেশের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যাবসায়ীদের হেয় প্রতিপন্ন করার মহোৎসব। আর এখন তা চলছে শুধু বিরোধী মত ও পথের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ সকল জনসাধারণের ওপর নির্যাতন। এটাই হলো জরুরি সরকার আর মহাজোট সরকারের মধ্যে পার্থক্য। ১/১১ পর রিমান্ডে নির্যাতনের লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক নির্যাতনের বর্ণনা আমরা শুনেছিলাম প্রকাশ্য দিবালোকে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের মুখ থেকে। মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা আব্দুল জলিল, ওবায়দুল কাদের, শেখ সেলিম, মখা আলমগীর, নাসিমসহ অনেকেই তাদের উপর আইন শৃংঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন নিজ মুখে। বিএনপি ও জামায়াত নেতারাও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। এটি একটি সভ্য জাতির জন্য খুবই অপমানকর।

আওয়ামী লীগ, বিএনপির কোন ডাকসাইটে নেতাই এ নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। দেশের মানুষ মনে করেছিল দুই দলের শীর্ষ নেতারা নির্যাতিত হওয়ায়

www.amarboi.org

অন্তত রাজনৈতিক হয়রানি ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধ হবে। বরং তা বন্ধ না হয়ে অতীতের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু কেন? প্রতিপক্ষ দমনে কেউই করতে চায় না এ নীতির পরিসমাপ্তি। রিমান্ডের নামে রাজনীতিবিদদের ওপর এ বর্বর নির্যাতন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

আজ আওয়ামী লীগ বিরোধী দল দমনে বিভিন্ন বাহিনীকে যেভাবে ব্যবহার করছে। আগামীতে অন্য মতের কেউ ক্ষমতায় আসলে এ সব বন্ধ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় কি? তাহলে আমরা কি জাতি হিসেবে বর্বরতা আর হিংস্রতার প্রতিযোগিতায় এভাবেই এগুতে থাকবো?

আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অনেকেই নির্যাতনকারীদের বিচারের দাবি করেছেন। কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ নিতে গিয়ে আমরা সেই মতে পৌছাতে পারি নাই। বরং নির্যাতনকারীরা পুরস্কৃত হয়েছেন অনেকেই। ক্ষমতার যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। জেলগেট থেকে গ্রেফতার এ সরকারের নতুন আবিষ্কার। রাজনৈতিক দলের কেউই এখন জামিন পেয়ে অনায়াসে জেলগেটের বিশেষ বাহিনীর গ্রেফতার এড়াতে পারছেন না। আমি ছয়টি মামলায় জামিন নিয়ে বের হতে জেলগেটে আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে হাইকোর্টে রিট করে সেই নির্দেশনা নিয়ে দীর্ঘ চার মাস পর আমি সকলের দোয়ায় মুক্তি লাভ করি।

কিন্তু আওয়ামী লীগকে মনে রাখতে হবে ক্ষমতার পালাবদলে রিমান্ডের নামে নির্যাতন, রাজনীতিবিদদের ডাণ্ডাবেড়ি পরানো আজকে যেমনি বিরোধী দলের জন্য কষ্টকর। আগামী দিনে এ পথ আওয়ামী লীগের জন্য সুখকর নাও হতে পারে। কারণ এই সরকারেই শেষ সরকার নয়।

আওয়ামী লীগ সব সময়-ই সত্য ও সাহসী পথের কলম সৈনিক ও মিডিয়া কে তাদের প্রধান শত্রু ও আতংক মনে করে। এজন্য বাকশাল কায়েম করতে চার পত্রিকা বাদে বাকি পত্র-পত্রিকা বন্ধ করেছিল এই আওয়ামী লীগই। আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করার বর্ণনা সকলকে হতবাক করেছিল। সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী, এটিএম আজহারুল ইসলাম আর তাসনীম আলমের ওপর নির্যাতন অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। তাদের ওপর নির্যাতনের কথা পত্রিকায় পড়েছি। কিন্তু আমার মত একজন ক্ষুদ্র নাগরিকের সাথে সরকারের কতিপয় অতিউৎসাহী কর্তা ব্যক্তিরা যে অ-সৌজন্যমূলক, নির্মম, হিংসাত্মক, ও অ-মানবিক আচরণ করেছে তাতে আমার আর বুঝতে বাকি নেই আওয়ামী লীগ বিরোধী দল ও মতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর কত খড়গহস্ত! আর কত ভাবে চলতে পারে রিমান্ডের নামে এ নির্যাতন। আমার রিমান্ড আর কারাবরণের বর্ণনার জন্য আজকের এই লেখা নয়। সময় সুযোগ মত গোটা ফিরিস্তি লিখার চেষ্টা করব। মানুষ মানুষকে মৃত্যুর ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু মেরে ফেলতে পারে না। আর মৃত্যু যখন আসবে তখন পৃথিবীর কোন শক্তিও তা রুখতে পারবে না।

www.amarboi.org

মানুষের জীবন মৃত্যুর ফায়সালা জমিনে হয় না, আসমানে হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের পথে অটল ও অবিচল থাকাইতো একজন ঈমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কবির ভাষায় "কাপুরুষ মরে বারবার বীর পুরুষ মরে একবার।"

রিমান্ডের নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বর্ণনা অসম্ভব। কারণ নির্যাতনের বর্ণনা হয়ত কিছুটা প্রকাশ করা গেলেও সেই অশ্রাব্য আর অশ্লীল ভাষায় বর্ণনা দেয়াতো একেবারেই কঠিন। আদালত থেকে সুস্থ সবল অবস্থায় রিমান্ডে গিয়ে ১০ দিন পর আমার মত একজন যুবককে পুলিশের কাঁধে ভর করে আবার আদালতে আসতে হলো। রিমান্ডের প্রথম দিন গিয়ে হাজত খানায় নামাজের ইমামতি করে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে মুনাজাত করে বলেছি আল্লাহ আমাকে ধৈর্য্য, সাহস এবং হিম্মত দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের নামে কোন অজ্ঞাত স্থানের ইশারায় আমার উপর যে নির্যাতন চালানো হলো তাতে নামাজের ইমামতি তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে আর নামাজটাও পড়তে পারলাম না। বসে বসে-ই নামাজ আদায় করেছি বাকি নয়টি দিন। খাবারের মান, টয়লেট এবং রুমের নোংরা অবস্থা তার সাথে যদি হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তা যেন আবুগারিব কারাগারকেও হার মানায়। এইতো আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা!। ৯৫% মুসলমানের দেশের ইসলামের কথা বললে তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মহিলারা নেকাব পরলে আজ এখানে গ্রেফতার আর হয়রানির শিকার হতে হয় তা অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য। তা অকল্পনীয় কিন্তু বাস্তব।

আর সেই ভয়াবহ চিত্রটি ফুটে উঠেছে এফআইডিএইচ-ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের ২০১১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে। "এফআইডিএইচ-ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের ২০১১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে রিমান্ডের নামে চলছে নির্যাতন। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

মানুষের মতপ্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দল ও এর নেতাকর্মীদের আক্রমণ এবং বিচার বিভাগের হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাংবাদিকরা। অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে টিভি চ্যানেলগুলোর ওপর। ১২ দিনের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয় মাহমুদুর রহমানকে। এ সময় তার ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। তাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালানো হয় এবং নির্যাতনের ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পুলিশ এবং র‍্যাব সদস্যরা ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছেন। তাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। অব্যাহত রয়েছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। ২০১০ সালে ১২৭ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ

www.amarboi.org

পর্যন্ত বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে ৩৩ জনকে। প্রতি তিনদিনে ১টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছে বাংলাদেশে। এছাড়া মানবাধিকার কর্মী এবং এনজিও সংগঠকরাও নিরাপত্তা রাষ্ট্রিনীর হাতে নির্যাতিত হচ্ছেন বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।"

আজ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল জনগণকে যতটুকু ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে তার নিয়ামক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে সত্য প্রকাশে দুরন্ত সাহসী মিডিয়া, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্টগণ। এজন্য সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর আওয়ামী লীগ খড়গহস্ত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, দৈনিক সংগ্রামের সম্মানিত সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক আবুল আসাদ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক কামারুজ্জামান, শীর্ষ নিউজের সম্পাদক, একরাম, সোনার বাংলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসনিম আলম-এর মত সম্মানিত ব্যক্তিদের গ্রেফতার রিমান্ড আর নির্যাতন। চ্যানেল ওয়ান, বন্ধসহ সাংবাদিকগণ নির্যাতিত প্রতিনিয়ত ঘটনা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করায় ইতোমধ্যেই দৈনিক যুগান্তর, প্রথম আলোসহ অনেক পত্রিকা ও মিডিয়াকে মামলার নামে হয়রানির শিকার হচ্ছে। কিন্তু জুলুম, নির্যাতনের প্রকটতা যতই ভয়াবহ হোক, জীবন যতই সংকটাপন্ন হোক। সাহসী উচ্চারণ যেন বন্ধ না হয়। এগিয়ে যাবার পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন সত্য কথা বলা যেন বন্ধ না হয় এটাই প্রত্যাশা।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

এবার ছয় সাংবাদিককে পেটাল ছাত্রলীগ

প্রতিটি নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এখন এর সংখ্যা আরো অনেক বেশি। এই কাজে সম্পূর্নরূপে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১১ জন করে খুন হচ্ছে। এই সরকারের সময় সবচেয়ে সস্তা হলো মানুয়ের জীবন। বিশেষ করে নারী নির্যাতন বেড়েছে রেকর্ড পরিমাণ। ইভটিজিং এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি নাটোরে কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমান, ফরিদপুরে চাপা রানীসহ বেশ কয়েকজনকে জীবন দিতে হয়েছে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে অনেক ছাত্রী লজ্জা শরমে বেছে নেয় আত্মহত্যা, অনেকেই এই নির্মম নির্যাতন সইতে না পেরে ছেড়ে দেয় পড়ালেখা, অকালে ঝরে পড়ে অনেক মেধাবী মুখ। কেউ কেউ ধুঁকে ধুঁকে এই অব্যক্ত যাতনা নিয়ে বেঁচে ওঠে কোন মতে। নীরবে নিভৃতে বিসর্জন দেয় চোখের পানি। কিন্তু এর কি কোন সমাধান নেই আমাদের রাষ্ট্রের কাছে? নেই কি কোন প্রতিকার। শুধু আইন করে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে এই মরণব্যাধিই রোখা যাবে? হ্যাঁ এটি যদি ব্যাধিই হয় তাহলে এর প্রকৃত চিকিৎসা ছাড়া এর থেকে রেহাই পাওয়া কি সম্ভব? অথচ মানুষের প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের প্রায় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাই নারী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ উপনেতা, কৃষিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিলা হওয়া নারীদের অধিকার অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি নিশ্চিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ইভটিজিং শিকার হয়ে এত নারীকে জীবন দিতে হলো। এ বছরের কোন এক সময় আমাদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী নির্যাতন অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলায় এর কড়া সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন বিরোধীদলীয় নেত্রীর এমন বক্তব্য নাকি অসত্য। তিনি সেদিন এর স্বপক্ষে তথ্য উপাত্যও চেয়েছেন। আমার মনে হয় এখন আর দালিলিক প্রমাণের জন্য পত্রিকা ও চ্যানেলের সংবাদগুলোই যথেষ্ট।

তাই বেরসিক কেউ কেউ বলে থাকেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিরকুমারী হওয়ায় হয়ত ইভটিজিং বিষয়টি ভালো বুঝতেছেন না। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী ইভটিজিংয়ের সাথে জড়িত অধিকাংশেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। শুধু তাই নয় দেশের কয়েক স্থানে আসামি পুলিশের হাত থেকে ছিনতাই এর ঘটনাও সংঘটিত

www.amarboi.org

হয়েছে।

আর এবার ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করে হামলার শিকার হলেন ছয় সংবাদকর্মী। ঘটনাস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনার প্রতিবাদ করলে জসীমউদ্‌দীন হলের ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সাংবাদিকদের পিটিয়ে আহত করে। আহতরা হলেন চ্যানেল আইর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক সেফাউল হোসেন, নিউ এজের গাজী তাওহীদ, যমুনা টিভির নিজস্ব প্রতিবেদক মীর সাব্বির, এবিসি রেডিওর শাকিল হাসান, সাপ্তাহিক ২০০০-এর মনির মমতাজ ও বার্তা টোয়েন্টিফোরের হাবিবুর রহমান। আহতরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শী ও আহতরা জানান, রাত ৯টার দিকে রোকেয়া হলের এক ছাত্রী টিএসসি থেকে হলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন জসীমউদ্‌দীন হল ছাত্রলীগের কয়েক কর্মী ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে। ছাত্রী প্রতিবাদ করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উত্ত্যক্তকারীরা সটকে পড়ে। রাত ১০টার দিকে জসীমউদ্‌দীন হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী এনায়েত গ্রুপের শহিদুল ইসলাম মাহী, রোবায়েত, সুজন, সোহেল ও রুমিসহ ২০-২৫ জন টিএসসিতে লাঠিসোঁটা নিয়ে তাণ্ডব চালান। ইভটিজিংয়ের শিকার ছাত্রীর পক্ষ নেয়ায় ওই সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালান। ছয়জনকে পিটিয়ে সদলবলে চলে যায় হামলাকারীরা। ঘটনার পর টিএসসি ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সাইফুল ইসলাম খান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, "ক্যাম্পাসে এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক। অপরাধীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে।"(কালের কণ্ঠ, Mon 8 Nov 2010)

কলেজে যাওয়া-আসার পথে বখাটেরা নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। অভিভাবক বা প্রশাসনকে জানাতে গেলেও বিপত্তি। অনেকেই উল্টো মেয়েদের দোষ দেয়। ক্ষোভে-লজ্জায় আত্মহত্যা করে অনেক মেয়ে। কিন্তু এভাবে আর চলা যায় না। তাই ঠিক করেছি কারাতে শিখব। মুখ বুজে বখাটেপনা আর কত দিন সহ্য করব? এবার শুরু হবে প্রতিরোধ। কথাগুলো বলছিল কারাতে শিখতে যাওয়া টাঙ্গাইলের শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্রী তমা মণি। তার মতো অনেকেই উত্ত্যক্তকারীদের প্রতিরোধ করতে কারাতে শেখা শুরু করেছে। উত্ত্যক্তকারীদের থেকে আত্মরক্ষায় টাঙ্গাইলের স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের কারাতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। গতকাল রোববার শহরের শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কলেজে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। তানিয়া বখ্‌শ জানান, আইনে প্রতিটি নাগরিকের আত্মরক্ষার

www.amarboi.org

অধিকার রয়েছে। দণ্ডবিধির ৯৬ থেকে ১০৬ ধারায় শারীরিক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ, কাম-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য মেয়েরা কারাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে তা প্রয়োগ করতেই পারে। প্রশিক্ষণ নিতে আসা প্রথম বর্ষের ছাত্রী ইশরাত জাহান বলেছে, আমাদের নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। মাহমুদ বলেন, মেয়েদের কারাতে শেখানোর উদ্যোগটা ভালো। তবে এটা নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধে বড় পদক্ষেপ নয়। সরকারের দায়িত্ব উত্যক্তকারীদের চিহ্নিত করে আইনে সোপর্দ করা এবং নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) সাইফুল্লাহিল আজম বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যদি ১০টি করে মেয়েকেও আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো যায়। (প্রথম আলো, ৮/১১/২০১০) এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর সরকারের কী হতে পারে, প্রশাসন কত নিরুপায় হয়ে ছাত্রীদের কারাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কিন্তু খারাপ খবর হলো বখাটে ছাত্রলীগের জন্য। এবার সম্ভবত ছাত্রীদের হাত থেকে নিস্তার নেই। পাঠকবৃন্দ ঠিক একই দিন ইভটিজিং ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। (নয়া দিগন্ত ৮/১১/২০১০) সরকারের কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যেকদিন এর রোধে মিডিয়ার সামনে গরম গরম বক্তব্য দিলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা (Education is the creation of sound mind in a sound body)- অ্যারিস্টটল। শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি (Education is the capacity to feel). জন ফ্রেডারিক হারবার্ট বলেন- 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন' (Education is the development of moral character) পার্সি নান এর ভাষায়- (Education is the complete development of the individuality of child, so that he can make original contribution to human life according to the best of capacity). আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাই নিশ্চিত করতে পারে নাই।

শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুণাবলির অনুশীলন মাত্র। সক্রেটিসের মতে 'Knowledge is power by which things are done.' এ জন্য অনেকেই জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সক্রেটিসের মতো বেকন ও কমেনিয়াসও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা জীবনের বস্তুগত, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক সকল জ্ঞানকে অপরিহার্য (Sine qua non) বলে বিবেচনা করেছেন।

জ্ঞানকে নিছক 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান' হিসেবে না দেখে 'প্রকৃত জ্ঞান' (True

www.amarboi.org

knowledge) রূপে দেখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে জন্যই সক্রেটিস বলেন, 'One who had true knowledge could not be other than virtuous" (Tengja: 1990-29) সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ধারণাকে সাধারণত প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

কিন্তু আজকের আধুনিক পৃথিবী একথাই প্রমাণ করছে যে মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে ইসলামী শিক্ষা। এ জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দটিই ছিল 'ইক্‌রা'। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর। নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুবসমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার পরামর্শ তিনটি – পড়, পড় এবং পড়।'

এ জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন: Education is the harmonious development of body, mind & soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।" কোন জাতির সন্তানকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। মিসরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।'

মানুষ বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। কোন আইন দিয়ে অথবা কঠোর হাতে পশু পাখি চালানো সম্ভব কিন্তু মানুষ চালানো সম্ভব নয়। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্ত সারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় দামি

www.amarboi.org

দামি ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতি (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থবিত্তের অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না। Education does not necessary mean mare acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে আমরা স্কুল কলেজে এ কথা লিখে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন বাস্তব ফল পাচ্ছি না। মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনীয় হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull এর মতে, 'If you teach your children three R's : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R' : Religion, then you will get a fifth 'R' : Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান (Informative knowledge) যদি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়।'

অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চরিত্রবান শাসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষার কথা বলেছেন, যার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। আধুনিককালের অনেক দার্শনিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। চরিত্রের বিষয়টি মূল্যবোধযুক্ত প্রপঞ্চ হওয়ায় দেশে দেশে চরিত্র গঠনের আদর্শ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের আচরণের প্রধান দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো 'প্রবৃত্তিতাড়িত ও বর্বরতা' এবং অন্যটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতা'। তাঁর মতে শেষোক্তটি হলো নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এবং এর বিকাশ সাধন করা

www.amarboi.org

হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) মতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তিনি 'Aesthetic Presentation' শীর্ষক তাঁর গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন, 'The one and the whole work of education may be summed up in the concept-morality.' তাঁর মতে আদিম ও নিচু প্রকৃতি অবদমন এবং উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে নৈতিকতা। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাবিদ চরিত্রের ধারণা প্রদান করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন ধারণা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো দিককে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– (ক) জীবনে উচ্চ মূল্যবোধের উপলব্ধি ও চর্চা (Realization and practice of higher values in life), (খ) মনের প্রশিক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি (Training of mind or will-power), (গ) সুশৃঙ্খল সহজাত প্রবৃত্তি (discipline of instincts) এবং (ঘ) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে নৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করা (changing instinctive behaviour into moral behaviour)। পূর্বোক্ত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এসব দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মহানবী (সা) বলেছেন, "মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হল উত্তম আখলাক।" যার চরিত্র ভাল, ব্যবহার সুন্দর সে সবার প্রিয়। নবী করীম (সা) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।" আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায়ও সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিকতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সর্বত্র বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এটিকে তিনি মানুষের জন্য অশুভ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে, 'Man is essentially a spiritual being. It is this spiritual element of man which is responsible for all the great achievements in this world. (Purkait : 2001:86) এ কারণে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক শক্তিতে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার ওপর এতই জোর দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগৎ যেন কখনই মানুষ, মানবতা ও বস্তুবহির্ভূত চিরায়ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ না করতে

সে জন্য শিক্ষায় আত্মিকতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'Material progress is a good things; social and political reforms are even more valuable, both to the race and the individual;

www.amarboi.org

their final worth lies in the aid they afford to spiritual life.' (Findlay : 1968:41)

সক্রেটিস জ্ঞান আহরণের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে 'Gnothi Seautin' অর্থাৎ নিজেকে জানো (Know thyself)। তিনি বলেছেন, 'চিন্তা করো, জ্ঞান অর্জন করো এবং নিজেকে জানো'। নিজেকে জানা ব্যতীত মানবজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। নিজেকে জানার অন্যরূপই হচ্ছে শিক্ষা লাভ। প্লেটো মানুষের দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধনের প্রধানতম উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করেছেন।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষা গ্রহণকে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে S.N.O Zulfaqar Ali তাঁর "The Modern Teacher" গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'In the Quran education has been urged as a duty. It is to be noted that the holy book opens with the verse Ekra Bismee Rabbika llaji Khalaqa': Read in the name of the Lord and that the very title Quran which is derived from the .....

আলবার্ট সিজার তার Teaching of Reference of or Life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'Three kinds of progress are significant. These are progress in knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality. The last one is the most important'. তার ভাষায় 'আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্তার ও মানবতার বিকাশ সাধনের জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম লগ্নে সভ্যতা ও ভদ্রতার খোলসে উদভ্রান্ত মানবজাতি মানবিক গুণাগুণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নির্লজ্জ যৌন ব্যভিচার, পরস্পর হানাহানি, শক্তিমত্ততা, বর্বরতা ও পাশবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে বড়ই অসুস্থ, বিশৃঙ্খল ও অরাজক হয়ে উঠছে। ফলে মানবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্যাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সা) এর ওপর আল্লাহ পাক ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। শিক্ষার পূর্ণতা লাভ ঘটেছে তাঁরই হাতে। তাই ইসলামী শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্যোক্তা। আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, ফেকাহ প্রভৃতি জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে প্রযুক্তিগত চাহিদা-সম্পৃক্ত একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এ শিক্ষায়

www.amarboi.org

বিধৃত রয়েছে। এখানে কেবল আরশ আর কবরের খবরই দেয়া হয়নি; মানুষের জীবনের সমুদয় কর্মকাণ্ডের সুনিব্যস্ত সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিধান দান করা হয়েছে।

সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযোগ্য ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে সৃজনীশক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ ঘটানোই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে। শিক্ষা যদি জীবনে কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়, শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা : "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ।" প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য প্রাণীর শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমান সরকার নৈতিক শিক্ষা নির্বাসনে পাঠিয়ে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা আমদানির যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সমাজে ইভটিজিং পারিবারিক কলহ বিচ্ছেদ অসামাজিক ও অ-নৈতিক কাজ আরো বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নৈতিক শিক্ষা ছাড়া জাতির সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

● ১২ নভেম্বর ২০১০

www.amarboi.org

আমরা স্বাধীন দেশের বন্দী নাগরিক

স্বাধীনতা আমাদের গৌরবের। স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত সম্পদ। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের গৌরবের মায়া গাথা এই লাল সবুজের পতাকা। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি মহান স্বাধীনতা। ইতিহাসের বিচারে মাত্র নয় মাসের সংগ্রামের অর্জিত স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসেও বিরল। যেখানে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লাভ করতে সময় লাগে ২৬ বছর। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে চল্লিশ বছরের ওপর আন্দোলন করে ভারত অর্জন করে স্বাধীনতা। ফরাসি শক্তির বিরুদ্ধে নয় বছর ধরে লড়াই করে আলজেরিয়া পায় স্বাধীনতা। ইরেত্রিয়া রক্তাক্ত সংগ্রাম করে আজও ইথিওপিয়া থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারেনি। কাশ্মীরসহ ভারতের সাত রাজ্য অব্যাহত রেখেছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাই স্বাধীনতা আমাদের জন্য গৌরব ও অহংকারের। আমরা স্বাধীন ভূ-খণ্ড পেয়েছি সত্য, কিন্তু পায়নি তার আয়তন। আমরা স্বাধীন একটি রাষ্ট্র পেয়েছি বটে, কিন্তু পাইনি আমাদের সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার। আমরা পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেলেও এখনও নিজ দেশেই যেন বন্দী। অথচ স্বাধীনতা শব্দটির মাঝেই লুক্কায়িত প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া আর আত্মার প্রশান্তি। সেই পাওয়া অঢেল সম্পদ আর ক্ষমতার মালিকানা নয়। কিংবা আভিজাত্য আর বিলাসিতাপূর্ণ জীবনও নয়। স্বাধীনতা মানে আমার কথা বলার অধিকার, স্বাধীনতা মানে আমার জান মাল, ইজ্জত, আব্রুর নিরাপত্তা। স্বাধীনতা মানে আমার পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি। স্বাধীনতা মানে আমার ছোট একটি সংবিধান। স্বাধীনতা মানে আমার, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি। কিন্তু আজ আমাদের মানচিত্র খন্ড বিখন্ডিত। বিডিয়ারকে হত্যা করে সীমান্ত অ-রক্ষিত, মানুষের সাংবিধানিক অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত। প্রতিটি নাগরিক অধিকার নির্বাসিত। মানুষের জান মাল, ইজ্জত, আব্রুর নেই কোন নিরাপত্তা। কিন্তু কেন? আমার দেশের প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় স্বাধীনতা কোন দল বা গোষ্ঠীর করুনা না কিংবা দয়া নয়। এটি সংবিধান স্বীকৃত আমাদের প্রাপ্য অধিকার। এ অধিকার হরণের সাধ্য কার!

আমার সোনার বাংলা বৃটিশদের দু'শো বছরের গোলামি শাসন, দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতি সত্তার বিকাশ আর পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও তাদের দোসরদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি এখনো। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে

www.amarboi.org

ভারত হাঙ্গরের মত তার আসল চরিত্র-নিয়ে হানা দিচ্ছে বাংলাদেশের ওপর। এর অন্যতম কারণ আওয়ামী লীগের অতিমাত্রায় ভারতপ্রীতি। ভারতের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা অবশ্য আওয়ামী লীগের ঐ নেতারাই বেশি প্রকাশ করেন, যারা যুদ্ধ না করে মুন্সিয়ানার মত ভারত পালিয়ে লন্ডিং ছিলেন। এই জন্যে অনেক আওয়ামী লীগারদের-ই সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ভালো লাগে না, এক মন্ত্রীতো সেদিন বলেই ফেললেন "ভারত ও বাংলাদেশ চেতনায় এক ও অভিন্ন।" এর বড় প্রমাণ মিলবে ইটালীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচির "ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরি" গ্রন্থে। যিনি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন- আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ আপনার কাংখিত মিত্র হবে। ইন্দিরা গান্ধী উত্তর দিলেন- "বাংলাদেশ ও আমাদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য একতরফা বন্ধুত্ব হবে না। প্রত্যেকের ই কিছু দেবার ও নেবার থাকে, আমরা আমাদের পাওয়ার ব্যাপারে সব সময়ই সচেষ্ট।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এখানে এটি খুবই পরিষ্কার যে, ভারত নিজেদের স্বার্থেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ করেছে আওয়ামী সরকার। ক্ষমতা লাভের মুহূর্ত থেকেই তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সেই সঙ্গে খোদ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি-বাণিজ্য, চুরি-ডাকাতি, দখল, লুণ্ঠন, হত্যা, খুন, রাহাজানি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে। ফলে দেশজুড়ে সৃষ্টি হয় এক মারাত্মক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ভারতের সাথে কয়েকটি গোপন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাজোট সরকার। ভারতকে বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে বাংলাদেশের এক বৃহৎ অংশ (সিলেট অঞ্চলকে) মরুভূমিতে পরিণত করার নীল নকশা ইতোমধ্যে প্রায় চূড়ান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশকে ধর্মহীন করার প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজও সম্প্রতি শেষ করেছে সরকার। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা বিনা বিচারে হত্যার সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হিসাবেই মাসে রাজধানীতেই ৩০৫টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে খুন হয়েছেন ২৫ জন। দেশের জননিরাপত্তা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে সেটা স্বাধীনতা-পরবর্তী '৭২-৭৪ সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষমতার দাপট, সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতি ইত্যাদি সরকারের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে 'শান্তিরক্ষা'র অজুহাতে বিরোধী দলের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে, যা তাদের পুরনো ফ্যাসিবাদী ধারারই অনুসরণ। বাংলাদেশ এখন যেন পুলিশি রাষ্ট্র। রিমান্ডে নির্যাতন, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি এখন পুলিশের নিয়মিত কাজ পরিণত হয়েছে। মানুষ সুবিচারের জন্য ছুটে যায় সর্বোচ্চ

www.amarboi.org

আদালতে। কিন্তু শেষ আশ্রয়টুকুও এখন আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। গ্যাস বিদ্যুৎ পানিসহ জনদুর্ভোগ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বোগতি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নির্যাতন, বিরোধী দলের উপর দমন নিপীড়নের ও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসের ফিরিস্তি অল্প কথায় শেষ করা কঠিনই বটে। ছাত্রলীগের অত্যাচারে গোটা জাতি যখন অতিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই দিশেহারা। তিনি কখনও বলেন- ছাত্রলীগেকে ত্যাজ্য করে দিলাম, কখনও বলেন- ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। সাধারণ সম্পাদক বলছেন, ছাত্রলীগের দায় দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেবে না। যারা নিজেদের একটা ছাত্রসংগঠন চালাতে পারেন না, তারা দেশ চালাবে কিভাবে? এই প্রশ্ন-ই এখন সবার।

সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বেছে নেয় বিরোধী দলের ওপর দমন নিপীড়নের পথ। কারণ সরকার খুব ভালো করেই জানে, এ দেশে জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাদের কোন চক্রান্ত-ই সফল হবে না। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন কোন দিনই পূরণ হবে না। যার কারণে জামায়াত-শিবিরের সংঘবদ্ধ শক্তিই হয়ে ওঠে এই সরকারের সকল মাথা-ব্যথার মূল কারণ। তাছাড়া জরুরি অবস্থার সময় বিএনপি সংগঠিত করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এটি সকলেরই জানা। ফলে একটি ঠুনকো মিথ্যা ও জামিনযোগ্য মামলায় ২৯ জুন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করেছে সরকার। অন্যায়ভাবে আটককৃত নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সাংবাদিক,ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাদের রয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশের একজন বরেণ্য আলেম, তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের আমীর। দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং ক্যাবিনেটমন্ত্রী হিসেবে ৫ বছর সফলভাবে সততার সাথে দুটি মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছেন। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্‌সিরে কুরআন। তিনি দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে হাজার হাজার অন্য ধর্মাবলম্বী ইসলাম গ্রহণ করে শান্তির ছায়াতলে আসার সুযোগ পেয়ে আসছে। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ দলের সেক্রেটারি জেনারেল ছাড়াও একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক, গত ৫ বছর সৎ ও সফল মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সকলেই জাতীয় নেতা। তাঁদের সকলের বয়স ৬২-৭০ এর মধ্যে। তাঁদের মতো এমন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবীণ নেতাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো এ দেশের শুধু নয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কলঙ্কজনক ঘটনা। যাঁরা তাঁদের জীবনটাই ইসলামের জন্য নিবেদন করে দিয়েছেন, তাঁরাই কি-না ইসলামকে হেয়

www.amarboi.org

করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)! আর তাঁদেরকে নাজেহাল করার জন্য আদালতের মাধ্যমে সমন জারি করে তড়িঘড়ি গ্রেফতার করা হলো। অথচ সে মামলায় তাঁদেরকে জামিনও দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মিথ্যা মামলা তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা হলো, ৫টি মামলায় কথিত জিজ্ঞাসাবাদের নামে প্রায় ১ মাসের মত রিমান্ডে নেয়া হলো। আসলে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুভূতি নয়, জামায়াত-শিবির ও ইসলামকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দেয়া আওয়ামী লীগেরই স্বভাব। সচেতন দেশবাসী, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগেরই স্বভাব। লক্ষ্য করুন, অতিসম্প্রতি ধর্মের ওপর তারা কিভাবে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে–(ক) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রতিমন্ত্রী বলেন, "লাখ লাখ কোটি কোটি বছর পর আল্লাহ যদি আমাদের বিচার করতে পারেন তবে আমরা এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারব না কেন?" এটা কি আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাথে তার অংশীদারিত্বের দাবি নয়? (খ) সিইসি এটিএম শামসুল হুদা তো স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করেছেন এভাবে, "সেনাবাহিনী ফেরেশতা নয় যে তারা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেনাবাহিনী কেন, খোদ আল্লাহতায়ালা নেমে এলেও কিছু করতে পারবেন না।" (গ) কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী রাসূলের (সা) উম্মত সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র ধর্ম ইসলামের ওপর আঘাত হেনেছেন এভাবে, "বিএনপি কর্মীরা জিয়ার উম্মত আর জামায়াত কর্মীরা নিজামীর উম্মত। আর আমরা যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি তারা নবীজীর উম্মত।" (ঘ) পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কয়েকটি অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শুরু করা হয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রতিষ্ঠিত রীতির ব্যতিক্রম। এটা ৯৫% মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নয়? (ঙ) সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি ইমামদের অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য আর ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বেশি জিঘাংসার শিকার হয়েছে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের গঠনমূলক কার্মকাণ্ডে তারা শঙ্কিত হয়ে এর নেতা-কর্মী সর্বোপরি নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করেছে। অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার পথে প্রধান অন্তরায় বলে তারা মনে করছে জামায়াত শিবিরকে। ফলে দমন-পীড়ন, অত্যাচার-নির্যাতন এবং খুন-জখমের টার্গেটে পরিণত হয়েছে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী। এ নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না বাড়িতে থাকা মা বোনেরাও। গত বছর ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সেক্রেটারি এমবিএ'র মেধাবী ছাত্র শরীফুজ্জামান নোমানীকে হত্যা করা হয় অত্যন্ত নির্মমভাবে। ধারাল অস্ত্রের আঘাতে কেটে নেয়া

www.amarboi.org

হয় তার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল এবং উপর্যুপরি কোপে দ্বিখণ্ডিত করা হয় আল্লাহকে সিজদাকারী মাথার মস্তক। কিন্তু জঘন্য নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করা হয়। জামালপুরে হত্যা করা হয় হাফেজ রমজান আলীকে। দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া এই মেধাবী ছাত্রকে হত্যা করে চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে দিয়ে দিখণ্ডিত করে দেয় নরপশুরা। এ বছর ৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যক্কারজনক ঘটনাটি পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরকে তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উস্কানিতে পুলিশ প্রশাসন শিবির নির্মূলের অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গণগ্রেফতার আর অত্যাচারের ভয়াল থাবা বিস্তার করে শিবিরের নিরীহ মেধাবী ছাত্রদের ওপর। এই ঘটনাকে পুঁজি করে সারাদেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলে কথিত "চিরুনি অভিযান"-এর নামে। মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে লাশে পরিণত হন দুই জন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান হাফিজুর রহমান শাহীনকে। এলাকার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে যখন সবাই শোকে কাতর, সেখানে জানাযায় পর্যন্ত বাধা দেয়া হয়, কবর জিয়ারত থেকে বিরত রাখতে র‍্যাব পুলিশ দিয়ে পাহারা দেয়া হয় কবর। কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর হলে মানুষ এমনটি করতে পারে! চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক মেধাবী ছাত্রশিবির নেতা হারুনুর রশীদ কায়সারকে শাটল ট্রেন থেকে অপহরণ করে জবাই করে ফেলে দেয়া হয়। এ সকল ঘটনায় মামলা দায়ের করতে গেলে মামলা নেয়া তো দূরের কথা উল্টো কয়েক শ' মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয় আমাদের নেতা ও কর্মীদেরকে। আক্রমণ-জখম, মামলা আর জেলে ভরে চলে মানবতার বিরুদ্ধে চরম অবমাননা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটিকে ছড়িয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশে। দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নামধারী গুণ্ডাদের নির্মম আক্রমণের শিকার হন ছাত্রশিবিরের হাজার হাজার নেতা-কর্মী। অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রের শিক্ষাজীবনকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাইজুল ও ইকরামের কাছ থেকে মিথ্যা বক্তব্য আদায় করতে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়া হয় তাদেরকে। রিমান্ডের নামে নির্যাতনে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে আরও অনেককে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও কায়েম করা হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব।

মিছিল, সমাবেশ এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ গণতন্ত্রের নিরঙ্কুশ দাবিদার বর্তমান আওয়ামী সরকারের উপরোক্ত অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে

www.amarboi.org

চাইলে সরকার তার অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এমনকি খোদ নিজেরাই তা বানচালের ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে। সর্বশেষ ২৬ মার্চ ছাত্রশিবিরের স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালিতে হামলা করতেও পুলিশ দ্বিধা করেনি। পুলিশ প্রশাসনকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয় তারা। এখন যেন ছাত্রলীগের কাছে অসহায় পুলিশ। পুলিশের সামনেই মেরে আহত করে পুলিশে সোপর্দ আর কোন্ মামলায় গ্রেফতার এবং আরো কী করা যায় তার সব নির্দেশ আসে আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছ থেকে। এ কেমন দেশ! এ কেমন প্রশাসন! অথচ পুলিশের দায়িত্ব ছিল চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ইভটিজিংসহ অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ বন্ধ করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে এ সকল অন্যায়, অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ থেকে দূরে থাকছে এবং অন্যকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গড়তে চাচ্ছে মদিনার মত একটি সুন্দর সমাজ- তাদের দমন করাই প্রধান কাজ বানিয়েছে। মেসে-বাসাবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মিছিলে বাধা দান ও খুনের নেশায় আক্রমণ, চোরাগুপ্তা হামলা, অপহরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট পন্থায় ইসলামপ্রিয় শিবিরকর্মীদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক কালো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে চলেছে। এ দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের প্রাণের সম্পদ পবিত্র কুরআনে অগ্নিসংযোগ করতেও পিছপা হয়নি নরপশুরা। আল্লাহপ্রদত্ত জীবনবিধান ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য আলেমদের সুচিন্তিত মতের আলোকে রচিত বিভিন্ন ইসলামী বইপুস্তককে তথাকথিত "জিহাদী বই" বলে প্রচারণা চালায় এবং তা সংরক্ষণ করার অজুহাত এনে গ্রেফতার করা হয় ১৩-১৪ বছরের বালক থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়া বৃদ্ধদেরকেও। জেলের অন্ধকারে আটকে রেখে, রিমান্ডের নামে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে অসংখ্য মা আর বাবার চোখের পানির ধারাকে প্রবহমান রেখেছে জালেম নরপশুরা। ইসলামের ধারক ও বাহক এইসব নিরীহ যুবকদের ওপরে শাসকদলের জিঘাংসার স্বরূপ দেখে আপনিও চোখের পানি আটকে রাখতে পারবেন কি? এ সরকার ২৮ অক্টোবরের মামলা রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করলেও, শহীদের মায়েদের বিনিদ্র রজনীর চোখের পানি কি রুখতে পারবে? শীর্ষ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে সারাদেশে গ্রেফতার হয়েছে পাঁচ হাজারের অধিক নেতাকর্মী, মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে শত শত। পুলিশ মিথ্যা মামলা তৈরি করতে করতে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, তার প্রমাণ জামায়াতের ঢাকা সিটি আমীর জননেতা রফিকুল ইসলাম খান, জেলে থাকা অবস্থায় তার নামে গাড়ি পোড়ানো মামলা রুজু করা কত বড় মিথ্যাচারের প্রমাণ। অবশ্য পরে কোর্টে পুলিশ এর জন্য দারুণ লজ্জা পেয়েছে। এ কেমন গণতন্ত্র! কেমন সভ্যতা! যাঁরা নিজেদের জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন মানবতার ধর্ম ইসলামকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত

www.amarboi.org

করার প্রত্যয়ে, তাঁদের বিরুদ্ধেই যখন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কল্পিত অভিযোগে মিথ্যা মামলা হতে দেখা যায় এবং তার কারণে কারান্তরীণ হতে হয়, তখন বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ আসলে কোন দিকে এগুচ্ছে তা নিয়ে সকলেই শঙ্কিত। কথিত ওই মামলায় তাঁদের জামিন হলেও রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে আরো কয়েকটি মিথ্যা মামলা দিয়ে রিমান্ডের নামে চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে মিথ্যাচারের কল্পকাহিনী। অবশ্য আজ গোয়েবলস জীবিত থাকলে আওয়ামী লীগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতো।

সরকারের দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যাতে কেউ কোনো আওয়াজ তুলতে না পারে সেজন্য জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কারাগারে আটক রেখে জামায়াত-শিবিরকে নির্মূল করতে চায়। এভাবে একে একে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে নির্মূল করে আওয়ামী সরকার একদলীয় বাকশাল কায়েম করে বাংলাদেশকে একটি করদ রাজ্যে পরিণত করবে। সরকারের এ অভিযান শুধু জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে নয়। এ অভিযান দেশ-জাতি, গণতন্ত্র ইসলাম ও দেশপ্রেমিক সকল মানুষের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই জালেম সরকার নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বন্ধের নামে কুরআন-সুন্নাহ ও ঈমান-আক্বীদার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাই আসুন, আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদের হাত থেকে দেশ, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, ঈমান ও আক্বীদাকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলি। তাইতো ১৯৪৭ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপক ম্যাকল্লোয়েন চার্লস মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন, "ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসনের সামনে বিচার বিভাগ কখনো এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা দেখা দিয়েছে আজকের এ সময়ে। আজ আওয়ামী দুঃশাসনের এই মানব রূপী অক্টোপাসের জুলুম নির্যাতনের নিষ্পেষণে ক্ষত-বিক্ষত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। আমরা সকলেই যেন আজ সেই স্বাধীন দেশের বন্দী নাগরিক!

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

মহাজোট সরকারের
শুরুতেই যেন গলদ

পাঁচ বছর মেয়াদের একটি সরকারের ১৮২৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন খুবই কম। এই সময়ে সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ধারণ নিতান্তই কঠিন। কিন্তু আওয়ামী মহাজোট সরকারের বেলায় তার বিপরীত, কারণ মহাজোটের মহাবিজয়ের মহাচমক দেখার জন্য মহা উদগ্রীব হয়ে দেশের আমজনতা তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে আছে। দিন বদলের যত ওয়াদা তার আলোকে ১০০ দিন অনেক সময়। কারণ প্রত্যেক দিন কয়েকটি করে ওয়াদা পূরণ না করলে তাদের অনেক ওয়াদা ১৮২৫ দিন শেষে বাকি থেকে যাবে। তাই মহাজোট সরকারের ১০০ দিনের পর্যালোচনা গোটা সময়ের তুলনায় নিতান্তই কম হলেও সুবিধার দিক হলো এর জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন হবে না। আওয়ামী লীগকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, তারা প্রতিদিন অনেক কর্ম সম্পাদন করছে কিন্তু দেখার বিষয় সেগুলো সুকর্ম না অপকর্ম। ডিজিটাল কায়দায় দিন বদলের শ্লোগান দিয়ে আসা মহাজোট সরকারের চমকপ্রদ শ্লোগান অনেকটাই বারাক ওবামা সরকারের বঙ্গানুবাদ হলেও এর কারিশমা আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারিনি, এটাই আফসোসের বিষয়। আওয়ামী লীগের দিন বদলের হাওয়া ইতোমধ্যে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। আর কিছু দিনের মধ্যে সর্বত্রই পৌঁছে যাবে। এই অর্থে বে-রসিকরা বলে আওয়ামী লীগ বলে যা, করে তার বিপরীত এটাই আওয়ামী লীগের কর্ম মাপার মানদণ্ড। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া ওয়াদা যথার্থ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে অশান্তির কালো বাতাস চতুরদিকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে শিক্ষাঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন, সংসদ, সেনানিবাস, মিডিয়া, কল-কারখানা, গার্মেন্টস সেক্টর, মসজিদ-মাদ্রাসা ও নিজ দলের অভ্যন্তরে আগুন লাগাতে সক্ষম হয়েছে। বাকিগুলোতে উত্তেজনা ছড়াতে ও দিন বদলাতে উদগ্রীব মন্ত্রী এবং এমপিরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আশা ছিল আওয়ামী লীগের কিছু নতুন মুখ এবং তাদের বিরাট দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে দায়িত্বশীলপূর্ণ ভূমিকা পালনে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু না, এই ধারণাকে তারা ভুল প্রমাণিত করেছে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। কারণ কেউ না জানলেও আওয়ামী লীগ জানে এই দায়িত্ব জনগণের দেয়া নয়, দেশের মানুষ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনেনি। বরং যারা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করাই আওয়ামী লীগের ঈমানী দায়িত্ব। আর জনগণের কল্যাণে কিছু করার অর্থ

www.amarboi.org

বেঈমানী বা বিশ্বাসঘাতকতা। এই হিসাব কষেই আওয়ামী লীগ অগ্রসর হচ্ছে। তাই আওয়ামী লীগের কাছে জনগণের কোন কল্যাণ প্রত্যাশাও দুরূহ। যতটুকু পাওয়া যায় তাও করুণা ছাড়া কিছুই নয়।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে দাবি করেছেন, ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কারণেই নাকি আওয়ামী লীগের এই অবিশ্বাস্য বিজয় সম্ভব হয়েছে। মহাজোট সাথী জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলেছেন, যেহেতু এক-এগারো না হলে আওয়ামী লীগ কোনো দিনই ক্ষমতায় আসতে পারত না, কাজেই ওই বিশেষ দিনের কুশীলিবদের প্রতি আওয়ামী লীগের সব সদস্যের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে "শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দলীয়করণ ও সেশনজট মুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা এবং বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে বলা আছে।" আরো উল্লেখ আছে "ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণী ও দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সুদৃঢ় ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই উপরোক্ত কর্মসূচি ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব।" আওয়ামী লীগ ১০০ দিনে তার বিপরীত করেছে। এটি বিচারের দায়িত্ব দেশবাসীর ওপরই রইল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে বিজ্ঞানচর্চার কথা বললেও চর্চা করছে অস্ত্রের। সরকারের একশ দিনে সরকারকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে দেয় দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ।

একের পর এক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপের সংঘর্ষে সরকারকে বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সারাদেশে কয়েক শ'রও বেশি ছোট-বড় সহিংস ঘটনা ঘটেছে। একই সঙ্গে টেণ্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে খুন হয়েছে নিজ সংগঠনসহ বিরোধী সংগঠনের একাধিক ছাত্রনেতা। প্রকাশ্য দিবালোকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে রাবি শিবির সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান নোমানীকে এবং চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে হত্যা করে জামালপুরের হাফেজ রমজান আলীকে, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড জাহেলী হিংস্রতাকেও হার মানায়।

আওয়ামী লীগের পুরনো ইতিহাস এ নতুন প্রজন্ম জানলে হয়তো আঁতকে উঠবে, যা লিখলে লেখার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তারপরেও বিদেশী সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস এর এনলিগ্যাসি অব ব্লাড বই এর কিছু অংশ উল্লেখ না করে পারলাম না। তিনি তার বই এর ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছর। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, কালোবাজারি, চোরাচালান আর রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোস, রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো।

www.amarboi.org

মুজিব তার রক্ষীবাহিনী আর সশস্ত্র কর্মীদের দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে চতুর্দিকে কেবল অস্ত্র আর অস্ত্রের ঝন্-ঝনানি। সাধারণ মানুষের মাঝে করুণ নিরাপত্তাহীনতা। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর তখন যশোর ব্রিগেড কমান্ডার। তার মতে, প্রায় ৩৩ হাজার অস্ত্র এবং প্রায় ৩৮ লাখ গোলা তার অধীনস্থ ৬টি জেলা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে কেবল রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ২,০০০ অতিক্রম করে।"

'শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল ছিল অত্যন্ত বদমেজাজি। বাবার মতো সেও বাংলাদেশকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতো। তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণকে কামাল রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে মনে করতো। শেখ মুজিব হয়তো তার ছেলের কিছুকিছু কাণ্ডকীর্তি পছন্দ করতেন না- কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে বাংলার আকাশে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।"

"১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল। রাত গভীর হয়ে আসছে। শেখ কামাল তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে সিরাজ সিকদারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। হাতে তাদের স্টেনগান আর রাইফেল। ঢাকা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ সুপার মাহবুবের অধীনে এরই কাজের জন্য ওপর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিল। কামাল তা জানতো না। শিকার খোঁজের পালায় পথিমধ্যে দু'দল সামনা-সামনি হয়ে গেল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এসে একদল অন্য দলের উপর চড়াও হলো। গুলি বিনিময়ের পালায় শেখ কামালের গলায় গুলি বিদ্ধ হলো। পরবর্তীতে ডিপুটি কমিশনার শেখ মুজিবকে ঘটনা অবহিত করলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন - 'তাকে মরতে দাও'। শেখ মুজিব তারপরও দু'দিন পর্যন্ত তাঁর ছেলে, কামালকে হাসপাতালে দেখতে যাননি।"

তাই দেশের সকল পত্রপত্রিকা ও মিডিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যতই সমালোচনা করেন, ছাত্রলীগ ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আর ছাত্রলীগ বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী দুঃখ এবং ক্ষোভে সাংগঠনিক নেত্রীর পদ ছেড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী সাংগঠনিক পদ ছেড়ে মহাভুল করেছেন এবং তাতে তার নেতৃত্বের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়েছে আবারও। কারণ সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে বিগত দিনে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের দায় দায়িত্বের একটি বড় অংশ তার ওপরই বর্তায়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অযোগ্যতার যে কাজটি সবচেয়ে জঘন্য হয়েছে তা হলো মহান জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশনে দাঁড়িয়ে যখন বলেন "সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ছেলেরা ছাত্রলীগে নাম লিখিয়ে এরকম বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।" একথাটি বলে তিনি নিজের দলের ওপর অবিচার করেছেন। তিনি তার দায়িত্বের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে পারেননি। তখন দেশবাসী মনে করেছেন নেত্রীর যখন এত মাথা গরম, তাহলে তো নেত্রীর সোনার ছেলেরা কমই করছেন। উল্লেখ্য কোন অভিভাবক তার সন্তানকে ত্যাজ্য করলে সে

www.amarboi.org

যে আরো অসভ্য হয়, ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।
শিক্ষাঙ্গনে এবার ছাত্রলীগের অভিনব কায়দার সন্ত্রাস ছিল টাকার বিনিময়ে ছাত্রদের ক্লাস করতে দেয়া। বিরোধী সংগঠনের ছাত্রদের কম্পিউটার, বইপত্রসহ অন্যান্য মালামাল হল গেটে নোটিশ টাঙ্গিয়ে টেন্ডার দিয়ে তা বিক্রি করা। অধ্যক্ষের রুম দখল করে টাকার বিনিময়ে ভর্তি বাণিজ্য ও শতাধিক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা। এমনকি একজন সম্মানিত শিক্ষককে গাছের সাথে বেঁধে প্রহার করার ঘটনাও দেখলাম আমরা এই সভ্য সুশীলসমাজে। সংবাদে শুনেছি '৭২, '৯৬ এ পরীক্ষার হলে নকলের এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাইক দিয়ে বলে দেয়া হতো এখন এত নং প্রশ্নের উত্তর লিখুন যা বর্তমানে ছাত্রলীগ আবার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হুমকি প্রদান করে নকলের সুযোগ করে দিতে বাধ্য করছে। অথচ বিগত ২০০১ এর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নকলমুক্ত ছিল যা দেশবাসী পুরোপুরি অবহিত।
মহাজোট সরকারের শুরুতেই জাতীয় মহাশোক বা মহাবিপর্যয় ঘটে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রু'০৯ বিডিআর সদর দপ্তরের পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। দেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার প্রথম ধাপ ছিল এই হত্যাকাণ্ড। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়ে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দেশের সীমান্তকে অরক্ষিত রেখে যারা লাভবান হতে চায় তাদের দ্বিতীয় অপারেশনটি হল জঙ্গিবাদের জিগির তোলা। সেনাবাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বিদেশী প্রভুদের দাওয়াত দেয়া আর বিদেশের শান্তি মিশনে সেনাবাহিনীর যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের একঘরে করে ফেলা। বাণিজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ধামাচাপার এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্যোগ এখন চাপের মুখে কিছুটা ভাটা পড়েছে। পিলখানার ঘটনায় সরকারের একজন মন্ত্রী ও একজন হুইপ-এর জড়িত থাকার বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীর গ্রেফতার যখন প্রায় নিশ্চিত তখন আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ।
ফলশ্রুতিতে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে সিআইডির তলব দিয়ে মোড় ঘোরার প্রচেষ্টা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক কিনা এই পুরাতন ইস্যু নিয়েও মাঠ গরম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় সরকার। সর্বশেষ বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংসদের ঐতিহাসিক বক্তব্যে আওয়ামী লীগ আরো দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখনি সরকার বেছে নেয় হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার পথ। বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ির লিজ বাতিলের সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অঙ্গন গরম করে পিলখানার ইস্যু আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে। লাভ লোকসানের হিসাবে দেশবাসী খালেদা জিয়ার বাড়ির বিষয়ে ছি! ছি! করলেও আওয়ামী লীগ আপাতত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে ফুরসত পাচ্ছে। পাশাপাশি তদন্ত কাজ যত দীর্ঘ হবে এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক ইস্যু তখন বাজারে চলে আসবে। কালের গর্ভে হারিয়ে

www.amarboi.org

যাবে শিলখানার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। এখন দু-একটা গানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রত্যক্ষ করলেও এটিও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে কোন অজানা শক্তির ইঙ্গিতে।

দৈনন্দিন বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্ভোগে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিদ্যুৎ ও পানির জন্য রাস্তায় নেমে পড়েছে আমজনতা। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা এটিকে জনগণের নিতান্তই অবাধ্যতা মনে করছেন এবং হুংকার তুলে বলছেন "বিদ্যুৎ ও পানি নিয়ে কোন আন্দোলন সহ্য করা হবে না।" এ যেন আরেক নব্য বাকশালের গন্ধ।

একশ' দিনে সরকারকে বেশ কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা। এ মন্দার আঁচড় বাংলাদেশেও লাগছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা ফিরে আসা শুরু করেছেন। রফতানি খাতেও মন্দার প্রভাব পড়েছে। জঙ্গিবাদ খুঁজতে এবং প্রভুদের কাছে কৃত ওয়াদা দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে সরকারকে আবিষ্কার করতে হবে জঙ্গিবাদ। ফলে যত্রতত্রই জঙ্গি খোঁজা শুরু করেছে সরকার। আর এতে সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হন এফ.বি.সি.সি.আইসহ সকল রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। তারা সরকারকে পরামর্শ দেন সবখানেই জঙ্গি না খোঁজার জন্য। হায়রে কপাল অন্যের নাক কেটে যাত্রা করা আর কাকে বলে। জিহাদী বই পাওয়া গেছে বলে জঙ্গি সন্দেহে যেখানে সেখানে দাঁড়ি, টুপি ওয়ালাদের গ্রেফতার। কুরআনে অসংখ্য জিহাদের আয়াত আছে, তাহলে কি যার কাছেই কুরআন থাকবে তাকেই জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করবেন আমাদের এই সরকার। আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে নাকচ করে একে সন্ত্রাসীদের কাজ বলছেন, তখন আমাদের সরকার এটাকে উস্কে রাখার ভিন্ন কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনরা।

বিশিষ্ট কলামিস্ট মাহমুদুর রহমান লিখেছেন, ১০০ দিনের মধ্যে প্রশাসনের খোলনচ বদলে ফেলার লক্ষ্যে রেকর্ড পরিমাণ সরকারি কর্মকর্তাদের ও.এস.ডি, বদলি, এমনকি কর্মচ্যুতও করা হয়েছে। সম্প্রতি ২৩ জেলার ডিসিকে একসাথে পবিবর্তন করেছে মহাজোট সরকার।

সরকারের কট্টর সমর্থক পত্রিকা সমকাল পর্যন্ত ৭ এপ্রিল ডি.এম.পির অর্ধেক থানার ওসি গোপালগঞ্জের শিরোনামে নিম্নোক্ত সংবাদ ছাপাতে বাধ্য হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ৩৫ থানার মধ্যে ১৭টির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাড়ি গোপালগঞ্জে! এর ফলে প্রশাসনে এক প্রকার ভারসাম্যহীনতা ও অবিশ্বাস এবং বদলি ভীতি তৈরি হয়েছে।

জোট সরকারকে ধ্বংস করেছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতো কিছু গণ্ডমূর্খ অশিক্ষিত মন্ত্রীরা আর মহাজোটকে ডুবাবে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য মন্ত্রীরা। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাফার স্টেট না বুঝা এবং সৌদি থেকে ফিরে ' ৭ বছর বাংলাদেশের কোন সরকার প্রধান সৌদি বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করেননি' এমন মিথ্যা তথ্য দেয়া, ব্যারিস্টার

www.amarboi.org

শফিক আহমেদ-কওমি মাদ্রাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র, সব মিলিয়ে মিডিয়ামন্ত্রী ফারুক খান - বিডিআর হত্যাকাণ্ডে জঙ্গিরা জড়িত, প্রেস ব্রিফিং বিজ্ঞ প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ। এবার আওয়ামী লীগের ঘরে বাইরে একসাথে আগুন লাগিয়েছে। অপেক্ষাকৃত জুনিয়র নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের পর এ নিয়ে সব মহলেই প্রশ্ন ওঠে। আওয়ামী লীগের মালিক পক্ষ (তোফায়েল, আমু, রাজ্জাক, সুরঞ্জিত, জলিল) এবার ক্ষমতার বাইরে। আর ক্ষমতা বঞ্চিত জলিলতো আক্রোশের বশে বোমা ফাটালেন। ফলে অনভিজ্ঞ নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দিনবদলের সংগ্রাম কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন সে শঙ্কা এখনও দূর হয়নি।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

মুসলমানরাই কি যত সমস্যার মূল?

গত ৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় মুসলমান পরিচয় পাওয়ার পরই সামাদ ইবাদির (৫৭) গলায় চাকু ঢুকিয়ে দেয় ব্রেডলি কেন্ট স্কট (৫২) নামে এক শ্বেতাঙ্গ। উভয়ের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডায় এক পর্যায়ে ওই হামলা সংঘটিত হয়। পরে পুলিশ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলিশ জানিয়েছে, টেম্পাবে এলাকায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কথা বলছিলেন। সে সময় সামাদ ইবাদি জানান, তিনি একজন মুসলিম-আমেরিকান। এটি জানার পরই শ্বেতাঙ্গ ব্রেডলি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে জাপটে ধরেন সামাদ ইবাদিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান সামাদ ইবাদি। পকেট থেকে চাকু বের করেন ব্রেডলি। সামাদ ইবাদির গলায় চালান সে চাকু এবং রাগতকণ্ঠে বলেন, 'মুসলমানরাই হচ্ছে যত সমস্যার মূল।' রক্তাক্ত সামাদ ইবাদির আর্তচিৎকারে পুলিশ এসে অকুস্থল থেকে ব্রেডলিকে গ্রেফতার করে নিকটস্থ পিনেলাস কাউন্টি জেলে প্রেরণ করে। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। অপরদিকে সামাদ ইবাদিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাদ ইবাদির মালিকানাধীন স্যামস ফুড মার্কেটের পাশেই এহেন বর্বরতার ঘটনা সংঘটিত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পরদিন শনিবার মাত্র ১৫ হাজার ডলার বন্ডে জামিন পান ব্রেডলি। মূলত মুসলিম পরিচয়ই কাল হলো সামাদ ইবাদির (খবর এনা,)

আমি জানি না এই খবরটি বিশ্বের কত % মানুষের জানার সুযোগ হয়েছে। অথচ এমন জঘন্য ঘটনা যদি কোন মুসলমান কর্তৃক সংঘটিত হতো তাহলে পশ্চিমা মিডিয়া সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে তুলতো এই বলে মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি, আদিম বর্বর আরোও কত কী বিশেষণে বিশেষিত করত তার ইয়ত্তা নেই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজকের উম্মাদনার কারণ পৃথিবীর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তির পর পশ্চিমা মিডিয়া, গবেষক, চিন্তাবিদ ও নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলোর মুখে মুখে সর্বদা একই আলোচনা শুরু হয়, কমিউনিজমের পর পশ্চিমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ (Political Islam) পলিটিক্যাল ইসলাম। পশ্চিমাদের বুদ্ধিগুরু হিসেবে খ্যাত স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস্' 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বটি মৌলিকভাবে বার্নার্ড লুইস (Bernerd Lewis) এর আবিষ্কার এই তত্ত্বটির ফলে পশ্চিমা গবেষক ও চিন্তাবিদদের মন-মস্তিষ্কে এ কথা ছেয়ে গেছে, ইসলাম ও পশ্চিমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। আফগানিস্তান ইরাক ও মধ্যপাচ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমণ, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের

www.amarboi.org

ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে চলছে। পশ্চিমাদের আগামী দিনের সকল রণপ্রস্তুতি এখন এরই আলোকে। অথচ যারা সবচেয়ে বেশি মানবাধিকারের কথা বলে পৃথিবীতে তাদের দ্বারাই আজ মানবাধিকার বেশি লজ্জিত হচ্ছে।

কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকার স্বার্থের ক্রীড়ানকরা জনরোষের মুখে আর কোনভাবেই টিকতে পারছে না মিশর, তিউনেশিয়া, লিবিয়া তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তারই ধারাবাহিকতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কবিষয়ক যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক. আমেরিকা এন্ড পলিটিক্যাল ইসলাম (America and Political Islam), লেখক গ্যারজেস দুই. পলিটিক্যাল ইসলাম এন্ড দি ইউনাইটেড স্টেট (Political Islam and the United State), লেখক পিন্টো। বিশেষ করে আমেরিকার এগারই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইসলামে জিহাদের অর্থকে যুগপৎভাবে ধর্মযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বর্ণনা করে আসছে।

বিশ্ব জায়নবাদীগোষ্ঠী এই তত্ত্বকে মিডিয়ার নিকট অর্পণ করেছে। মিডিয়া বিভিন্ন ভাবে সিনেমা, ফিল্ম, নভেল, নাটক, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের মন-মস্তিষ্কে এ কথা মজবুতভাবে ঢুকিয়ে দেবার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছে যে, কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্যের শত্রুতার গতিপথ এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নয়া ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। আর সবচেয়ে জঘন্য ঘোষণাটি দিয়েছে মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি, বিশ্বের ওপর মার্কিন ব্যবস্থা তথা ইহুদি ব্যবস্থার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোনো জিনিস মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, আর না আমরা কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে আপস করতে প্রস্তুত। বিশেষ করে অনৈক্য, অনিষ্ট ও ফিতনা-ফাসাদের আন্তর্জাতিক উৎস তথা জাতিপূজা দেশপূজা, ইসলামী মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব কোনো মূল্যেই বরদাশত করা হবে না।

মূলত আমেরিকার মাথার ওপর অস্পষ্ট ভীতির মতো ঝুলে আছে মৌলবাদ নামের ধারণাটি। আর এমনটাই প্রতিধ্বনি করল নিউইয়র্ক টাইমসের 'উইক ইন রিভিউ' এর সংখ্যায় শিরোনাম ছিলো : 'লাল হুমকি শেষ : কিন্তু দোরগোড়ায় ইসলাম'। সেখানে লেখা হয়, ইসলামী বিশ্বের প্রায় সবখানে ক্ষমাহীন ও অপরিবর্তনীয় মৌলবাদ জনপ্রিয় আবেগে পরিণত হয়েছে। তা পশ্চিমাবিশ্বকে বেকায়দা ফেলেছে, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ইসলাম ধর্মের মত্ত আবেগ এক হয়েছে ভয়ঙ্কর ফলাফল সৃষ্টির জন্য।

'আমেরিকার কলেজ, নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য জায়গায় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন 'মুসলিম' শব্দটি শুনে ওদের মধ্যে কী চিন্তা জাগে। অনিবার্যভাবে প্রায় একই জবাব মিলবে: দাড়িঅলা, অস্ত্রধারী, উন্মত্ত সন্ত্রাসী–

www.amarboi.org

তাদের এক নম্বর শত্রু আমেরিকাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ক্যারাবেল উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে, এবিসির মর্যাদাময় ২০-২০ সংবাদ প্রোগ্রামও 'অনেক খণ্ড প্রকাশ করেছে। ওগুলোর আলোচনায় এ কথাই বলা হয় যে, ইসলাম আল্লাহর পথে নিবেদিত যোদ্ধাদের নিয়ে জিহাদে রত এক ধর্ম। বিশ্বব্যাপী মুসলিমসন্ত্রাসীদের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ফ্রন্টলাইন।' ক্যারাবের হয়তো ইঙ্গিত করেছেন জিহাদের ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এমারসন কর্তৃক নির্মিত পিবিএস ফিল্ম জিহাদ ইন আমেরিকা'র কথা। এমনকি সেক্রেড রেজ বা ইন দি নেম অব গড জাতীয় উসকানিধর্মী শিরোনামের বিনোদনমূলক বইগুলোর কথাও হয়তো নির্দেশ করে থাকবেন : এসব বই ইসলাম ও বিপজ্জনক অসহিষ্ণুতার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও অনিবার্য হিসেবে দেখায়। তাছাড়া 'মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক প্রতিবেদনের সাথে সচরাচর একটি মসজিদ বা একদল নামাজরত মানুষের ছবি থাকবেই। আর এর সবচেয়ে জঘন্য চেহারায় হাজির হন লুইস তার 'দি রুটস অব মুসলিম রেইজ' এ। নামটাই ইঙ্গিতপূর্ণ। ঐ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছে পাগড়ি মাথায়, অবশ্যই ইসলামী একটা মুখ, তীব্র ভ্রূকুটি সহকারে পাঠকের দিকে তাকিয়ে। তার চোখের তারায় আমেরিকার পতাকা, ভঙ্গিতে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ। 'দি রুটস অব ইসলামী রেইজে গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। এটি মানবীয় জ্ঞান-বিচ্যুত তর্কের মত ঐতিহাসিক সত্য নেই এতে।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে ইকোনমিস্ট পত্রিকা তার প্রথম পাতায় ইসলামকে টার্গেট বানিয়ে একটি কার্টুন ছেপেছে, যাতে এক আরব ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে একটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একই তারিখে সাপ্তাহিক টাইম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে, গোটা বিশ্বকে ইসলামের বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। পত্রিকাটি তার কভার পৃষ্ঠায় মসজিদের মিনারার ছবি ছেপেছে, যার পাশে এক ব্যক্তি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিজ্ঞতার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথমবার হামলার নাটক মঞ্চস্থ করার পর হলিউড 'প্রকৃত মিথ্যা' নামে একটি সিনেমা নির্মাণ করে, যার মূল কথা ছিল, আমেরিকায় একটি গোপন আরব মিলিশিয়া সক্রিয় রয়েছে। যাদের শ্লোগান 'মুসলমানদের স্বাধীনতা'। এই মিলিশিয়া আমেরিকায় বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনার আওতায় তারা আমেরিকার বিমান অপহরণ করে নিউইয়র্কে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলার জন্য আকাশে উড্ডয়ন করেছে। ইতোমধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক অফিসার ও তার স্ত্রী তাদের আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যান। তারা উভয়ে সন্ত্রাসীদের এই হামলা ব্যর্থ করে দেন। এভাবে তারা নিউইয়র্ককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান অপহরণ' নামে দ্বিতীয় আরেকটি ফিল্মে বলা হয়েছে,

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্র দাগেস্তানের কিছু লোক দীর্ঘ দিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। সেই ষড়যন্ত্রের আওতায় তারা বুশকে হত্যার জন্য তাঁর বিমান অপহরণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী রুশ ও পশ্চিমাপন্থী দেশগুলোকে উসকে দেয়া এবং ভারতকে এশিয়ার সুপার পাওয়ার হিসেবে সামনে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা, যাতে এশিয়ার ইসলামী দেশগুলো এবং সেখানকার সক্রিয় ইসলামী সংগঠনগুলোকে নির্মূল করার পরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের বিরাট চক্রান্ত আর ধর্মবিমুখ পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করতে মহা আয়োজনে চলছে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা। তারই বাতাস বইছে আজ পুরোধমে বাংলাদেশে। পশ্চিমাদের দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০ হাজার এরও বেশি বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। তাহলে দেখা যায়, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যদি কোন মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সাথে গির্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত বাদে পুরো শরীর ঢাকা। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোন মুসলমান দাড়ি রাখে, তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাড়ি রাখে, তাতে কোন সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। কানাডিয়ান একজন শিখ কোর্টে মামলা করেছেন এ কারণে যে, কানাডিয়ান আর্মিতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং তিনি মামলায় জিতেছিলেন। আর যদি কোন মুসলমান দাড়ি রাখেন মানুষ তখন অন্য কিছু ভাবে। দাড়ি কী ক্ষতি করতে পারে। একটা টুপি কী ক্ষতি করতে পারে? সিনেমা নাটকে এখনও সবচেয়ে খারাপ অভিনয়টির দাড়ি ও টুপি পরেই করানো হয়। যাতে নতুন প্রজন্ম মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণাটি নিয়েই সমাজে বেড়ে ওঠে। আর আমাদের দেশের হুমায়ূন আহমেদ সাহেবদেরতো ইসলামকে খোঁচা না মারতে পারলে নাটকই হালাল হয় না এমন এক অবস্থা এখানে।

তাছাড়া পশ্চিমারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামের পুনর্জাগরণ ঠেকানোর পথ ঠিক করে নিয়েছে, তার জন্য দরকার আশঙ্কামুক্ত ইসলাম আর রাষ্ট্রক্ষমতামুক্ত মুসলমান। এতে মুসলমানদের সংখ্যা যদি বর্তমানের চাইতে দ্বিগুণ হয় তাতেও কোন আশঙ্কা নেই। যতটুকু সমস্যা আর উদ্বিগ্নতা ইরান, আলজেরিয়া, আর তুরস্কের মত মুসলিম উম্মিত রাষ্ট্রকে নিয়ে। এই ফলাফল নিশ্চিত করতে পশ্চিমাদের আবিষ্কার Political Islam– বা 'নিয়ন্ত্রিত ইসলাম'। আসল বা নির্যাস ছাড়া ইসলাম। রাজনীতিমুক্ত ইসলাম। জিহাদ, সংগ্রাম, বিপ্লব, চেতনাসত্তা ছাড়া ইসলাম। আর যে 'পলিটিক্যাল ইসলাম' ক্ষমতার বৃত্তকে ঘিরে ফেলে তাই

www.amarboi.org

হলো 'জিহাদ' তাই 'জিহাদমুক্ত ইসলাম' চাই, এটি নামধারী মুসলমানদের জন্যও কোন অসুবিধার নয়, বরং সুবিধার। এখানে পশ্চিমাদের সুবিধার আয়তন অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। জিহাদমুক্ত পৃথিবীই আজ পশ্চিমাদের একমাত্র কাম্য। কারণ জিহাদের সিঁড়ি বেয়েই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি মুসলমানদের জিহাদের চেতনাকে কালো আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় তাহলেই সকল প্রচেষ্টা গুড়ে বালি। মুসলমানরা হবে অনেকটা দাঁতবিহীন ব্যাঘ্র।

পশ্চিমারা আজ মুসলমানদের কোন তৎপরতাকে এতটুকু ক্ষতিকর মনে করে না যতটুকু সমস্যা হিসেবে দেখে জিহাদকে। তাদের নিকট ইসলামী নেতৃত্বের পরিচালনায় ও ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া অনেক বেশি বেদনার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমাদের পরিকল্পনা অর্থবিত্তে পরিচালিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা বাংলাদেশেও ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় যথেষ্ট পারঙ্গম। ইসলামী দল ও নেতৃত্বের চরিত্র হননে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা এখন পশ্চিমাদের যোগ্য উত্তরসূরি। ইসলামের জিহাদের বিধানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের আরেকটি জিহাদ হলো মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠীকে চিত্রিত করা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, পশ্চাৎপদতা, জঙ্গিবাদ, নাশকতাকারী মানবতাবিরোধী, সেকেলে অনুন্নত ও অ-আধুনিক বলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালানো। অবস্থা দেখে মনে হয় সারা পৃথিবীর জন্য মুসলমানরাই যেন মূল সমস্যা।

● সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

www.amarboi.org

ঢাবি ভিসি মহোদয় পিতার মর্যাদা

ভূলুণ্ঠিত করলেন!

গত ২৩ মে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় নিউজের শিরোনাম "জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে ঢাবির শামসুন্নাহার হল থেকে রাতে ৯ ছাত্রীকে আটক করেছে ছাত্রলীগ।" খবরটি দেখে একটু আঁতকে উঠলাম এই জন্য আরো জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগের সেই পুরনো নাটক মঞ্চস্থ করছে ঢাবি প্রশাসন ও ছাত্রলীগের যৌথ প্রযোজনায়। অবশ্য এ জাতীয় মিথ্যাচার এখন একেবারে-ই সেকেলে। পাঠকবৃন্দ আসুন এবার পুরনো সেই নাটক আবার নতুন করে উপভোগ করি। আজকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন-ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর এবং ভিসি মহোদয় নিজেই।

নিউজে বলা হয় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে তল্লাশি করে বিভিন্ন বিভাগের নয় ছাত্রীকে আটক করেছে ছাত্রলীগ ও প্রশাসন। হলের মাঠ, রুমে রুমে তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। তাদের আটকের পর তথ্য-প্রমাণ খুঁজতে রাত ১২টা পর্যন্ত রুমে রুমে এ তল্লাশি চলে। আটককৃতরা বিভিন্ন ইসলামী ও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছে প্রশাসন ও ছাত্রলীগ। রাত একটায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছাত্রীরা আটক অবস্থায়ই ছিলেন।" আমি মনে করি আইন শৃংঙ্খলা ঠিক রাখতে যে কোন সময় হলে তল্লাশি করার রাইট আছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। কিন্তু ছাত্রলীগ আইনের কোন ধারা মতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে এ অভিযানে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করলো? তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাহলে আমরা কি ধরে নেব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালনা করছে ছাত্রলীগ? অথবা ছাত্রলীগের কাছে ঢাবি প্রশাসন অসহায় কিংবা স্বেচ্ছায় নির্বিকার। তাছাড়া আটককৃতদের সম্পর্কে ছাত্রলীগ ও প্রশাসনের কাছ থেকে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ দাবি করেছে, আটককৃতরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মী। প্রক্টর বলেছেন, তারা কোনো অপৎপরতার সঙ্গে জড়িত কিনা খতিয়ে দেখছি। আর ভিসি বলেছেন, হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ বা তথ্য প্রমাণ রাত ১টা পর্যন্ত পায়নি প্রশাসন। তাহলে কোন বক্তব্যটি সঠিক? তাহলে কি ছাত্রলীগের বক্তব্যেই সঠিক? ছাত্রলীগ দাবি করেছে, আটককৃতরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মী। আমার জানা মতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন সহযোগী সংগঠন নেই। যদি ধরেও

www.amarboi.org

নেই আটককৃতরা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মী। তাহলে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা কি কোন নিষিদ্ধ সংগঠন?। Legal Right আইনগত অধিকার হলো সেই স্বার্থ যা আইনের নীতিসমূহ দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। যেমন কথা বলার আধিকার, দল করার অধিকার, চলা-ফেরার অধিকার, যার মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার নির্বিঘ্নে করার অধিকার আমাদের সংবিধান স্বীকৃত। ঢাবি প্রশাসন কি এই অধিকার স্বীকার করেন না? তাহলে ঢাবিতে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা কাজ করতে পারবে না কেন?

সম্মানিত পাঠক, নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন-ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর এবং ভিসি মহোদয় নিজেই কিন্তু রিহার্সেল ভালো না করতে পারায় তিনজনের কথার খুব অসঙ্গতি বেমানান দারুণ বেমানান দেখাচ্ছে না?

ভিসি বলেছেন, "হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেছে।" মাননীয় ভিসি মহোদয়ের কাছে জিজ্ঞাস্য স্বপ্ন যোগে পাওয়া রিপোর্টে হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার তথ্য আপনি পেয়েছেন? মাননীয় ভিসি সাহেব আপনিতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক, পিতার সমতুল্য। কিন্তু আপনাদের মতো ভিসি মহোদয়েরা দলীয় আনুগত্য করতে গিয়ে পিতার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করেন না। এটা এ জাতির জন্য কলঙ্কের বেদনার ও লজ্জার। মাননীয় ভিসি মহোদয় নিজেকে একটু আওয়ামী বলয়ের বাহিরে ভাবতে শিখুন। অন্তত : ভিসির চেয়ারে বসাকালীন সময়টুকু হলেও। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী আপনার নিকট আমানত। আপনি শুধু কি ছাত্রলীগের ভিসি। আপনার প্রশাসন কিভাবে এই সৎ চরিত্রবান মেয়ে গুলোকে সারা রাত আটক করে রেখেছে। জানা গেছে ঐ মেয়েগুলোর প্রত্যেকেই তাদের ডিপার্টমেন্টে ভালো রেজাল্টের অধিকারী। তাহলে ৯০% মুসলমানের দেশেও এই মেয়েদের বোরকা পরা-ই কি একমাত্র অপরাধ। ধর্ম-কর্ম পালনে এটাই কি শেখ হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উত্তম নমুনা।

ভিসি সাহেব আপনি আসলে কেমন অভিভাবক বলুনতো?। বিশেষ করে ছাত্রীরাতো আপনার মেয়ে সমতুল্য। ছিঃ ছিঃ ভিসি মহোদয় আপনি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হননি? যে মেয়েগুলোকে আপনি ছাত্রলীগের কথামত রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে গ্রেফতার করে সিট বাতিল করে অপমান করে বের করে দিলেন। এদের একজন যদি আপনার মেয়ে হতো। নিজেকে কিছুসময়ের জন্য ভিসির পদ থেকে আলাদা করে একজন মেয়ের পিতা হিসেবে ভাবুন। গভীর রাতে আপনার মেয়েকে এভাবে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করলে আপনার কেমন লাগতো মাননীয় ভিসি মহোদয় ? তাহলে বুঝতে পারবেন এই মেয়েগুলোর বাবা-মা কত উদ্ভিগ্ন সময় কাটাচ্ছে। এ জাতির জন্য দুঃখজনক বিষয় আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েও নিজেদেরকে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে চিন্তা করতে পারলেন না।

www.amarboi.org

ছাত্রলীগ হল শাখার নেত্রী নুসরাত জানান, নয়জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তারা হল মাঠে বসে বৈঠক করছিলো। এ অবস্থায় তাদের আটক করার চেষ্টা করলে একজন ছাড়া সবাই পালিয়ে যায়। পরে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বাকিদের আটক করা হয়। রাত সোয়া ১২টায় প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম খান বলেন, দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা কোনো জঙ্গি বা অপতৎরতার সঙ্গে জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে আরও ঘন্টা দুয়েক সময় লাগবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।" আমাদের ভিসি এবং প্রক্টর সাহেব মনে হয় ঢাবিতে ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে-ই কাজ করছেন। অবশ্য না করেও বা উপায় কি চেয়ার ঠিক রাখতে হলে ছাত্রলীগের আনুগত্য শিরোধার্য। কারণ যারা পেপার-পত্রিকা আর নিউজ দেখেন রাবি, চবি, ইবিসহ সারা দেশে ছাত্রলীগের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিতের খবর। তারা প্রত্যেকের-ই আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের আজ্ঞাবহ হওয়ার বিকল্প আছে কি? ছাত্রলীগ হল শাখার নেত্রী নুসরাত বলেন- আটককৃতরা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তারা হল মাঠে বসে বৈঠক করছিলো। এখন প্রশ্ন হলো নিষিদ্ধ-ই না হয়, তাহলে বৈঠক করলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা অন্য জায়গায়। কারণ ছাত্রলীগের রাজনীতি আজ সকলের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। বিশেষ করে ছাত্রলীগ এখন হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, সিট দখল, হল দখল ও অস্ত্রবাজির আর এক নাম ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ মানেই ভয়ঙ্কর কোন সন্ত্রাসী। টাকার জন্য হেন কাজ নেই তারা করতে পারে না। এটি আমাদের জাতীয় দুর্যোগের চেয়ে অনেক ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর। ছাত্রলীগের ইডেন কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, টঙ্গী কলেজের নারী কর্মীদের যৌন কেলেংকারির ঘটনা গোটা জাতিকে ভাবিয়ে তুলেছে, এরা কত জঘন্য ও চরিত্রহীন।

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি। শুধু ছাত্রলীগের হাতেই নিহত হয়েছে ১৯ জন মেধাবী ছাত্র। বন্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন। উদ্বিগ্ন হচ্ছেন অভিভাবকবৃন্দ। সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে ছাত্রলীগের ইভটিজিং। কিন্তু এসবই আওয়ামী লীগের কাছে কামারের দোকানে কুরআন তেলাওয়াত করার মত কথায় বলে চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী আর বর্তমান সরকারের সময়ে সবচেয়ে আলোচনা আর সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী ছেড়েছেন ছাত্রলীগের দলীয় অভিভাবকত্বের পদ। দেশের ৫ জন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী লিখিতভাবে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগকে। পত্রিকার অসংখ্য সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে শুধু ছাত্রলীগকে নিয়ে। কলাম আর নিউজের কথা বাদই দিলাম। ছাত্রলীগকে নিয়ে আপন পরিকল্পনার কথা একদিন মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল আওয়ামী লীগের এক

www.amarboi.org

সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের মুখ থেকে। তিনি বললেন, ছাত্রলীগ নিজেরা এত মারামারি না করে, ছাত্রলীগ এই শক্তি সামর্থ্য বিরোধী দলকে দমনে ব্যবহার করে। মন্ত্রীর মিডিয়ার সামনে এমন বক্তব্য থেকে বুঝতে আর বাকি থাকল না এই বেপরোয়া ও অ-নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগ আসলে একশত ভাগ আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণই পরিচালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মান অভিমান এবং দলীয় নেতাদের সতর্কবাণী, ও সমালোচনাপূর্ণ বক্তব্য "আই ওয়াশ" ছাড়া অন্য কিছু নয়, এটি এখন আর বুঝতে বাকি নেই দেশবাসীর। আওয়ামী লীগের টার্গেট বেপরোয়া ছাত্রলীগকে দিয়ে বিরোধী দল এবং বিরোধী ছাত্রসংগঠনকে ঠেঙ্গানো। যদিও অনেক জায়গায় ছাত্রলীগের ঠেঙ্গানোর শিকার স্বয়ং নিজেরাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আগামী নির্বাচনে ছাত্রলীগের এসকল অপকর্মের বোঝাসহ তরী কিনারায় তুলতে পারবেন তো? মানুষের প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের প্রায় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাই নারী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ উপনেতা, কৃষিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিলা হওয়ায় নারীদের অধিকার অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি নিশ্চিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা না, পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুখে নারীনীতির কথা বলেন, আর গভীর রাতে নিরপরাধী ছাত্রীদের গ্রেফতার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আপনার সোনার চাঁদ ছাত্রলীগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ নাটক বন্ধ হবে কবে?।

● দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.amarboi.org

জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের
কলামের ওপর কিছু কথা

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের লেখার আমি নিয়মিত একজন পাঠক। ১/১১ জরুরি সরকারের সময় যে কয়জন সাহসিকতার সাথে কথা বলেছিলেন তার মধ্যে জনাব ফরহাদ মজহার অন্যতম। তাঁর সাহসী উচ্চারণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও দেশপ্রেমিক সংগ্রামী জনতার অনেকের -ই। বর্তমান সময়ে "ট্যাক অব দ্যা কান্ট্রি" সংবিধান সংশোধনের বিতর্ক। এই নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল প্রতিদিন-ই নতুন নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। আর এমনি এক সময়ে গত ৮মে'১১ তারিখে বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান মুখপত্র হিসেবে খ্যাত দৈনিক আমার দেশ, পত্রিকায় 'সংবিধান' : ছেঁড়া ত্যানা রিফু করার কুতর্ক' শিরোনামে জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের নাতিদীর্ঘ একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি আগাগোড়া পড়লাম। প্রথম থেকে শুরু শেষের দিকে যেতে তিনি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যা আমার মতো হয়তো অনেকেরই খটকা তৈরি করেছে। এজন্য তাঁর লেখাটি আংশিক প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁর এই গোটা লেখাটির প্রশংসা করতে পারলে ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগতো। আমি আবারো বলছি আমি জনাব মজহার সাহেবের লেখার পাল্টা জবাব হিসেবে নয় বরং একজন ক্ষুদ্র পাঠক হিসেবে যে প্রশ্নগুলো আমার মনে খটকা সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারে কিছু কথা। কারণ যা সত্য ইতিহাস তাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যাতে করে পাঠক মনে কোন ভুল বোঝাবুঝি তৈরি না হয় সেই চিন্তা থেকেই এই সামান্য প্রয়াস। তাছাড়া একজন মুসলিম তরুণ হিসেবে আমি যে শাশ্বত বিধানের অনুসারী জনাব ফরহাদ মজহার সাহেবের লেখার পর সেই মৌলিক জায়গা থেকে কিছু লেখা দায়িত্ব মনে করছি। যেমন জনাব ফরহাদ মজহার সাহেব লিখেছেন-

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাহলে আলাদা করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে রাখার কারণ কী? এটা বাড়তি। এর একমাত্র কারণ ধর্মের প্রতি ভীতি, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিরোধিতা ও ইসলাম বিদ্বেষ। এরই প্রতিক্রিয়ায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানে ঢুকে পড়েছে এবং এখন স্থায়ী আসন চাইছে। যদি সেটা সামরিক শাসনের হাত ধরে ঢুকেছে বলে দাবি করা হয় তাহলে বিপুল ভোটে বিজয়ী মহাজোট সরকার তা বহাল রাখতে চাইছে কেন? যদি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে চায় তাহলে

www.amarboi.org

ধর্মভীতি বা ইসলাম বিদ্বেষ যেমন বাদ দিতে হবে, তেমনি সংবিধানকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংবিধানে পরিণত করার বিপদ সম্পর্কেও জনগণকে বোঝাতে হবে।"

উলে-খ্য, এখানে যদি "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" এটি কতটুকু যৌক্তিক কারণ গণতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীর মেজরিটি মানুষের মতকে ক্ষমতায়নের একটি পদ্ধতি। এই মাধ্যমকে অবলম্বন করে পৃথিবীর মজলুম মানবতার এখনো তাদের মুক্তির প্রহর গুনছে। সেটির সাথে যদি চার্চ ও রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের যে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছে তাকে গুলিয়ে ফেলা হয় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কখনও গণতান্ত্রিক নয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পৃথিবীতে একটি নিপীড়নমূলক পদ্ধতি হিসেবে এখন প্রতিষ্ঠিত। এটিকে এখন গোসল করিয়ে গণতন্ত্রে লেবাস পরিয়ে দিলে গণতন্ত্র কলুষিত হবে। আমরা যদি ধরেও নেই "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" তাহলে পৃথিবীর যে সব রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করে তাদেরকে আমরা কোন রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করবো? যেমন- ইরান, মালেয়েশিয়া। এবার আমরা যারা "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" বলে মনে করি ইতিহাসের পাতা থেকে Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার কলুষিত অবয়বটি দেখার চেষ্টা করি। তাহলে স্পষ্ট বুঝা যাবে ধর্মনিরপেক্ষতা কতটুকু একপেশে ও ধর্মবিদ্বেষী।

"র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not pertaining toor connceted with religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞা ও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

তাহলে বাংলাদেশের আমরা মানুষ কি কোনো ধর্মের অনুসারী নই? কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নই? আমরা কি সত্যিই আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী? না! বাংলাদেশের মানুষ এর কোনটিই নয়।

মূলত চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব,

www.amarboi.org

জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসী বিপ্লব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

Oxford Dictionary-তে Secularism means the doctrine that morality should by based sorely of regard to the welbeing of mankind in the present life be exclusion of all consideration draw from belief in good or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ-এর মতে "The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or interfere with religion"

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করে না। বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যানধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করে না মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের আধুনিক যুগে উত্তরণকাল সেকুলার শব্দের অর্থ একটু একটু করে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সাহিত্য, শিল্প ইতিহাস, সংগীত প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হলে সেকুলার অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মে সেবায় নিযুক্ত নয়, এমন, ধর্ম বিষয়ে প্রাসংগিক নয়। ঠিক যেমন সেকুলার শিক্ষা মানে ধর্ম শিক্ষা নয় এমন শিক্ষা।

সেকুলারিজম আদর্শ ইসলামের তৌহিদের কিংবা অন্যান্য ধর্মের মৌল চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ প্রেক্ষিতেই সেকুলারিজমে মানুষের জ্ঞানকেও ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ত করার কথা বলা হয়। শেষ পর্যন্ত সেকুলারিজমের লক্ষ্য হলো ধর্ম বা প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান থেকে বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা। এখানে একজন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতের দেয়া সেকুলারিজমের সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

www.amarboi.org

The deliverance of man first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language.. The loosing of itself, the dispelling of all closed world views, the breaking of all troy, the discovery by man that he has been lift with the world on what be does with it..., (It is) man turning his at attention away from worlds beyond and toward this world and this time (The secular City Harvey Cox)

সেকুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয় একটি ধর্মহীনতা। কেউ কেউ এতদূর না গেলেও এটি মানে যে সেকুলারিজমে নাস্তিক্যের বীজ লুকিয়ে আছে। আর এটাতো সত্য রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে ইউরোপীয় মানবতন্ত্রী দর্শনের বিকাশ ঘটেছে তা কিন্তু সেকুলারিজমের পথ ধরে একে একে নাস্তিক্যের কেন্দ্রে এসে ঠেকেছে, যা আসলে ঈশ্বর ও ধর্মচিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউরোপে সেকুলারিজম বিকশিত হয়েছিল তা মুসলিম দুনিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট সেকুলারিজমের চেহারা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। আগেই বলেছি সেখানকার সেকুলারিজমের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আছে এবং বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে সেই সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়েছিল। ইউরোপের নিপীড়ক চার্চকে রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করার জন্য সেদিন সেকুলারিজমের দরকার ছিল। অন্যদিকে মুসলিম দুনিয়ায় এ চিন্তা-চেতনা ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের আগ্রাসনবাদী সংস্কৃতির কর্তৃক এক আরোপিত ধারণা। মুসলিম দুনিয়ার ক্ষেত্রে তা তেমন কোন কাজে লাগেনি বা লাগসই উন্নয়নের মডেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়নি, এমনকি এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনেও সেকুলারিজম প্রাসঙ্গিক ধারণা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম দুনিয়ায় সেকুলারিজম পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীও এলিট শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার বাহন হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপ খ্রিস্ট ধর্মের চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠান ইসলামের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মুসলিম দুনিয়ায় চার্চের তুল্য কোন প্রতিষ্ঠানও নিপীড়কের ভূমিকায় কখানোই অবতীর্ণ হয়নি। চার্চ কর্তৃপক্ষ যেমন করে সেদিনকার ইউরোপে সব রকমের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ক্রিয়াকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছিল এর তুলনীয় ঘটনাও ইসলামের নেই। উল্টো ইসলামে ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন সেই আলেম ওলামা, মুফতী মুদাররেসরা মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময় অত্যাচারী রাজা বাদশাহদের বিরুদ্ধে খুতবা দিয়েছেন এরকম নজির ইসলামের ইতিহাসের অনেক।

দ্য ওয়ার্ল্ড বুক অব ইনসাইক্লোপেডিয়াতে বলা হয়েছে, This approach became known as secularism because it is separated poli-

www.amarboi.org

tics from religion. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্ম থেকে আলাদা একটি রাজনীতির নাম। পরিভাষাটি অর্থেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন অব ইথিকস সেকুলারিজম এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, Secularism may be described as a movement intentionally ethical negatively religious with political and philosophical antecedent. অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাজনীতি ও অবরোহী দর্শন এর ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক আন্দোলনের নাম।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চায় মানুষকে ধর্মচর্চা থেকে সরিয়ে নৈতিকতার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু আবার সেই নৈতিকতার উৎসও তাদের অজানা। অথচ এটি স্বতঃসিদ্ধ কথা ধর্ম ছাড়া নৈতিকতাকে কল্পনাও করা যায় না। সরকারি কর্মকর্তারা ভাবছেন ইসলাম ধর্মচর্চা ও আচার আচরণের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে নৈতিকতার চর্চা ও নৈতিক আচার আচরণের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেই দেশ থেকে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, মাদকাসক্তি, চোরাচালান, শিশুহত্যা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অসংখ্য জাতীয় রোগ দূর হয়ে যাবে। জেগে উঠবে নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচার, সদ্ব্যবহার এবং সৃষ্টি হবে দুধে ধোয়া সমাজ, বিবেকবান নাগরিক পাবে। এটি একটি অলীক কল্পনা।

তিনি আবার লিখলেন -"ইসলামপন্থীদের একটা বড় অংশ গণতন্ত্র নয়, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাইছেন। যারা দাবি করেন তারা গণতন্ত্র চাইছেন তারা সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চাইছেন কেন? অন্যত্র লিখেছেন - মূল প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কি সাংঘর্ষিক নাকি সঙ্গতিপূর্ণ? এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে তর্ক অমীমাংসিত।"

আমি এ কথার সাথে একমত হতে পারলাম না। কারণ এ দেশের অধিকাংশ ইসলামপন্থীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। প্রায় সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে। সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শুধু অংশগ্রহণই করেনি, বিজয় লাভ করে সরকার পরিচালনায়ও যোগ দিয়েছে। যার কারণে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের এত রোষানলে পড়েছে। এবং বাংলাদেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিজেদের দলের অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রেখেছে। আমার মনে হয় সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এই চাওয়াটা অযৌক্তিক নয়। কেননা মেজরিটির চাওয়ার বহিঃপ্রকাশ-ই যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে বাংলাদেশের ৯০% মুসলমানের বিশ্বাস ও আস্থা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকতে সমস্যা কোথায়? বরং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এটা সংবিধানে থাকাটাই- তো গণতান্ত্রিক। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

www.amarboi.org

এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম না থাকাটা মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ দেশে তা অ-গণতান্ত্রিক হয় না? এখানে নিপীড়নমূলক সেক্যুলারইজমকে টেনে নিয়ে এসে বিচার করলে চলবে না। এটি বাংলাদেশের মানুষের আস্থা বিশ্বাস, তাহজিব ও তমুদ্দুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঠিক করতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষাবাদ, সমাজতন্ত্র, আল-াহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে কি থাকবে না? তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি এতই উদার হয়, তাহলে এ কয়েকটি কথা সংবিধানে যেহেতু আছেই তাহলে থাকতে সমস্য কোথায়? ঘটনা অন্য জায়গায়। কোন কোন বুদ্ধিজীবী লিখেন বাংলাদেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঢুকে পড়েছে এথাটি কতটুকু ঠিক? এ কথাটি একেবারে ঠিক নয়।

রাষ্ট্রধর্মের ইতিহাস ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে - সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ আব্দুল হান্নান লিখেছেন- "আধুনিক ইতিহাসে দেখতে পাই, রাষ্ট্রের সংবিধানে নানা আদর্শের কথা বলা থাকে। অনেক সংবিধানে রয়েছে গণতন্ত্রের উল্লেখ। অনেক সংবিধানে কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র কমিউনিজমের নীতিমালা অনুসরণ করবে। অনেক সংবিধানে সোস্যালিজমের কথা বলা হয়। কিছু সংবিধানে সেক্যুলরিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, যেসব রাষ্ট্রে কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব রাষ্ট্রে সবাই কমিউনিস্ট নয়। আবার যেসব রাষ্ট্রে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব রাষ্ট্রে সবাই সেক্যুলার নয়, তারা সেক্যুলারিজমের (রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম বাদ দেয়া) নীতিতে বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়ার জন্য এটা জরুরি নয় যে, একশত ভাগ লোককে সে আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে বেশির ভাগ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার আইন, প্রশাসন, অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে ইসলামকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করবে। ইসলাম যেহেতু একটি জীবনব্যবস্থা এবং কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়, তাই ওই সব দেশ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা সঙ্গত মনে করেছে। তাদের কাছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অর্থ রাষ্ট্রের নামাজ পড়া নয়, রোজা পালন নয়, হজ করা নয়। তার অর্থ রাষ্ট্রের ইসলামি আইন অনুসরণ করা। ইসলামি আইনের অন্যতম দিক হচ্ছে অমুসলিমদের সব নাগরিক অধিকার প্রদান; যেমন রাসূল সাঃ মদিনা সনদের মাধ্যমে অমুসলিম নাগরিকদের প্রদান করেছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিষয়টিকে না বুঝে যেভাবে তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানো হচ্ছে, তা সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম না করে অন্যভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বানিয়েছে। যেমন ইরান নিজেকে ইসলামিক রিপাবলিক বা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। একই ব্যাপার ঘটেছে পাকিস্তানের

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে। তারাও দেশকে ইসলামিক রিপাবলিক এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করেছে। মদিনাভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলামিক রিপাবলিক বা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ছিল না। কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ আইন ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। বিচারকরা ইসলামি শরীয়তের ভিত্তিতে বিচার করতেন। শাসকেরা ইসলামি মূল্যবোধের এবং আইনের ভিত্তিতে দেশ চালাতেন। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মুসলিম রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম পরিত্যাগ করতে চান না। কুরআনও তাদের পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে বলেছে। আরো উল্লেখ করা যায়, পাশ্চাত্যের অন্তত চল্লিশটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্ম হয় ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টবাদ। এর অর্থ হচ্ছে, দেশগুলো ওই সব ধর্মের নীতিবোধ ও মূল্যমান অনুসরণ করবে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বে অনেক দেশে যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়েছে বা বাংলাদেশে করা হয়েছে, তা সঙ্গতই হয়েছে।" [সূত্রঃ নয়া দিগন্ত, ৮মে' ২০১১]

জনাব ফরহাদ মজহার সাহেব লিখেছেন সাম্প্রদায়িকতা একটা আপদ- আমি জানি না এর মাধ্যমে তিনি কোন বা বিশেষ ধর্মকে মিন করেছেন কি না? তাহলে আমি বলব ইসলাম ই একমাত্র অ-সাম্প্রদায়িক। বাংলাদেশেও অ-সাম্প্রদায়িক চেতনার ১০০% লালন আলেম উলামা ও ইসলাম পন্থারাই করে থাকেন। যারা প্রকৃত অর্থে কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ করেন এটাই ইসলামের শিক্ষা বলে তারা পালন করেন। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম মনীষীদের তো মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাথে হাতে হাত ধরে কাজ করেছেন। সুতরাং ইউরোপে সেক্যুলারিজম বিকাশের প্রেক্ষাপট দিয়ে মুসলিম দুনিয়া সেকুলারিজমের আগমন ও প্রয়োজনকে বিশ্লেষণ করা অনর্থক। এই সূত্র বাংলাদেশের মানুষ গিলবে না। কারণ এ জমিনের সাথে ইসলামের নাড়ির সম্পর্ক। পাশ্চ্যত্যের সেকুলারিজম ছিল এক ধরনের ধর্মের বিকল্প এবং ধার্মিক হবার হয়তো বিকল্প রাস্তা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সেকুলারিজম সাধারণ মানুষে ধর্ম ও ধার্মিকতার উপর কঠোর আক্রমণ চালিয়েছে মাত্র। সংগত কারণে সাধারণ মানুষ তাই সেকুলারিজমকে তাদের ধর্মীয় প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করছে। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

বেপরোয়া ছাত্রলীগ দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠেঙানোই আসল টার্গেট

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বের নন্দিত ছাত্ররাজনীতি আজ নিন্দিত ও কলুষিত ও ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। ছাত্রনেতার নাম শুনলেই আজ মানুষ ভীত, শঙ্কিত ও অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। অথচ এক সময় যারা ছাত্ররাজনীতি করত তাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখত, দেশমাতৃকার অগ্রজ হিসেবে তাদের জন্য দোয়া করত। ছাত্রনেতা মানেই ছিল সৎ, দক্ষ,দেশপ্রেমিক, নম্র, ভদ্র, ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্ররাই ছাত্রনেতা হতেন। ভালো রেজাল্টধারী, মেধাবী ছাত্ররাই ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন। তাদের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি দেখে মুগ্ধ হতো সবাই। তাদের শাণিত বক্তব্য দেশ গড়ার কাজে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করত। দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে এই আদর্শ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে আপামর ছাত্র-জনতা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকত। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররা। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯'র গণ অভ্যুত্থান, ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে কালের গর্ভে হারিয়ে গেল ছাত্ররাজনীতির সোনালি অতীত।

ছাত্ররাজনীতি আজ সকলের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। বিশেষ করে ছাত্রলীগ এখন হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, সিট দখল, হল দখল ও অস্ত্রবাজির আর এক নাম ছাত্ররাজনীতি। ছাত্রনেতা মানেই ভয়ঙ্কর কোন সন্ত্রাসী। টাকার জন্য হেন কাজ নেই তারা করতে পারে না। অছাত্র ও আদু ভাই মার্কা নেতৃত্বে পরিচালিত আজকের ছাত্ররাজনীতি আমাদের ভবিষ্যৎকে করে তুলেছে মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু কেন? কেন এই অবস্থা? মাত্র অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ছাত্ররাজনীতির দশা এ রকম হল কেন? দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে রক্ষার জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে পেতে হবে এর সমাধান। এটি আমাদের জাতীয় দুর্যোগের চেয়ে অনেক ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর। এর প্রতিকার এখনই না হলে জাতি এক কঠিন বিপদের মুখে পতিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান ছাত্ররাজনীতির এই দশার পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম-যে কারণটি সক্রিয় তা হলো জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার লোভ। জাতীয় নেতাদের চরিত্রের অধঃপতন সমান্তরালে ছাত্রনেতাদেরও চারিত্রিক

www.amarboi.org

স্খলন ঘটছে। জাতীয় নেতারা ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে কোমলমতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও টাকা তুলে দিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলা করার জন্য মাঠে নামানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা হয়ে পড়ছে মেধাশূন্য ও পেশাদার সন্ত্রাসী। আর নিজ দলের সন্ত্রাসীদের হাতে নিজেরাও খুন হচ্ছে অহরহ। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে সবচেয়ে বেশি। শুধু ছাত্রলীগের হাতেই নিহত হয়েছে ১৯ জন মেধাবী ছাত্র। বন্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন। উদ্বিগ্ন হচ্ছেন অভিভাবকবৃন্দ। সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে ইভটিজিং। এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে তাদের। এভাবে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে মারামারি, রক্তপাত ও হানাহানি সৃষ্টি করা হচ্ছে। দেশের প্রতি, দেশের জনগণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছাত্রদের প্রতি আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কোন রকম সহানুভূতি নেই। আমাদের জাতীয় নেতারা তাদের সন্তানকে লেখাপড়ার জন্য দেশের বাইরে পাঠান যেখানে সন্ত্রাস বা সেশনজট নেই। তাই কার সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা নিয়ে নেতাদের নেই কোন মাথাব্যথা।

চলতি সংখ্যা প্রোব ম্যাগাজিনের এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে- "৭৪% রাজনীতিবিদের সন্তান পড়াশোনা করে বিদেশে" 'সানস অ্যান্ড ডটারস অব পলিটিক্যাল প্যারেন্টস' শীর্ষক রিপোর্টে ম্যাগাজিনটির সাম্প্রতিক এক তদন্তে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এতে আরও বলা হয়, রাজনীতিবিদদের সন্তানরা যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে যান তাদের কেউ কেউ দেশে ফিরে আসেন পেশাগত দায়িত্ব পালনে। কেউবা যোগ দেন পিতামাতার ব্যবসায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল ১০৭টি দল। তার মধ্যে মাত্র ৩৯টি নির্বাচন কমিশনের শর্ত পূরণ করে নিবন্ধিত হয়েছিল। সুতরাং দেশে নিবন্ধিত ও নিবন্ধনহীন শত রাজনৈতিক দল আছে। এর মধ্যে আছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া আছে কম পরিচিত বিভিন্ন দল। এজন্য দেশের ২৪টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেলে ও মেয়ের ওপর অনুসন্ধান করেছে প্রোব। এসব দল হলো- আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, জেএসডি (ইনু), জেএসডি (রব), ওয়ার্কার্স পার্টি, গণফোরাম, সাম্যবাদী দল, ন্যাপ (মুজাফফর), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, জাগপা, বিকল্পধারা, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), ডেমোক্রেটিক লীগ, প্রগ্রেসিভ

www.amarboi.org

ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), ইসলামী ঐক্যজোট, জমিয়তে উলেমা ইসলামী বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিশ, প্রগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট পার্টি কল্যাণ পার্টি। নেতাদের সন্তানদের খোঁজখবর নিতে প্রোব রাজনৈতিক নেতাদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের ৩৪ নেতা, বিএনপির ৩২ নেতা, জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর ৫ নেতা, জামায়াতে ইসলামীর ৬ নেতা, জেপির ২ নেতা, জেএসডি (ইনু)র ৩ নেতা, ওয়ার্কার্স পার্টির ২ নেতা, সিপিবির ৩ নেতা, গণফোরামের ২ নেতা, এলডিপির ২ নেতা ও অন্যান্য দলের ১৪ নেতা।

এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রকে। এর পরেই আছে ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়ার নাম। আদর্শ বা অন্যান্য দিক দিয়ে নেতাদের মধ্যে পার্থক্য যাই হোক, যখন তাদের সন্তানদের পড়াশোনার বিষয়টি আসে, তখন তারা সবাই এক। বাম, ডান, মধ্যপন্থী, ইসলামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ যাই হোক তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠাতে ভুল করেন না। সবাই এ বিষয়টি শেয়ার করেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতাদের পছন্দ যুক্তরাষ্ট্র। দেশের বাম নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলের নেতা, তারা সাচ্চা হন বা না হন তাদের আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। উচ্চশিক্ষা ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এরাই সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্য পাঠান। সন্তানের শিক্ষার প্রসঙ্গ আসতেই সমাজতান্ত্রিক নেতাদের পছন্দের তালিকায় উপরে থাকে পুঁজিবাদী দেশগুলো।

বিদেশে বিয়ে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বিয়ে করেছেন মার্কিন আইনজীবী ক্রিস্টিনকে। শিক্ষিত জাতির জন্য রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ। ক্ষমতায় থাকুন আর নাই বা থাকুন রাজনীতিবিদরা সব সময়ই জাতির উন্নয়ন, জনগণের কল্যাণ আর শিক্ষিত জাতি দর্শনের ব্যাপারে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রশ্নে তারা একেবারেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের অরাজকতা আর সহিংসতাই এখানকার উচ্চ শিক্ষার দুরবস্থার জানান দিচ্ছে। আর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দুরবস্থার কথা এখন আর গোপন কোন বিষয় নয়।

একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠলে সেটার মানোন্নয়নের দায়িত্ব বর্তায় মূলত ক্ষমতাসীনদের ওপর। শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। একদিকে রাজনীতিবিদরা মানুষকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেয়ার স্বপ্ন দেখান। অন্যদিকে নিজের দেশে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থাহীনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটান। জনগণ যখন দেখেন, রাজনীতিবিদরা তাদের সন্তানকে শিক্ষা বা কখনও কখনও স্থায়ী হওয়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেন তখন অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার

www.amarboi.org

পুনরুদ্ধারে তাদের যে কোন উদ্যোগ নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে। (মানবজমিন, Sun 24 Oct 2010)

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত। আমার মনে হয় আমাদের জাতীয় নেতাদের সন্তানেরা যদি এই প্রতিষ্ঠান গুলোতে লেখাপড়া করত তাহলে তারা উপলব্ধি করতে পারতেন সেশন জটের যাঁতাকল কত কষ্টের আর সন্ত্রাসের শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাশ হয়ে আসা শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী আর আবু বকরের লাশ বহন করা পিতা-মাতার জন্য কত বেদনার। এই পরিস্থিতির শিকার যারা হন তারাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ছাত্রনামধারী কিছু সন্ত্রাসীদের কাছে আজ জিম্মি কিভাবে হয়ে আছে তার খণ্ডিত একশটি চিত্র ।

ঢাবিতে ছাত্রলীগ বেপরোয়া

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও তাদের রাশ টেনে ধরে রাখতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রায়ই নানা ঘটনা-অঘটনের জন্ম দিচ্ছে তারা। যাতে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হুমকিসহ নানা ঘটনায় গত ২২ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আরও ২৭ ছাত্রকে দেয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিশ। এরা সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও ক্যাডার বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা খায়রুল হাসান জুয়েলও রয়েছেন। প্রক্টর অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তবে বিভিন্ন ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলেও মেধাবী ছাত্র আবু বকর খুনের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ কাউকে বহিষ্কার করেনি। জানা গেছে, শিক্ষক লাঞ্ছনা, হল প্রাধ্যক্ষের কক্ষে ভাঙচুর, ইভটিজিং, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করাসহ নানা অপরাধে জড়িত এসব ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ২৯ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে তাদের মধ্যে ৯ জনকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার, ১১ জনকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার এবং ৯ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। এক বছরের জন্য বহিষ্কার : ৭ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় এক সাংবাদিককে ইভটিজিং করার ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৫ ছাত্রলীগ কর্মীকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। গত ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত এক সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনায় ১৭ জুলাই একজনকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া ২০০৯ সালের ৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায়

www.amarboi.org

১০ আগস্ট ৩ ছাত্রলীগ কর্মীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার : এ বছরের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় এক সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে ৯ আগস্ট ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ২০০৯ সালের ৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় ১০ আগস্ট ৩ ছাত্রলীগ কর্মীকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। একই বছর ১৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈসা খাঁ ঝসে মারামারি ও ভাঙচুরের অভিযোগে ১ আগস্ট থেকে ১ ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ওই বছর জুলাইয়ের শেষদিকে বঙ্গবন্ধু হলে টিভি রুমে খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে হল প্রভোস্টের রুম ভাঙচুরের অভিযোগে ৪ ছাত্রকে ১ আগস্ট থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। একই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের এক আবাসিক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ৪র্থ বর্ষের ছাত্র খায়রুল হাসান জুয়েলকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

সাময়িক বহিষ্কার : ২৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শেষে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মাঠে সংঘর্ষের ঘটনায় ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারের সামনে সাইফুদ্দিন বাবু নামে এক শিক্ষার্থীকে মারাত্মক আহত করায় ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ১০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনায় ৩ ছাত্রলীগ কর্মীকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ বছরের অক্টোবরে তোফায়েল আহমেদ নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতনের দায়ে ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে ৩ অক্টোবর সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের ওপর হামলা, ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ নষ্টসহ বিভিন্ন অভিযোগে আরও ২৭ ছাত্রকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। (যুগান্তর, ১২ নভেম্বর'২০১০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-আতঙ্ক, লোকমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। থাকেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের 'গণরুম' বলে পরিচিত ৮ নম্বর রুমে। সোমবার হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল কবির রাহাতের নেতৃত্বে তাকে দুই দফা পেটানো ও বুট জুতা দিয়ে পিষ্ট করা হয়। বেদম পিটুনি ও বুট জুতার পেষণে তার শরীর ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা না দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায় শাহবাগ থানা পুলিশ। সারাদিনেও কোনো অভিযোগ খুঁজে না পেয়ে রাতেই পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। আহত শরীর নিয়ে সহপাঠীদের আশ্রয়ে রাত কাটলেও ঢাকায় থাকার কোনো

www.amarboi.org

জায়গা না থাকায় বেলা ১১টায় তিনি হাজির হন জহুরুল হক হলে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে গেট পার হয়ে নিজ রুমের দিকে যেতেই শুরু হয় তৃতীয় দফা হামলা। তাঁর চিৎকারে সৃষ্টি হয় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের। তবু বন্ধ হয়নি ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর্যুপরি পিটুনি, লাথি ও ঘুষির আঘাত। মারধর শেষে তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও ছাত্রীদের উত্যক্ত করার ঘটনাও বেড়ে গেছে আশঙ্কাজনক হারে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি রেজা সেকান্দার, জহুরুল হক হল শাখার সাধারণ সম্পাদক শামসুল কবির রাহাত ও কবি জসীমউদ্‌দীন হল শাখার সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেনের নেতৃত্বে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রলীগ কর্মীরা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এ চার ছাত্রলীগ নেতা ও তাদের কর্মীদের নিবৃত্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল প্রশাসনের যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগ তুলেছেন আক্রান্ত ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকরা।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে পুরো ক্যাম্পাসেই ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ইভটিজিং, সাংবাদিক লাঞ্ছনা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কোন্দল, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, ছিনতাই, ফাও খাওয়া, মাদক ব্যবসা, আধিপত্য বিস্তার বেড়ে যাওয়া এ আতঙ্কের কারণ। এসব কর্মকাণ্ডে হল, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মী ছাড়াও এখন কেন্দ্রীয় নেতারাও জড়িয়ে পড়েছেন। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন নিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়ছে। এ নিয়েও যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ড সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও স্বজনপ্রীতি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে নেই। ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয়ভাবে ওই দুই সংগঠনকে কৌশলে ক্যাম্পাসে কর্মকাণ্ডে হামলায় আহত হয়েছেন এসব সংগঠনের সাড়ে ৩ শতাধিক নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জীবন দিতে হয়েছে মেধাবী ছাত্র আবু বকরকেও। গত দু'আড়াই মাস ক্যাম্পাস কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও আবারও অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্ক বিরাজ করছে ক্যাম্পাসে।

হামলার শিকার লোকমান জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে প্রক্টরের কাছে লিখিত আবেদন করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহত লোকমানকে হলে উঠিয়ে দিলেও ওই

www.amarboi.org

ঘটনায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
৩ নভেম্বর এফ রহমান হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ নেশন পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক কদর উদ্দিনকে মারধর করে ওই হলের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা রেজা সেকান্দার ও তার সমর্থকরা। দৈনিক যুগান্তরের এক ফটো সাংবাদিক হেনস্তার শিকার হন। অক্টোবরের শেষের দিকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন দৈনিক কালের কণ্ঠের এক সাংবাদিক।
গত সপ্তাহে নীলক্ষেত এলাকায় ভাড়া নিয়ে এক রিকশাওয়ালাকে ইট দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ায় জহুরুল হক হলের এক ছাত্রলীগ কর্মী। এ ঘটনায়ও ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
এক সপ্তাহ আগে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এর কয়েকদিন আগে মাস্টারদা সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় সাংগঠনিকভাবে বা হল কর্তৃপক্ষীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
২৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিন কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। ভর্তিচ্ছুদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা মিছিলে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে নিজেদের মধ্যে তিন দফা সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল কবির রাহাত ও তার সমর্থকরা সরাসরি এবং মুহসীন হল সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক তহিন গ্রুপের কর্মীরা জড়িত ছিলেন। ওই ঘটনায় ১০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হন। পরীক্ষার দিনে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনায় ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে এ ঘটনায় ঢাবি কর্তৃপক্ষ দায়ী ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ছাত্রলীগ কয়েকজনকে সাময়িক বহিষ্কার করলেও তারা বীরদর্পে ক্যাম্পাসে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।
ক্যাম্পাস ও এর আশপাশ এলাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট এলাকায় ছিনতাই করতে গিয়ে এখন প্রায়ই ধরা পড়ছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। এসব কাজে সূর্যসেন, জসীমউদ্‌দীন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জহুরুল হক, এসএম হল, এফ রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মীরাই বেশি জড়িত। কিছুদিন আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা মোবাইল ও টাকা-পয়সা ছিনতাই করে ওই হলেরই অন্য এক ছাত্রলীগ কর্মীর। জহুরুল হক, এসএম ও এফ রহমান হলের বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলও খেটেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া বাইরে থেকে আগতরা থাকে আতঙ্কে।
সম্প্রতি চাঁদা ও টেন্ডারবাজিতে ছাত্রলীগ কর্মীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অক্টোবরের শেষদিকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি প্রার্থী দেলোয়ার তার সমর্থকরা বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে টেন্ডারবাজি

www.amarboi.org

করার অভিযোগ রয়েছে। সেখানে কয়েক কোটি টাকার একটি কাজ এক ঠিকাদারকে পাইয়ে দেয় ওই নেতা। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বেশকিছু নেতা নগর ভবন, গণপূর্ত বিভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার কাজ নিজের দল এবং মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের পাইয়ে দেয়ার বহু অভিযোগ রয়েছে। এসব টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ক্যাম্পাসে যে কোনো সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে অনেক ছাত্রলীগ নেতা জানান।

এছাড়া ক্যাম্পাসের শতাধিক টঙ খাবারের দোকান এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে রাস্তার পাশে মোটরসাইকেল গ্যারেজ থেকে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা নিচ্ছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এক সহ-সম্পাদক। তিনি প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের গাড়িতে করে ক্যাম্পাস পাহারা দেন। ওই নেতা একাই এসব টাকা হাতিয়ে নেয়ায় অন্য নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। (আমার দেশ, Wed 10 Nov 2010)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২৪ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের দোতলা থেকে ফেলে দেওয়া ছাত্রলীগ কর্মী নাসরুল্লাহ নাসিমের জানাজা মঙ্গলবার বিকেলে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল পাঁচটার দিকে নাসিমের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনা হলে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়।

জানাজা শেষে নাসিমের বাবা মোসলেম উদ্দিন বলেন, "আমি আর আমার ছেলেকে ফিরিয়ে পাব না। তাই সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আর কোনো নাসিম যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে লাশ হয়ে বাড়ি না ফেরে।" ইফতারির টোকেন ভাগাভাগির জের ধরে গত ১৫ আগস্ট এসএম হলে নাসিমকে সদ্য কার্যক্রম স্থগিত করা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আউয়াল কবিরের সমর্থকরা হাতুড়ি, লোহার রড দিয়ে মারধর করে দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। তাকে প্রথমে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আটদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান। নাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। থাকতেন এসএম হলের ২৫৫ নম্বর কক্ষে। প্রথম আলো, (Sat 14 Aug 2010) ছয় মাসে ৪৫২ ছাত্র হল ছেড়েছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে গত ছয় মাসে ৪৫২ জন সাধারণ ছাত্র হল ছেড়েছেন। ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনে অতিষ্ঠ হয়ে এই শিক্ষার্থীরা তাঁদের নামে বরাদ্দ সিট বাতিল করে চলে যান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শূন্য হওয়া এসব সিট বরাদ্দ দেয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলেও এর বিপরীতে আবেদনপত্র জমা পড়েছে কম।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আবদুস সোবহান বলেন, শিক্ষার্থীরা কী

www.amarboi.org

কারণে হল ছাড়ছে, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলগুলোতে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ছয় মাসে বিভিন্ন হলের অন্তত ৪৫২ জন আবাসিক শিক্ষার্থী সিট বাতিল করে চলে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্র জানায়, চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়। এর পর থেকেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন ধরনের হুমকিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে পড়েন। তবে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষে ছাত্রলীগের কর্মী ফারুক হোসেন নিহত হওয়ার পর শিবিরের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। এরপর ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায়।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে মারধরের পাশাপাশি শিবিরের কর্মী আখ্যা দিয়ে কিংবা ছাত্রলীগের কর্মী ফারুক হত্যায় জড়িত বলে পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষার্থীর অভিযোগ তিনি মাদার বখ্‌শ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে মারধর করা হয়। হলে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে সিট বাতিল করে তিনি ক্যাম্পাসের বাইরে একটি বেসরকারি ছাত্রাবাসে থাকছেন। এস এম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন এমন একজনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, হলে থাকার সময় তিনি কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। সম্প্রতি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে ছাত্রশিবিরের কর্মী আখ্যা দিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে না পারায় তিনি সিট বাতিল করে হল ছেড়ে দিয়েছেন। শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের এক আবাসিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা ভয়ভীতি দেখিয়ে সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা নিয়েছে। বাধ্য হয়ে তিনি সিট বাতিল করেছেন। কর্মীর চাঁদা দাবিতে তিনি অতিষ্ঠ। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগের মিছিল-সমাবেশেও অংশ নেওয়ার জন্য তাকে চাপ দেয়া হয়।

এদিকে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষের পর বিভিন্ন হলের অনেকের কক্ষ তালাবদ্ধ ছিল। কিছু কক্ষ শিবিরের নেতা-কর্মীর হলেও অধিকাংশই ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের। এসব কক্ষের তালা ভেঙে কম্পিউটার, কাপড় চোপড় ও বইখাতা লুট করা হয়। এসএম হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সেলিম জানান, ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের আগে তিনি বাড়ি চলে যান। সংঘর্ষের কয়েক দিন পরে হলে ফিরে দেখেন তাঁর কম্পিউটারসহ অনেক কিছু খোয়া গেছে। পরে জানতে পারেন, একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা তালা ভেঙে এসব নিয়ে গেছে। বিষয়টি হলের প্রাধ্যক্ষকে জানালে তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। বিভিন্ন হল সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীরা সিট বাতিল করে চলে যাওয়ায় শূন্য সিটগুলো

www.amarboi.org

নতুনভাবে বরাদ্দের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এতে শিক্ষার্থীদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শামসুজ্জোহা হলে দুই মাস আগে ১২০টি শূন্য সিটের বিপরীতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এতে আবেদনপত্র জমা পড়ে মাত্র ৬০টি। সবাইকে সিট দেওয়া হলেও হলে উঠেছেন ৫৪ জন। অন্য হলগুলোতে একই অবস্থা বলে জানা গেছে। শের-ই-বাংলা হলের প্রাধ্যক্ষ সুভাষ চন্দ্র শীলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি জানান, কয়েকজন শিক্ষার্থী সিট বাতিল করে চলে গেছেন। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজির কারণে শিক্ষার্থীরা চলে গেছেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হল ছেড়েছেন।

শামসুজ্জোহা হলের প্রাধ্যক্ষ মর্তুজা খালেদ সাধারণ শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের সভাপতি মলয় ভৌমিক বলেন, ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দুঃখজনক।

গত ২৬ আগস্ট (শীর্ষ নিউজ ডটকম) : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ৫ জুলাই ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জনকে স্থায়ী ও ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এ ঘটনায় প্রতিটি হলে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যে কোন সময় আবারো সহিংসতা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে ক্যাম্পাসে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দুপুর থেকে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম শাফিন ও সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর আলম সাম্যকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির সাংবাদিকদের বলেন, আমি মনে করি বহিষ্কৃতরা অবিলম্বে ক্যাম্পাস ত্যাগ করবে। এদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, উপাচার্য পরিকল্পিতভাবে ওই দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সংঘর্ষে ইন্ধন দেন। উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৩০ জন গুরুতর আহত হয় ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

রাবিতে ছাত্রলীগের গোলাগুলি : আহত ১৫ : সম্পাদক গ্রেফতার আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনায় একজন গুলিবিদ্ধসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। মেহেদী ও শাকিব গুলিবিদ্ধ, ফারদিন ও তানিম চাইনিজ কুড়ালের কোপে মারাত্মক আহত হয়। সংঘর্ষ

www.amarboi.org

চলাকালে উভয় গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে বিশ রাউন্ড গুলি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। রাজশাহী মহানগর পূর্ব জোনের পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদুর রহমান বলেন, সাধারণ সম্পাদককে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। (আমার দেশ, Sun 8 Aug 2010)

রাবি, ৮ আগস্ট (শীর্ষ নিউজ ডটকম): রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগই এখন ছাত্রলীগের প্রধান প্রতিপক্ষ। এক গ্রুপের কর্মীরা প্রতিপক্ষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। সমর্থকরা প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের হাতে। শিকার হচ্ছে নানা নির্যাতনেরও। গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করায় গত ৬ মাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, প্রেমঘটিত বিষয় এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ২০-২৫ বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে শতাধিক নেতা-কর্মী।

প্রতিপক্ষ ছাত্র শিবির এবং ছাত্রদলের উপস্থিতি না থাকায় রাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা চাঁদা আদায়সহ নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৮ এপ্রিল মোটা অংকে চাঁদা না দেয়ায় ছাত্রলীগ কর্মী পারভেজ অপর কর্মী জনকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের একটি কক্ষে সিগারেটের আগুন দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দেয়। এতে করে জনকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়।

গত মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু হলে কেরাম খেলাকে কেন্দ্র করে রাবি শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন মুরাদকে পিটিয়ে আহত করে সভাপতি গ্রুপের কর্মী ফারুক ও সোহেল। অন্যদিকে একই দিনে নৈতিক স্খলনের খবর ফাঁস করে দেয়ায় ছাত্রলীগ কর্মী সুহিন অপর এক ছাত্রলীগ কর্মী বাপ্পিকে পিটিয়ে আহত করে হল থেকে বের করে দেয়।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১ জুন গভীর রাতে মাদার বখ্শ হলে রাবি শাখা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে সভাপতি গ্রুপের দেলোয়ার হোসেন ডিলস, মনিরুল ইসলাম, নাসির এবং সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের তোফাজ্জল হোসেনসহ উভয় গ্রুপের পাঁচ কর্মী গুরুতর আহত হয়। সংঘর্ষের সাথে জড়িত পাঁচ কর্মীকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করলেও ১২ ঘন্টার মধ্যে তাদের মতিহার থানা পুলিশ ছেড়ে দেয়।

সাইকেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১৭ জুন রাতে রাবির শাহ্ মখদুম হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে তিন কর্মী আহত হয়। ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রুপের ফেরদৌস হোসেন গত ৯ জুন সাধারণ সম্পাদকের অনুসারী একই হলের কর্মী মিঠুন কুমার হালদারের একটি সাইকেল চুরি করে। এতে করে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ছাত্রশিবিরকে প্রশ্রয় দেয়ার বিরোধিতা করায় গত ২৬ জুন স্থানীয় যুবলীগ

www.amarboi.org

কর্মীদের হামলায় রাবির ৪ ছাত্রলীগ কর্মীসহ ১০ জন সাধারণ ছাত্র আহত হয়। প্রেমঘটিত কারণে গত ৩ জুলাই রাবি শাখা ছাত্রলীগ-ছাত্রমৈত্রী সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের তিন কর্মী আহত হয়। রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। শুধু ছাত্রলীগের কর্মীই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাইনিং কর্মচারী, ছাত্রীসহ ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও ছাত্রলীগের হাতে নিরাপদ নয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাবি শাখা ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সহকারী প্রক্টরসহ আট সাংবাদিক আহন। প্রেমের প্রস্তারেব রাজি না হওয়ায় গত ১ এপ্রিল ছাত্রলীগ ক্যাডার কাউসার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে পিটিয়ে আহত করে। এর আগে একই ছাত্রীকে প্রহার করার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের কাছ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায় ওই ছাত্রলীগ কর্মী। রাবি শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আউয়াল কবির জয়কে হলে প্রবেশ করতে না দেয়ায় গত ৮ এপ্রিল শহীদ শামসুজ্জোহা হলের প্রাধ্যক্ষকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং হলে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের কক্ষে ভালো মানের খাবার পরিবেশন না করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের এক ডাইনিং কর্মচারীকে পিটিয়ে হল ছাড়ার আল্টিমেটাম দেয় হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। (শীর্ষ নিউজ ডটকম/রাবি প্রতিনিধি/ডিএইচ/এসএম/১১.০৫ঘ)

সু-প্রিয় পাঠক, পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে এরকম একটি ঘটনাই যথেষ্ট নয় কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা গানম্যান চেয়েছেন : সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেবে কে? দেশের আইন-শৃঙ্খলা যেন ভেঙে পড়েছে। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন, জখম, হামলার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। এসব ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব জড়িয়ে পড়ায় পুলিশের পক্ষে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে না পারার খবর এখন পুরনো হয়ে গেছে। খোদ পুলিশ অফিসাররাই এখন হামলার শিকার হচ্ছেন। আর এসব হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার তালিকায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী এমনকি জনপ্রতিনিধিদের নামও জানা যাচ্ছে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র কোন্দল এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, শিক্ষার্থীরাই শুধু নন, শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নামে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় প্রতিপক্ষের হাতে দলের ছাত্র কর্মীরা শুধু জখমই হয়নি, তাদের হলের রুম থেকে নিচে ফেলে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়েছে যে, এখন ভিসিরাও নিরাপত্তার জন্য গানম্যান চাইছেন। সম্প্রতি ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সংগঠন ভিসি পরিষদ সর্বসম্মতভাবে নিজেদের নিরাপত্তায় সরকারের কাছে গানম্যান চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

www.amarboi.org

এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে বলা যাবে না। ক্ষমতাসীনরা নিজদলীয় লোকজনের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলেই এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। দলীয় লোকজন এখন আইনের তোয়াক্কা করছে না। ফলে সংসদ সদস্যের হাতে ওসি মার খাচ্ছেন। সরকারদলীয় লোকরাই নিজেদের মধ্যে খোনাখুনিতে জড়িয়ে পড়ছে। খুনের ঘটনায় থানায় মামলা করা নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সংসদ সদস্যরা যদি এমন যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন, তবে সাধারণ মানুষ যাবেটা কোথায়? এভাবে নিয়মিত বেআইনি কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশে আইনের শাসন বিপর্যস্ত করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে সেটা ভেবে দেখার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা সরকারের কাছে গানম্যান চাইতে পারেন, সাধারণ মানুষ কী চাইবে? মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবে কে এমন প্রশ্নই দিন দিন বড় হয়ে উঠছে।

ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় ছয় সাংবাদিককে পেটাল ছাত্রলীগ: এবার ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করে হামলার শিকার হলেন ছয় সংবাদকর্মী। ঘটনাস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনার প্রতিবাদ করলে জসীমউদ্‌দীন হলের ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সাংবাদিকদের পিটিয়ে আহত করে। আহতরা হলেন চ্যানেল আইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক সেফাউল হোসেন, নিউ এজের গাজী তাওহীদ, যমুনা টিভির নিজস্ব প্রতিবেদক মীর সাব্বির, এবিসি রেডিওর শাকিল হাসান, সাপ্তাহিক ২০০০-এর মনির মমতাজ ও বার্তা টোয়েন্টিফোরের হাবিবুর রহমান। আহতরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শী ও আহতরা জানান, রাত ৯টার দিকে রোকেয়া হলের এক ছাত্রী টিএসসি থেকে হলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন জসীমউদ্দীন হল ছাত্রলীগের কয়েক কর্মী ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে। ছাত্রী প্রতিবাদ করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উত্ত্যক্তকারীরা সটকে পড়ে। রাত ১০টার দিকে জসীমউদ্‌দীন হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী এনায়েত গ্রুপের শহিদুল ইসলাম মাহী, রোবায়েত, সুজন, সোহেল ও রুমিসহ ২০-২৫ জন টিএসসিতে লাঠিসোঁটা নিয়ে তাণ্ডব চালান। ইভ টিজিংয়ের শিকার ছাত্রীর পক্ষ নেয়ায় ওই সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালান। ছয়জনকে পিটিয়ে সদলবলে চলে যান হামলাকারীরা। (কালের কণ্ঠ, Mon 8 Nov 2010)

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্র-যুবলীগের একটি অপকর্ম সরকারের সব সাফল্য ম্লান করে দিতে পারে। শুধু সরকারের কর্মকাণ্ডে আগামী নির্বাচনের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে না। দলীয় কর্মকাণ্ডেও আগামী নির্বাচনে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। (সমকাল,

www.amarboi.org

Sun; 7 Nov 2010) জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষের কাঁচামাল হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহারের প্রবণতা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করছে। বাড়িয়ে তুলছে সেশনজট, ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়ছে কলুষিত, মেধাশূন্য, সন্ত্রাস ও পেশি শক্তিনির্ভর। বিশেষ করে ভিন্নমত ও ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতার অভাব ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে হানাহানি, হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। আর বিদেশী চক্রান্তের জাল তো আছেই।

প্লেটো বলেছেন, 'Man is by born a political being' অর্থাৎ মানুষ জন্মগতভাবেই একটি রাজনৈতিক সত্তা। জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও কথাটি সত্যি। এই নেতৃত্ব যদি সৎ হয় তাহলে তার নেতৃত্বে সমাজে শান্তি আসে আর নেতৃত্ব অসৎ হলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের জাতীয় ও ছাত্রনেতৃত্ব উভয়েরই অবস্থান সততা ও দেশপ্রেম থেকে অনেক দূরে। তাই সমাজ ও ছাত্ররাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা, অসততা, দুর্নীতি পরিহার করে আমাদের জাতীয় নেতাদের দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে এলেই একমাত্র ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা সম্ভব। মেধাহীন, সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতিকে দেশের জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী কেউই পছন্দ করে না। মেধাভিত্তিক আদর্শিক ছাত্ররাজনীতি আজ তাই সময়ের দাবি। সকল দলাদলি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে আজকের ছাত্রদের মাঝে মেধাবী, সৎ ও আদর্শনির্ভর ছাত্ররাজনীতি উপহার দিতে। লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি নয় বরং ছাত্রসংগঠনগুলোকে স্বাধীন করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের মেধাবিকাশ এবং গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছাত্ররাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা থাকতে পারে। জাতীয়ভাবে তারা কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারে। কিন্তু সরাসরি জাতীয় রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ছাত্রসংগঠনগুলোকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। আর ছাত্রসমাজকেও সন্ত্রাস ও মেধাহীন ছাত্রনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে মেধাবী, চরিত্রবান ও আদর্শিক নেতৃত্বের ধারা তৈরি করতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে, মানুষ গড়ার আঙিনা থেকে যাতে সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা যায় এজন্য দলমত নির্বিশেষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু এসবই আওয়ামী লীগের কাছে "কামারের দোকানে কুরআন তেলাওয়াত করার মত।"

বর্তমান সরকারের সময়ে সবচেয়ে আলোচনা আর সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী ছেড়েছেন ছাত্রলীগের দলীয়

www.amarboi.org

অভিভাবকত্বের পদ। দেশের ৫ জন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী লিখিতভাবে সতর্ক করেছেন আওয়ামীলীগকে। পত্রিকার অসংখ্য সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে শুধু ছাত্রলীগকে নিয়ে। কলাম আর নিজের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু না, কোন কথায় যেন কাজ হচ্ছে না। ছাত্রলীগকে নিয়ে আপন পরিকল্পনার কথা একদিন মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল আওয়ামী লীগের এক সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের মুখ থেকে। তিনি বললেন ছাত্রলীগ নিজেরা এত মারামারি না করে যেন এই শক্তি সামর্থ্য বিরোধী দলকে দমনে ব্যবহার করে। মন্ত্রীর মিডিয়ার সামনে এমন বক্তব্য থেকে বুঝতে আর বাকি থাকল না এই বেপরোয়া ও অ-নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগ আসলে একশত ভাগ আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণই পরিচালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মান অভিমান এবং দলীয় নেতাদের সতর্কবাণী ও সমালোচনাপূর্ণ বক্তব্য "আই ওয়াশ" ছাড়া অন্য কিছু নয়, এটি এখন আর বুঝতে বাকি নেই দেশবাসীর। আওয়ামী লীগের টার্গেট বেপরোয়া ছাত্রলীগকে দিয়ে বিরোধী দল এবং বিরোধী ছাত্রসংগঠন কে ঠেঙানো। যদিও অনেক জায়গায় ছাত্রলীগের ঠেঙানোর শিকার স্বয়ং নিজেরাই। পরিশেষে বলতে চাই আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে বারাক ওবামার যে ভরাডুবি হয়েছে তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সেখানে কিন্তু ছাত্রলীগের এমন অপকর্ম ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি আগামী নিবাচনে ছাত্রলীগের এসকল অপকর্মের বোঝাসহ তরী কিনারায় তুলতে পারবেন তো?

● ১৩ নভেম্বর ২০১০

www.amarboi.org

সত্যপন্থীরাই যেন অপরাধী

আজকের মানবসমাজ জালেম ও মজলুম, দু'টি বিপরীত গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আছে। বিশ্ববাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন কোথাও দাসত্ব ও জুলুমের শিকার হয়ে কোথাও সীমাহীন স্বৈরাচারী ও পাপাচারের কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে। পরিণামে মানবসমাজ যেন ধ্বংস ও বিনাশের পথে-ই এগিয়ে চলেছে। আল্লাহদ্রোহী দুনিয়ায় আজ অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, হঠকারিতা ও দুর্ধর্ষতার সীমা ছেড়ে গেছে, নিপীড়িত মানুষের করুণ ফরিয়াদে আকাশ বাতাস দলিত মথিত ও তিক্ত-বিষাক্ত। সেখানে সত্যপন্থীরা যেন অপরাধী আর জালেমের বিশাক্ত হুঙ্কার মানব সমাজকে কাঁপিয়ে তুলছে। কিন্তু তারপরও কি সত্য পথের সৈনিকেরা ভীত? না, বরং প্রতিটি মুমিন এই বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দেয়া কে নিজের ঈমানী দায়িত্বের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে-ই এগিয়ে চলছে।

মুমিনের জন্য দুনিয়া হচ্ছে একটি পরীক্ষাগার। এখানে বয়স বা আয়ুষ্কাল হলো পরীক্ষার সময়। মুমিনরা তো প্রাণের কথা ভাবেই না, এ তো কখন না কখন চলে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য কেউই এ পৃথিবীতে আসেনি। কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা চিন্তার নয়। বরং আসল চিন্তার বিষয় হলো ঈমানকে কিভাবে বাঁচানো যাবে কিভাবে থাকা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডির মধ্যে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈমান হারিয়ে ফেলে তাতো বিরাট এক ব্যর্থতা। তাহলে সে ঈমানের মূল্য কী? আর ঈমান বাঁচাতে যদি দুনিয়ায় প্রাণ বিসর্জিত হয় তাহলে এ এক মহা সফলতা। এতো ফলাফলের আকাশ-পাতাল পার্থক্যই শুধু নয়– এতে প্রাণ সৃষ্টির সার্থকতা পরিগ্রহ হবে। এমন মৃত্যু গৌরবের। এই মৃত্যুকে অভিনন্দন। সুতরাং প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান আর ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বড়ই ব্যবধান। এটি কখনও এক হতে পারে না। আর মুমিন ব্যক্তি যদি এই ঈমান ও নেকির পথে চলতে গিয়ে পার্থিব সকল নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত হয় এটি পার্থিব দৃষ্টিতে ব্যর্থতার হলেও আল্লাহর কাছে তার বিনিময় যদি জান্নাতই হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি থেকে আর সফল কে হতে পারে? আল্লাহ বলেন-

আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক সক্ষম? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য। আর সেই মহা সাফল্যের দিকেই দৌড়িয়েছেন সাহাবায়ে আজমাঈনগণ।

www.amarboi.org

হযরত রাশেদ বিন সা'দ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কবরে সকল মুমিনের পরীক্ষা হবে, কিন্তু শহীদের হবে না, এর কারণ কী? হুজুর (সা.) জবাবে বলেন, তার মাথার ওপর তলোয়ার চমকানোই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, আমাদের মহান আল্লাহ সে ব্যক্তির ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পরাজয় বরণ করলেও নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে ফিরে দাঁড়ায় এবং আমৃত্যু লড়াই করে। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমার পুরস্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে সে পুনরায় জিহাদে লিপ্ত হয়েছে শেষ পর্যন্ত নিজের জান দিয়েছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।'

হযরত উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা থেকে বর্ণিত, "তিনি হুজুর (সা.) এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? জঙ্গে বদরের পূর্বে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে যায় এবং তিনি শহীদ হন। যদি তিনি জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আমি সবর করবো, অন্যথায় প্রাণ ভরে কাঁদব। হুজুর (সা.) জবাব দিলেন, হারেসার মা। বেহেশতে তো অনেক বেহেশতবাসীই রয়েছেন তোমার ছেলে তো সেরা ফেরদাউসে রয়েছেন।"

যারা সব রকমের সমস্যা সঙ্কট বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবেলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যারা স্বেচ্ছায় ঈমান আনার বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আর কাফের ফাসিকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য।

নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বংশ-পরিবারের ওপরও ভরসা করেনি। নিজের রবের ওপর ভরসা করেছে। এবং ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করেছে এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান আল্লাহর কাছে কখনো নষ্ট হবে না বরং তার প্রতিদান হবে জান্নাত।

তারা তাদের মাবুদের সাথে তামাম জিনিসের বিনিময় করে শুধু একটি বাক্যের ভিত্তিতে "রাদিয়া আল্লাহু আনহুম অরাদু আনহ।" পৃথিবীর সকল শক্তি মিলে যেমনি একটি প্রাণী হত্যা করতে পারে না, ঠিক তেমনি সবাই মিলেও একটি প্রাণীকে বাঁচাতে পারবে না। সারা পৃথিবীর সবাই একজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও তাকে যেমনি অসম্মানিত করতে পারে না, ঠিক গোটা পৃথিবী একসাথ হয়ে চেষ্টা করেও কাউকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

www.amarboi.org

আল্লাহ বলেন-

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

যে মানবগোষ্ঠী কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধন-দৌলতের আশা-অভিলাষ ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীকে ঐসব অরাজকতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, যারা জুলুম ও অবিচারের মূলোৎপাটন করে তার স্থলে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়, যারা এই মহৎ কাজে নিজেদের জান-মাল, বাণিজ্য, পিতা, পুত্র, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের মায়া এবং ঘরের আরাম-আয়েশ, বিলাস ব্যসন সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারে, তাদের চেয়ে বেশি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী আর কে? সাফল্য ও বিজয়ের সিংহদ্বার তাদের জন্য ছাড়া আর কার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে? তাদের শক্তির উৎস অনেক গভীর থেকে প্রোথিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করে না। প্রথমত সে চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়টি হলো সে চক্ষু যা শত্রুর প্রতীক্ষায় আল্লাহর পথে পাহারাদারি করে রাত কাটিয়েছে।'

কিন্তু অন্যায়-অত্যাচার থেকে অন্যকে বাঁচানো তো দূরের কথা, কেবল নিজেদের ওপর থেকে জুলুম প্রতিহত করার অনুভূতি ও উদ্যমও যদি কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে না থাকে এবং এর জন্য তারা যদি নিজেদের আরাম ও বিলাস, ধন ও সম্পত্তি, ইন্দ্রিয় সুখ ও প্রাণের মায়া সব কিছুকে বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে, তা হলে সে মানবগোষ্ঠী কখনো লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে পারে না। তার ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে কেউ পদদলিত করতে পারে না। সত্যের সামনে অবলীলাক্রমে মাথা নত করে দেবে এবং অসত্যের সামনে মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করবে, এটাই হওয়া চাই একটা মর্যাদাশীল মানবগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমরা দেখেছি সালাহুদ্দীনের জিহাদী প্রয়াস ও তাঁর সহয়োপযোগী নেতৃত্ব মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামির ভয়াবহ বিপদ থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য নিরাপদ করে দেয়। মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম জাহানের ওপর পুনরায় আলস্য ও গাফিলতির ভূত চেপে বসে। পারস্পরিক অনৈক্য ও হানাহানি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সালাহুদ্দীনের পর মুসলিম জাহান পুনরায় এরকম অকৃত্রিম নেতা ও পথ-প্রদর্শক পায়নি, যিনি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য অস্থির হয়েছেন, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জিহাদ ফী

www.amarboi.org

সাবিলিল্লাহ ছাড়া আর কিছু নয় এবং যিনি মুসলিম জাহানের এতটা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। আর মুসলিম বিশ্বের নাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন।

তাই কবির ভাষায়-

হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্যের সাথে রণ।
তা'রা জেনেছিল, দুনিয়ার তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ!
জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয়!
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষ্ণা তার বাড়ে,
দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিয়ায় শিয়ায় হাড়ে!
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের জন্য স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে জরুরি জিনিস। স্বাধীনতা হারানোর পর মুসলমানদের মধ্যে মানবতার যে সর্বোচ্চ সেবার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ক্ষমতা আর থাকে না। এমনকি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধর্মীয় জীবনকে বহাল রাখতে পারে না। আজকের এই সময়ে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্বের জন্য সত্যিকার ত্যাগ ও কোরবানির প্রয়োজন এখন-ই সবচেয়ে বেশি। এই ত্যাগ ও কোরবানিই হলো সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক। দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক সাক্ষী।

এই আন্দোলন ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও ভাষার জাতীয়তাবাদের খোলসমুক্ত। তাদের ভালবাসার ভিত্তি আল্লাহ ও রাসূল। আদর্শ হচ্ছে শাশ্বত বিধান আল ইসলাম। মুক্তির টার্গেট দেশ জাতির গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বমানবতার। তাদের এ ভালবাসার চৌহদ্দি নদী-সাগর পেরিয়ে মহাসাগরের মত উদার। যারা বিশ্বমানবতার মুক্তি টার্গেট বানিয়েছে তারা কি বাড়ির দারোয়ান কিংবা প্রতিবেশীর বিরোধিতাই অধৈর্য, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। না তাদের মনজিল বহু থেকে বহু দূরে অনেক কন্টকাকীর্ণ পথ পরে। তারা কি অপপ্রচারের সামান্য ভাষায় ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, না তাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস আরো অনেক বেশি সংজ্ঞাপন্ন। কিন্তু তারা সঙ্কটাপন্ন সকল কিছুকে অতিক্রম করে এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বদ্ধপরিকর।

● সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

www.amarboi.org

মুজিবের বাকশাল আর নিজে প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার নিরাপদ কৌশল

দু'জন বিচারপতিকে সুপারসিড করে এবিএম খায়রুল হককে দেশের ১৯ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয় বর্তমান সরকার। তাঁর নিয়োগের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন না যতটুকু উত্তপ্ত ছিল তার থেকে অনেক বেশী উত্তপ্ত ও সরগরম ছিল সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণ তাও মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কারণ অধিকাংশ রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর সমাধান এ সময় আদালতেই নিষ্পত্তি করেছে। ফলে আদালত-ই হয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। যদিও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা কারো-ই কাম্য নয়। তাছাড়া এর সদূরপ্রসারী ক্ষতির দিকও কম নয়। প্রতিটি নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানস্বীকৃত অধিকার। আর রাজনৈতিক ইস্যুগুলোই যখন আদালত সমাধানের উদ্যোগ নেয় তখন স্বভাবত-ই সমালোচনার মুখে পড়ে আদালত। এদিক থেকে অবশ্য জনাব হকের জুড়ি তিনি নিজেই।

অথচ এই বিতর্কের জন্য রয়েছে সংসদ। কিন্তু সেই রকম অনেকগুলো মামলার রায় হয়েছে প্রধান বিচারপতি জনাব এবিএম খায়রুল হক-এর সময়ে। এই বিচারপতিকে নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই এবং আপাতদৃষ্টিতে সহজে থামারও কোন সম্ভাবনা নেই। বরং ক্রমান্বয়ে দেশ সংঘাতমুখী হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক যতগুলো জটিল মামলার রায় দিয়েছেন এতে সন্দেহ নেই তিনি অনেক দুঃসাহসিক মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো ঝুঁকি জনাব হক কি দেশ জাতি ও আইনের সু-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়েছেন, নাকি প্রধান উপদেষ্টার পদটি গ্রহণ করা জন্য সেই প্রশ্নটি এখন সবার আগে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে প্রধান উপদেষ্টা যেই হোক না কেন জনাব হক যে এই মহান দায়িত্বের জন্য নৈতিকভাবে অযোগ্য এটি এখন দেশের মানুষ কারোই অজানা নয়। এখন রায় সংসদের মাধ্যমে বাতিল না করলে পরিস্থিতি অনেক জটিল হবে। আর যিনি এতগুলো সংকটের নেতৃত্ব দিলেন তাঁর ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, বিচারপতি খায়রুল হকের মতো বিচারপতি শতাব্দীতে একজনই জন্মান। খায়রুল হক ছিলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সুর্ণযুগে প্রবেশ করার

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে অন্যতম কাণ্ডারি।

আমি অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবের কথাকে একটু শুধরিয়ে বলব, বিচারপতি হক বিভাগকে স্বর্ণযুগে প্রবেশ করাননি, বরং জনাব হক প্রত্যেকটি মামলার রায় আওয়ামী লীগ স্বর্ণযুগে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অন্যতম কাণ্ডারি-ই শুধু নয় দিকপাল হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন। আমি মনে করি বিচারপতি হক যদি এমন ভূমিকা না রাখেন তাহলে দু'জন বিচারপতিকে সুপারসিড করে তাঁকে প্রধান বিচারপতি করে আওয়ামী লীগের লাভ কী?। এই আনুগত্যপরায়ণ মানুষ আওয়ামী লীগের সমপরিমাণ আর কোন রাজনৈতিক দলেই নেই। তিনি ১০০% দলীয় আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এদিক থেকে অবশ্য জনাব হক মোবারকবাদ পাবার যোগ্য। বিএনপি এই দিক থেকে অনেক পেছনের সারিতে অবস্থান করিতেছে। যদি আওয়ামী লীগের মত দলীয় আনুগত্যপরায়ণ আরও কিছু মানুষ এ দলে থাকত তাহলে বিএনপির এ জনসমর্থন নিয়ে তাদের ভাগ্য আজ অন্যভাবে লেখা হতো।

বিচারপতি হক-এর মত এত বিতর্কিত ও সংঘাতমুখী রায় আর কেউ দিয়েছেন কিনা তা আইনজীবীরাই ভাল বলতে পারবেন। যেমন-তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবলিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মামলা, ৫ম সংশোধনীর রিভিউ'র (পর্যালোচনার) মামলা, ৭ম সংশোধনীর মামলা, ফতোয়ার মামলা, ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অব্যাহতি প্রদানের মামলা, খালেদা জিয়ার বাড়ির মামলাসহ সরকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজ ইচ্ছায় তিনি আগে নিষ্পত্তি করেছেন। তাছাড়া সরকারের বিপক্ষে সোচ্চার দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় 'চেম্বার জজ মানেই সরকার পক্ষে স্টে' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপানোর পর পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ৬ মাসের জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের সাজা দেন। এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান আইনে না থাকলেও সরকারকে খুশি করার জন্যই এটা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে মনের করেন আইনজীবীরা। দেশের ১৮তম প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম সরকারের নিয়োগ দেয়া হাইকোর্টের দু'জন বিতর্কিত অস্থায়ী বিচারপতিকে শপথ পড়ানো থেকে বিরত ছিলেন। কারণ হিসেবে ওই দু'জন বিচারপতির মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতির কক্ষে লাথি মারা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ এবং অপরজন রাবিতে শিবির নেতার খুনের মামলার আসামি ছিলেন। জনাব হক গত বছর ১ অক্টোবর দায়িত্ব নেয়ার পরপরই ওই দু'জন বিচারপতির শপথ পড়ান।

এছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালে এবিএম খায়রুল হক ২০০৯ সালে জনস্বার্থের একটি মামলায় জিয়াউর রহমানের স্থলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক স্বীকৃতি দিয়ে রায় দিয়েছেন। এ ধরনের রায়কে সম্পূর্ণ

www.amarboi.org

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন আইনজীবীরা। এ রায়ের মাধ্যমে তিনি বঙ্গবন্ধুকে খাটো করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম। তিনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "বঙ্গবন্ধু জাতির জনক। তিনি কখনোই স্বাধীনতার ঘোষক হতে পারেন না। জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক।"

২০০৫ সালে তিনি ৫ম সংশোধনী বাতিল করে ওই রায় দেন। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি থাকাকালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলকে অবৈধ ঘোষণা করে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বাতিল ঘোষণার রায় বহাল রেখে গেছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ, বঙ্গবন্ধু যেখানে দাঁড়িয়ে ৭ মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন সেই স্থানের সংরক্ষণ, পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের স্থান সংরক্ষণসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সব স্থান সংরক্ষণের রায়ও তিনি দিয়ে গেছেন। নিজস্ব ভাবাদর্শ আর মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ রায় দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই। এত সব রায় দিয়ে যিনি হিরো হতে চেয়েছেন।

কিন্তু তার বিদায়ের মাত্র কিছু সময় আগে রাজধানীর কাকরাইলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য বহুতল বাসভবন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ও প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছে তা যেন পূর্ববর্তী সকল সন্দেহ সত্য প্রমাণের সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন তিনি।

আইনমন্ত্রী তার বক্তব্যে বললেন "২০০৭ সালের নভেম্বরে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বিচারের কাজে মোটেও অগ্রগতি হয়নি।" এরপর আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে হক বলেন, "তিনি কি জানেন, চারজন ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি কোর্ট ব্যবহার করতে হয়? এর উত্তর কে দেবে? আমরা স্বাধীন হয়েছি, কী রকম স্বাধীন? আমাদের হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে দেয়া হয়েছে। এ রকম স্বাধীন আমরা হয়েছি! কাজেই মাননীয় আইনমন্ত্রী আপনার ঘর আগে সামাল দেন।" প্রধান বিচারপতি ও আইনমন্ত্রীর এই বাদানুবাদের সময় অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রধান অতিথির চেয়ারে বসা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পাঠকবৃন্দ লেখার কলেবর বৃদ্ধির শঙ্কায় আমি বাদানুবাদ বিস্তারিত উল্লেখ করলাম না। তাহলে এই প্রশ্ন যদি স্বয়ং আইনমন্ত্রীর আর বাদানুবাদের ভাষা যদি হয় এমন তাহলে আমাদের জনসাধারণদের আর কী বলার আছে?। তাহলে এখন কি জনমনে প্রধান বিচারপতি হকের রায় নিয়ে প্রশ্ন আসবে না? তিনি কি তাহলে কারো রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা ছিলেন? "আমাদের হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে দেয়া হয়েছে।" কথাগুলো যেন তাঁর অনেক অর্জনকেই ম্লান করেছে। প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে বিরোধীদল থেকে "তাহলে হাত পাঁ বাঁধা বিচারপতির রায় কতটুকু স্বাধীন

www.amarboi.org

ও কার্যকর। তাহলে তিনি কতটুকু যোগ্য ও সাহসী?

জনাব হক আইনমন্ত্রীর উদ্দেশে এই কথাগুলো বলার সময় তাঁকে অনেক ক্ষুব্ধ মনে হয়েছে। অথচ বিচারপতিরা যখন শপথ নেন, তখন বলেন– আমি অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোন কিছুই করব না। আইনজীবীদের মতে তিনি এ শপথ ভঙ্গ করেছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিচারপতি যারা নিরপেক্ষভাবে রায় দিতেন, সরকারের বিপক্ষে রায় দিতেন তাদের বেঞ্চ ভেঙে দিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ বিচারপতিদের মূল্যায়ন না করে জুনিয়র বিচারপতিদের গুরুত্বপূর্ণ বেঞ্চের দায়িত্ব পালন করতে দিতেন। যার ফলে শুধু বিচারপার্থীরাই নয় আইনজীবীরাও ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আর এ রকম শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি কি প্রধান উপদেষ্টার জন্য যোগ্য হতে পারেন? যিনি আদালতে ন্যায়বিচার করতে পারলেন না তিনি ষোল কোটি মানুষের জিম্মাদারি পালন করতে পারবেন কি?

ন্যায়বিচার করার শপথ নিয়ে যিনি বিচারকের আসনে বসেন তাঁর দায়িত্ব কত কঠিন জটিল তা কি আমাদের অনেক বিচারক-ই উপলব্ধি করেন না। অথচ মহানবী (সাঃ) বলেছেন- ৬৫ বছরের নফল ইবাদত অপেক্ষা একটি ন্যায়বিচার শ্রেষ্ঠ। "হযরত আব্দুল-াহ ইবনে আবু আউফা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একজন বিচারকের সাথে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ তিনি বিচারকার্যে জুলুম অত্যাচারের ঊর্ধ্বে থাকে, যখন তিনি জুলুম ও বে-ইনসাফী করেন তখনই আল-াহ তার থেকে পৃথক হয়ে যান এবং শয়তান এসে তার সাথী হয়ে যায়।" (তিরমিযী, ইবনে মাযা) "হযরত আয়েশা (রা:) হতে রাসূলুল্লাহ" (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ন্যায় বিচারক কিয়ামতের দিন এই আকাঙ্খা করবেন যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে সামান্য খেজুরের ফয়সালাও যদি তাকে পৃথিবীতে না করতে হতো, তবে কতই না ভাল হত।" (মুসনাদে আহমদ) এই চেতনা নিয়ে আদালত বিচার করত তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো কি?

আজ সর্বস্তরের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল উচ্চ আদালতও বিতর্কিত হতে শুরু করেছে। বিরোধী পক্ষ একদিকে বিতর্কিতর রায় ও দলীয়করণের অভিযোগ এনে বিদায়ী প্রধান বিচারপতির কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে এবং জ্যেষ্ঠতা লংঘনের অভিযোগে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেনকেও স্বাগত জানায়নি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। বিচারপতি খায়রুল হককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে না মানার ঘোষণাও দিয়েছে বিরোধী দল বিএনপি। তাহলে আমরা কি আবার কে.এম হাসানকে কেন্দ্র করে যেমনি ২৮ আক্টোবর রাজপথে লগি বৈঠা দিয়ে আওয়ামী লীগ মানুষ হত্যা করেছে সেই ভয়াবহতার দিকেই রওয়ানা হয়েছি?। রাজনীতিক এ খেলা বন্ধ হবে কবে?

রাজনীতির কালো ছায়া আজ যেন আমাদের বিচার বিভাগকেও বিতর্কিত করছে। ওয়ান-ইলেভেনের পর রাজনীতিবিদদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে উচ

www.amarboi.org

আদালতকেই গণ্য করা হতো। অনেক সমস্যা ও সংকটের পরও আটক অবস্থায় দুই নেত্রী ও দেশের রাজনীতিবিদরা উচ্চ আদালতে-ই গিয়েছিলেন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর বাড়াবাড়ির কারণে বিচার বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের আর দাঁড়ানোর জায়গাটুকু থাকবে কি? আমরা দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের রাজনীতিবিদদের নিকট থেকে আবারও আশংকা আর অনিশ্চয়তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আবারও লগি বৈঠা আর রাজপথে মানুষের রক্ত আর গোলাবারুদের গন্ধ খুঁজে পাচ্ছি। তাহলে এর সকল দায়দায়িত্ব সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক সাহেব বহন করবেন কি? জনাব হক সবার শাসন অবৈধ ঘোষণা করে নিজের শাসন পাকা করার স্বপ্ন আদৌ পূরণ হবে তো?

জনাব হকের সময় কে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন দেশের বিশিষ্ট জনেরা। সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেন, "সবচেয়ে খারাপ প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কাম্য নয়।"

ড. শাহদীন মালিক বলেছেন, "রাজনৈতিক দলগুলোর দূরদর্শিতা এবং আইনজীবীদের বিচক্ষণতার অভাবে হঠাৎ করে চরম অবস্থান তৈরি হয়েছে। এতে দেশের সাধারণ মানুষের অকল্যাণই হবে।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে রাজনৈতিক মেরুকরণ আগেও ছিল। বর্তমানে এটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। এজন্য সব দলই কম-বেশি দায়ী।"

সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, "তিনি তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের উপকারের পরিবর্তে দেশে সাংবিধানিক সংকট আর রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে গেছেন। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য একদিন তাকে জাতির কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম বলেন, তিনি সুপ্রিমকোর্টকে রাজনৈতিক দল ও সরকার এবং পার্লামেন্টের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার ঘোষক স্বীকৃতি একটি রায়ের মাধ্যমে দিতে হবে– এটা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। জাতীয় পার্টির অপর প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, "আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার প্রত্যাশায় বিদায়ী প্রধান বিচারপতি আদালতের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে গেছেন। তিনি ইতিহাসে বিতর্কিত ও খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।"

আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা এবিএম খায়রুল হক বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে তার সর্বশেষ কর্মদিবসটিও শেষ করলেন আওয়ামী লীগের কল্যাণে। জনাব হক মুখে বিচার বিভাগের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির ব্যাপারে সোচ্চার থাকার কথা বললেও আপিল বিভাগে ১০ হাজারেরও বেশি মামলা বিচারাধীন থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি।

যেসব রাজনৈতিক রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের কাছে তিনি সংবিধান-রক্ষাকর্তা বীর-বিচারক ও শতাব্দীর সেরা হিসেবে আবির্ভূত

www.amarboi.org

হয়েছেন। দলটির প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করার জন্য সংবিধানের যেই সংশোধন করেছিলেন- সেই চতুর্থ সংশোধনটির গা বাঁচিয়ে অন্যান্য প্রায় সব সংশোধনীকে আদালতের রায়ে অবৈধ ঘোষণা করতে জনাব হকের অবদান অনন্য ও অবিস্মরণীয়। জনাব হক বাংলাদেশের দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনের অবৈধ ঘোষণা করলেন শেখ মুজিবের বাকশালকে নিরাপদ রেখে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ করলেন কিন্তু নিজের জন্য প্রধান উপদেষ্টার পথটি নিরাপদ খোলা রেখে। সত্যিই বলতে হয় জনাব এবিএম খায়রুল হকের তুলনা ইতিহাসে তিনি নিজেই। এক সময় ইতিহাস-ই তার বিচার করবে ঠিক করবে ইতিহাসে তার অবস্থান।

শেষ কর্মদিবসে তার উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনকে (ট্রুথ কমিশন) অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখা, এবং পঞ্চাশজন বিচারকের জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে আপিল বিভাগে সরকারের নিয়োগ দেয়া দুই বিচারকের শপথ দান। যাদের মধ্যে একজন- বিচারক শামসুল হুদা একসময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গোপালগঞ্জ জেলার সভাপতি ছিলেন। এর আগেও সরকার কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত দুইজন বিচারক- যাদের একজন সুপ্রিম কোর্টে একটি ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত ছিলেন, এবং আরেকজন একটি দণ্ডযোগ্য হত্যা মামলার অভিযুক্ত ছিলেন- এমন দুই বিচারককে শপথ দিয়েছিলেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি।

সর্বশেষ গত ১১ মে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিষয়ে তার দেয়া রায়ে বেসিক স্ট্রাকচার তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক অবৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, অন্যদিকে আগামী দুইটি সংসদ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেই প্রয়োজনীয়তার মতবাদ দেখিয়ে। অর্থাৎ তারই দেয়া রায় অনুযায়ী 'অসাংবিধানিক' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পথ খোলা রাখলেন শুধুমাত্র নিজের জন্য। যার মধ্যে প্রথমবার এই অনির্বাচিত সরকারের প্রধান হওয়ার সুযোগটি পাচ্ছেন জনাব এবিএম খায়রুল হক নিজেই।

অবশ্য সুযোগটি তিনি নিজে একাকী তৈরি করতে পারেননি। সরকার জনাব হকের প্রতি উপহারস্বরূপ আবারো সুপারসিডের পথ অনুসরণ করলেন? জনাব হকের উত্তরসূরি হিসাবে যদি জ্যেষ্ঠ বিচারক শাহ আবু নাইম মোমিনুর রহমানকে যথানিয়মে নিয়োগ দেয়া হত তবে জনাব রহমানই হতেন আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কারণ, সেক্ষেত্রে জনাব হক নন, বরং জনাব রহমানই হতেন আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। কাজেই আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু জনাব রহমানের জ্যেষ্ঠতা ডিঙিয়ে রাষ্ট্রপতি একজন কনিষ্ঠ বিচারককে ২০তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিয়ে সেই আশঙ্কা বা সম্ভাবনা দূর করেছেন। নবনিযুক্ত প্রধান

www.amarboi.org

বিচারপতি জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন অবসর নেবেন ২০১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি। ফলে সর্বশেষ আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগে প্রধান বিচারপতি হিসাবে সবশেষে অবসর নেয়া জনাব হকই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন?

একই সাথে এই তত্ত্ব ও মতবাদের যুগলে আগামীতে যে রাজনৈতিক সঙ্কটের আশংকা তৈরি হয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এখন মনে হচ্ছে জনাব হক এক লাঠিতে অনেক সাপ মারলেন কিন্তু লাঠি ভাঙ্গেননি। আওয়ামী লীগের নিকট এখন জনাব হক সাহেবের সকল রায় ও সমীকরণ পক্ষে মনে হলেও এক সময় দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির নায়ক হিসেবে জনাব হককে জাতি চিহ্নিত করার সম্ভাবনাও কি উড়িয়ে দেয়া যায়? সংসদকে পাশ কাটিয়ে জনাব হকের এত অতি উৎসাহী রায়কে আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতারাই পছন্দ করছেন না। কিন্তু রাজনৈতিক সমীকরণে জনাব হক যদি প্রধান উপদেষ্টা হতে না পারেন, তাহলে গ্রাম্য প্রবাদ "আমও গেল ছালাও গেল" সেই প্রবাদই কি জনাব হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

মুহাম্মদ (সাঃ) কে কটাক্ষ করার আসল হেতু কী?

বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। এখানে নেই কোন বর্ণবিশেষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তের হলিখেলা, জ্বালাও পোড়াও, মসজিদ মন্দিরে আক্রমণের মত ন্যক্কারজনক ঘটনা। যা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এ জাতীয় ঘটনা ঘটছে অহরহ। এখানে সকল ধর্মের সবাই মিলে-মিশে বসবাস করছে দীর্ঘসময় ধরে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মৌলবাদী হিন্দুত্বের চেতনায় উদ্ভাসিত কিছু ব্যক্তিরা আমাদের দেশে ভালোই লম্ফ-ঝম্ফ করেন। আল্লাহ, রাসূল সা. আর ইসলামকে কটাক্ষ করে বসেন বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখনী, নাটক, আর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। সম্প্রতি সংঘটিত হওয়া কয়েকটি ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে গোটা জাতিকে। কারণ রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষই হয়, তাহলে মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামকে কটাক্ষ করার আসল হেতু কী? এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নিরপেক্ষতা? আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো নিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরা একরকম ভণ্ডামি। এই শক্তির আসল উৎস-ই বা কোথায়? কে এদের আসল ইন্ধনদাতা? এই প্রশ্নটি আজ বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের। এটি কি ধর্মনিরপেক্ষার বদৌলতে আমাদের প্রাপ্য? লক্ষণীয় বিষয় এবার আওয়ামী লীগ ৩০ জুন ২০১১ সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী গ্রহণ করে মূলনীতি থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস বাদ দেয়ার পরপরই মুহাম্মদ সা. ও ইসলামকে কটাক্ষ করার হিড়িক যেন আগের তুলনায় বাড়ছেই। এর প্রমাণ (ক) ১৪ জুলাই ২০১১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতৃভূমি টুঙ্গিপাড়া উপজেলার জিটি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস দশম শ্রেণীর ক্লাসে দাঁড়ি রাখা নিয়ে সমালোচনা কালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ছাগলের সাথে তুলনা করেন। পরে গোটা এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষক শঙ্কর বিশ্বাস এলাকা থেকে পালিয়ে যান। (খ) ২৬ জুলাই-১১ ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক মদন মোহন দাস মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এবং পবিত্র হজ্ব নিয়ে কটুক্তি করেন। সহকর্মী শিক্ষকদের এক সভায় তিনি মন্তব্য করেন এক লোক সুন্দরী মহিলা দেখলেই বিয়ে করে। এভাবে বিয়ে করতে করতে ১৫-১৬টি বিয়ে করে। মুহাম্মদও ১৫-১৬টি বিয়ে করেছে। তাহলে মুসলমানদের মুহাম্মদের হজ্ব করা স্থান মক্কায় গিয়ে হজ্ব না করে ওই ১৫-১৬টি বিয়ে করা লোকের বাড়িতে

www.amarboi.org

গিয়ে হজ্ব করলেইতো হয়।" (গ) ১ লা আগস্ট ২০১০ বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট পরিচয়? দানকারী জনৈক দেবনারায়ণ মহেশ্বর পবিত্র কোরআন শরিফের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। রিট আবেদনে তিনি দাবি করেন, হজরত ইবরাহিম (আ.) তার বড় ছেলে ইসমাইল (আ.) কে কোরবানির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন বলে যে আয়াত পবিত্র কোরআন শরিফে রয়েছে, তা সঠিক নয়। তিনি দাবি করেন, হজরত ইবরাহিম তার ছোট ছেলে হজরত ইসহাক (আ.) কে কোরবানি করতে নিয়ে যান। এ বিষয় সঠিক ব্যাখ্যা ও কোরআনের আয়াত শুদ্ধ করার জন্য দেবনারায়ণ মহেশ্বর আদালতের কাছে প্রার্থনা করেন। আদালত রিট খারিজ করে দেয়ার পর দেবনারায়ণের এই চরম হঠকারী ও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে আদালতে উপস্থিত আইনজীবীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুলিশ দেবনারায়ণ মহেশ্বরকে কর্ডন সহকারে এজলাস থেকে বের করে তাদের ভ্যানে প্রটেকশন দিয়ে আদালত এলাকার বাইরে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে যায়।

"২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৭ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ফতেহপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'হুজুর কেবলা' নামক নাটক মঞ্চায়িত হয়। নাটকে হযরত মুহাম্মদকে (সা.) লোভী আখ্যায়িত করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মিলে নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এ ঘটনায় স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা থানায় মামলাও করেন। এতে এক নাট্যকার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও এক সহকারী শিক্ষককে গ্রেফতারও করে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে চলতে থাকে চরম উত্তপ্ত অবস্থা।"

কিন্তু আশংকার বিষয় হলো সাতক্ষীরায় নির্যাতনের প্রতিবাদ শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের তাণ্ডব" সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' বাড়িতে লুটপাট ও নির্যাতনের অভিযোগে চার দফা দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের কয়েকশ' ছাত্র সড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ও বিক্ষোভ করে। ছাত্ররা সকালে হল থেকে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস ঘুরে পৌনে ১১টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে গাড়ির টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। কয়েকটি যানবাহনে আগুন দেয়ার কথা জানায় প্রত্যক্ষদর্শীরা। পৌনে ২টা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা এ অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভ চলে। এতে শাহবাগ থেকে মৎস্যভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্মগেট ও সায়েন্স ল্যাবরেটরিমুখী সড়কে যান চলাচল পুরোপরি বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানীর অন্যান্য সড়কেও এর তীব্র প্রভাব পড়ে। হাজারো যানবাহনের তীব্র যানজটে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা। চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বাসায় ফিরতে গিয়ে গরমের মধ্যে দুর্ভোগে পড়েন। তিন ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ ও আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রাখলেও ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল নীরব। সংখ্যালঘু অজুহাতে পুলিশকে অবরোধ তুলে দিতে কার্যত কোনো পদক্ষেপ

www.amarboi.org

নিতে দেখা যায়নি।" (আমার দেশ-০৬/০৪/২০১২) কিন্তু আমরা দেখেছি এ সরকার বিরোধী দলের ও ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবি কিভাবে পুলিশ ও দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে হামলা আর মামলা দিয়ে দমন করেছে। অথচ সংখ্যালঘু ছাত্ররা সড়ক অবরোধ, আগুন, ভাঙচুর বিক্ষোভ এবং কয়েকটি যানবাহনে আগুন দিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী রাস্তা অবরোধ করে রাখলেও ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল নীরব। সংখ্যালঘু অজুহাতে পুলিশকে অবরোধ তুলে দিতে কার্যত কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এটাই মনে হয় এ সরকারের পুলিশ বাহিনীর পরমসহিষ্ণুতার প্রথম দৃষ্টান্ত। এখন উল্টো মামলা দিয়ে সাতক্ষীরায় বিরোধী দল ও সাংবাদিক দমনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।

গত ৪ এপ্রিল-২০১২ রংপুর মেডিক্যাল কলেজে সকাল ১০টায় ৩৮ নম্বর ব্যাচের ওয়ার্ড সি গ্রুপের ক্লাসে পড়ানোর সময় চর্ম ও যৌন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা: এ কে এম নুরন্নবী লাইজু ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন 'তোমরা ওপরের (সিনিয়র) মেয়েদের দিকে নজর দেবে না, কারণ তাদের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। সব সময় তোমরা নিচের মেয়েদের দিকে নজর দেবে। তা হলে কাজ হয়ে যাবে।' এ সময় হাসান নামে এক ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন 'স্যার আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সা: তো হজরত খাদিজা রা:-কে বিয়ে করেছিলেন। তিনি তো সিনিয়র ছিলেন।' এর উত্তরে ওই চিকিৎসক তখন অত্যন্ত স্পর্ধা দেখিয়ে বলেন, 'আরে নবী তো খাদিজাকে বিয়ে করেছে অর্থের লোভে। শুধু তাই নয়, তিনি তার পালক পুত্র জায়েদের স্ত্রী জয়নবকেও বিয়ে করেছেন। এ জন্য আল্লাহর কাছে জোর করে ওহি নাজিল করে বৈধ করে নিয়েছে।' এছাড়াও তিনি এক ছাত্রকে উদ্দেশ করে বলেন, 'এই বল, আল্লাহ কী আছে রে! তা হলে দুনিয়াতে এত ইসলামি দল কেন? এত হানাহানি কেন?' এর আগের দিন সোমবার একই সময় ৩৯ নম্বর ব্যাচের ক্লাসেও ওই শিক্ষক শিক্ষর্থীদের উদ্দেশে বলেন 'এই আল্লাহ কি আছে? তার কী প্রমাণ আছে।' এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন ধরে ডা: লাইজুকে চাকরিচ্যুত, গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আসছেন তৌহিদি জনতা।

এ ঘটনায় স্বয়ং উদ্বেগ জানালেন মহাজোটের অন্যতম অংশীদার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। শুক্রবার জুমার নামাজের খুৎবার আগে নগরীর টার্মিনাল মসজিদে এরশাদ তার বক্তৃতায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, "অবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করে দোষী ডাক্তারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে তৌহিদি জনতা ঘরে বসে থাকবে না। তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই সরকারের সময়ে ইসলামকে অবমাননা করে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বেশি বলা হচ্ছে। বিষয়গুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান তিনি সরকারের কাছে।" (সূত্র; দৈনিক নয়া দিগন্ত) ২০০৯ সালের ২৮ মার্চ 'সন্ত্রাস নিরসনে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ

www.amarboi.org

আফজাল বলেছেন, পৃথিবীতে যত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রয়েছে, তার সবই ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে (!)। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত নয়। ২০১১ সালের ২ জুন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের অন্যতম নেতা মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শফিউল্লাহ দাবি করেন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, বিসমিল্লাহ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এ তিনটির বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।" প্রিয় পাঠকবৃন্দ তাহলে বলুন তো আল্লাহ, রাসূল সাঃ আর ই র বিরুদ্ধে কটূক্তির মূল হোতা কারা। এরা মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরা ইসলামবিদ্বেষী শফিউল্লাহ, আফজাল, মেনন ও ইনুরা।

এদিকে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন-"সারা দেশে আবার জঙ্গিবাদী ও মৌলবাদীদের অপতৎপরতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রেলমন্ত্রী বলেন, "আমরা গত সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জঙ্গিবাদী ও মৌলবাদীদের পরাজিত করলেও বর্তমান সময়ে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয় আবার সক্রিয় হচ্ছে তারা। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন, সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা প্রমুখ। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর-উত্তম। (কালের কণ্ঠ, ৭ এপ্রিল-২০১২) এবার দেখুন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর সি আর দত্ত বীর-উত্তম উত্তরসূরিরা ধর্মনিপেক্ষতার আড়ালে ভারতে কিভাবে মুসলমান নিধন করছে তার নমুনা। যারা আজ সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা নাটক সাজিয়ে হুঙ্কার ছুড়ছে রাস্তা অবরোধ করছেন। তাদের দাদাবাবুদের দেশ ভারতে কী নির্মম ও পৈশাচিক আচরণ করছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে। তার সামান্য নমুনা দেখুন-

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যেই ভারতে মোট ৮৯৪৬টি মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে এবং ভারতীয় হিসাবেই এতে নিহত হয় ৮৯৬৫ জন এবং আহত হয় ৪৭৩১১ জন মুসলমান। (ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা ফ্রন্টলাইন ১৫ নভেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যা) হিন্দু প্রধান ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা সব সসয় বিঘ্নিত হচ্ছে। এক শ্রেণীর উগ্রবাদী হিন্দু মুসলিম নিধনের মানসে সবসময়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমেই উস্কানিমূলকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে রক্ত-পিপাসু হিন্দুদের। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক নীরদ সি. চৌধুরী শারদীয় সংখ্যায় বাংলাদেশকে তথাকথিত বাংলাদেশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন- "একজন মুসলমান পাঠান হতে পারে, তুর্কী হতে পারে,

www.amarboi.org

মুঘল হতে পারে, কিন্তু কখনই ভদ্রলোক হতে পারে না।"

গুজরাটের স্টেশনে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগের একটি সাজানো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একশ্রেণীর উগ্র হিন্দু যে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক নৃশংসতা চালায় তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। তাদের এই পৈশাচিক ঘটনায় আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা মায়ের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে সেই মায়ের সামনে শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। ১৬ এপ্রিল ২০০২ দিল্লির মুসলিম উইমেন ফোরামের সৈয়দা হামিদ, ব্যাঙ্গালোরের ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অব হিউম্যান্স রউথ মনোরমা, আহমেদাবাদের শিবাজর্জ, দিল্লির ফিন্যান্স সাংবাদিক ফাহারহ নাকভির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩ মে ২০০২ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে মর্মস্পর্শী ঘটনাটি। এ হৃদয়বিদারক বিবরণ দিয়েছেন কুলসুম বিবি, রেশমা বেগমসহ অনেকেই। আহমেদাবাদের জওয়ান নগরের পেছনে ছাড়া বস্তির তের বছরের আজহার উদ্দিনের বর্ণনায় 'আমি গুড্ডু ছাড়াকে দেখেছি ফারজানাকে ধর্ষণ করতে। পরে তাকে পোড়ানো হয়।' ১২ বছরের নুরজাহানও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। ধর্ষক গুড্ডু, সুরেশ, নরেশ ও হরিয়া উলঙ্গ উন্মুক্ত সিংহরা ছুটে চলেছে মুসলিম নিধনে।

রাজ্য পরিবহনকর্মী ভবানী সিংকে দেখেছি একটি বালক ও পাঁচজনকে হত্যা করতে। আব্দুল ওসমান বলেছেন, তারা আমার ২২ বছরের মেয়েসহ এলাকার মা-মেয়েদের নগ্ন করেছে। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমার স্ত্রীসহ আমার পরিবারের ৭ সদস্যকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আমি হারিয়েছি আমার পরিবারের সকলকে। এই নগ্নতা দেখে মনে হয় ঐ হিন্দু যুবকদের জন্ম কোনো মায়ের ঔরশে নয়। সুলতানি জানায় তারা আমাদের গাড়ির গতিরোধ করে। আমার কোলে ছিল আমার ছেলে ফৌজান। চারদিক থেকে সশস্ত্ররা ছুটে আসে আমার দিকে। শত শত মানুষের সামনেই আমার সম্ভ্রমহানি করা হয়। সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করাই যেন ভাল ছিল। আর তাদের এই পালাক্রমের নির্যাতনে এখন যে আমার ছোট্ট শিশু ফৌজার ছিটকে পড়েছে তা আমি জানি না। কিন্তু যতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আমি আমার শিশুটির কান্নার আওয়াজ 'মা মা' শব্দ শুনছিলাম। পঞ্চমোহন জেলার মদিনা জানান, আমার শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। আমরা সবাই পালিয়েছি কিন্তু তিনি মনে করেছেন তাকে কেউ কিছু করবে না। কিন্তু তাদের হত্যার শিকার হয়েছেন তিনি। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর মোতাবেক সাম্প্রতিক দাঙ্গায় সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে শত শত মুসলমানকে। নিহতদের মধ্যে একজন সাবেক এমপি-ও রয়েছেন। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ- রাজ্যের চৌদ্দ হাজার মুসলমান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রায় ৯০ ভাগই প্রাণের ভয়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেনি। তাদের মূল্যবান একটি শিক্ষাবছর এমনিভাবেই খসে পড়ল তাদের জীবন

www.amarboi.org

থেকে।

ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী ভারত ১৯৭৪ থেকে এ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমর্থ হয়নি একদিনের জন্যও। সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমালের মূল্য সেখানে পানির চেয়েও সস্তা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে ভারতে এই ধর্মনিরপেক্ষতা কি শুধু একটি খোলস মাত্র? ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরা হয়েছে কি শুধু মুসলমানদের কচুকাটা করার জন্য? ভারতে প্রতি বছর গড়ে ২৬৫টি বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯০৫টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের মার্চ খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিস্তারিত তালিকা প্রদান করে দেখান। ভারতে উগ্রবাদী হিন্দুরা ভারতের সুপ্রিমকোর্টের রায় অমান্য করে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার বুকের উপর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে কিন্তু ভারত সরকার সুপ্রিমকোর্টের রায় ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক পত্রিকা টাইমস- এ "ওদের জ্বালিয়ে দাও" শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকারে শিবসেনা নেতা বালথ্যাকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন-মুসলমান নয়, ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। মুসলমানরা যদি ভারত থেকে চলে যেতে না চায় তাহলে ওদের লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "Historical Role of Islam" গ্রন্থে তিনি বলেছেন- "ভারতের বেশিরভাগ মানুষই গোড়া হিন্দু।" মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে "শ্লেচ্ছ", "অশুতি", "বর্বর"। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্ত তার চেয়ে ভাল ব্যবহার এদের বিচারে কোনো মুসলমানেরই প্রাপ্ত নয়।"

এই হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সামান্য নমুনা। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অন্তত ৯০ শতাংশ যে জন্মসূত্রে মুসলমান এ নিয়ে সম্ভবত কোন বিতর্ক নেই। সেই দেশে অব্যাহতভাবে ইসলাম, কোরআন, হাদিস এবং মহানবী (সা.) কে কটাক্ষ করার ফলে ইসলাম বিদ্বেষ এখন এমপি-মন্ত্রী আর সরকারের কতিপয় ব্যাক্তির এটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিমোহিত হয়ে যারা আমাদের সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা সরিয়ে ফেলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। তার জন্য বিরোধী দল নয়, একদিন আল্লাহর আদালতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জবাবদিহি করতে হবে। তাছাড়া সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা লেখা থাকলেই যে জনগণ অসাম্প্রদাযকি চেতনায় বিশ্বাসী হয় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রতিবেশী ভারত। উপরে তার যৎসামান্য উদাহরণ থেকে আমাদের আর বুঝতে বাকি আছে কি?।

অপরদিকে সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস লিপিবদ্ধ

www.amarboi.org

থাকলেই যে দেশের নাগরিকরা সাম্প্রদায়িক হয় না, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মিলে-মিশে থাকা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত হয়ে আসছে এখানে। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ঘৃণ্য কৌশল হিসেবে ক্ষমতাসীনরা ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে ইসলামবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের এই শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলবেন না। কিন্তু সম্প্রতি সাতক্ষীরা, রংপুরসহ কয়েকটি স্থানের ঘটনা দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়া তুলে ঢাবির হিন্দু ছাত্রদের তাণ্ডব আর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সাহেবদের বক্তব্য যেন ষড়যন্ত্রের-ই আলামত বহন করে। আমরা অবশ্যই চাই এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলাম সম্পর্কে এমন কটূক্তি কেউ করতে না পারে। কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রচেষ্টা মোটেই কাম্য নয়।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

পরমসহিষ্ণুতায় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতপ্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রে বিরোধী দল অবশ্যই থাকবে সরকারব্যবস্থার প্রয়োজনে ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই। বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মেনে না নিলে তা গণতান্ত্রিক শাসন হতে পারে না। জনগণ সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারবে। এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি জনমত। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "তোমার মতামতের সাথে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার আমি জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।" দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল বিগত দিনে জরুরি সরকারের লেবাসে দেশের তথাকথিত সুশীলসমাজের প্ররোচনায় বিদেশীপ্রভুদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১/১১ সুড়ঙ্গ পথ ধরে এক মহাদানব আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। সংস্কারের নামে দেশকে রাজনীতিশূন্য করার ষড়যন্ত্র, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে, গ্রেফতার, হামলা-মামলা চাঁদাবাজি, হিংসাত্মক প্রতিশোধ, সবাইকে হেয়প্রতিপন্ন করার যে মহোৎসব হয়েছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সকলেই বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও রাজনীতিবিদরা এর নির্মম শিকার। অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, দেশের সচল অর্থনীতির গতিকে পিছিয়ে দিয়েছে ২০টি বছর। আর এ আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ২৯ ডিসেম্বর '০৯ অংশগ্রহণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। প্রত্যাশা ছিল গণতন্ত্রের উত্তরণ। দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ মনে করেছিল মহাজোট সরকার বিগত ২ বছরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। কিন্তু দেখা গেল আওয়ামী লীগ বিগত কয়েক মাসে বিডিআর হত্যাকাণ্ড, টিপাইমুখ বাঁধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার, দক্ষিণ এশিয়া টাস্কফোর্স, ভারতের সাথে গোপন চুক্তি, এশিয়ান হাইওয়ে সংবিধান সংশোধনী তথাবথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শিক্ষানীতিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেনতেন নীতি অবলম্বন করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া পরমতসহিষ্ণুতায় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি আজ গণতন্ত্রের প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের কথা কাজ ও আচরণে কোন সময়ই তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা। একদেশ, একনেতা এবং এক দলে বিশ্বাসী চেতনা, যেখানে বিরোধী দলের কার্যপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন সময়ে বিরোধী বা প্রতিবাদী ব্যক্তির দলের উদ্ভব হলে অংকুরেই তা বিনষ্টের ব্যবস্থা করা হয়।

www.amarboi.org

আওয়ামী লীগের দলের অভ্যন্তরেও গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতান্ত্রিকতাই প্রাধান্য দিয়েছে বলেই আওয়ামী লীগের পেট চিড়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের সকল বাম সংগঠনগুলো। প্রতিপক্ষকে সহ্য করার ঘটনা আওয়ামী অভিধানে নেই। তার এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন বিদেশী সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড বই এর ৫২ পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন- "ঘটনা চক্রে মাওপন্থী নেতা সিরাজ সিকদার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি একটা এলাকা থেকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলেন। তাকে পাহারা দিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো শেখ মুজিবের সংগে দেখা করানোর জন্যে। শেখ মুজিব তাকে তার আয়ত্তে আনতে চাইলেন। কিন্তু শিকদার কোন রকম আপস- রফায় রাজি না হলে, মুজিব পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে দিলেন। সিরাজকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় রমনা রেসকোর্সের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ সময়ে সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় যে, পালানোর চেষ্টা কালে সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।" পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করে দেখুন আওয়ামী লীগই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্রসফায়ারের আবিষ্কার বলা যায়।

এতোদিন দেশের মানুষ মনে করেছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল বাকশাল কায়েম। আওয়ামী লীগ তার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু না। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বললেন- আওয়ামী লীগ এখনো আস্থা বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনায় বাকশাল লালন করে। অতএব জনগণের বুঝতে আর বাকি নেই আওয়ামী লীগ এখনো বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তার প্রমাণ বিরোধী দলের উপর জুলুম, নির্যাতন, হামলা, মামলা আর আমার দেশ ও চ্যানেল ওয়ান বন্ধ করে দেয়া। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর আওয়ামী লীগ খড়গহস্ত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক, সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমানের মত সম্মানিত ব্যক্তির কারাবরণ আর প্রতিনিয়ত সাংবাদিক নির্যাতন।

আওয়ামী লীগের এই অ-গণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মওলানা ভাসানী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সনে পল্টন ময়দানে বলেন, সরকারকে হঠাতে হলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন। তিনি বলেন, তার বয়স ৯১ বয়স না থাকলে তিনিই এই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি আরো বলেন, যারা বিপ্লব করবেন তাদের জন্য আমি দোয়া করি।

দার্শনিক রাফায়েলের কথায়, An essential feature of democratic government is that it is a government through discussion. শাসক ও শাসিতের মাঝে আলোচনা সুসম্পর্ক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিকতায় তা উপেক্ষিত। অথচ সমতা ও আইনের শাসনের কথা সবচেয়ে বেশি বলে আওয়ামী লীগ। আর আইনের শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে A. V. Dicy (এ. ভি. ডাইসি)

www.amarboi.org

তিনটি কথা বলেছেন। তাহলো ক. সেখানে কোন স্বৈরাচারী ক্ষমতা থাকবে না। (Absence of arbitrary power) অথচ বিরোধী দলও মতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা-মামলা নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসূচি। এ ছাড়া ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি-বাণিজ্য লুটপাট আর পাবনা ডিসিসহ কর্তাব্যক্তিদের ওপর হামলা, নাটোরে উপজেলা চেয়ারম্যানকে পিটিয়ে হত্যা, সারাদেশে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন গোটা দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে।

খ. আইনের চোখে সমতা, (Equality before law) সরকার আইনের সমতার কথা বললেও ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অ-সমতাই চলছে এখন। পুলিশ ও র‍্যাবকে দলীয় বাহিনীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে, রিমান্ডের নামে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছে অনেককে। "গুম করে হত্যা" ক্রসফায়ারে দিয়ে মানুষ মারার আরেকটি নতুন সংযোজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের কারণে নিহত হয়েছে উনিশজন তরুণ মেধাবী ছাত্র। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। চিরুনি অভিযানের নামে ছাত্রশিবিরের হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতার, রিমান্ডে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের নির্যাতনে অনেককে পঙ্গু করা হয়েছে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে। সরকার আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত, এর নির্মম শিকার বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমানের এর সুযোগ্য পত্নী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে কালো আইন দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার শিকার সাবেক সফল মন্ত্রী, দুর্নীতি দেশ গড়ার সফল কারিগর, বিশ্বনন্দিত জননেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক বিবেচনায় কেবল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের মামলা বাতিল আইনের শাসনের প্রতি আরেক চপেটাঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। আমি মনে করি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বিরোধী দলকেও এমন সুযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় কিন্তু সেতো শুধু কল্পনা। ক্ষমতায় এসেই আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই বিতর্কিত সুবিধা গ্রহণ করে দেশ শাসন শুরু করেছেন। গ. নাগরিক অধিকার (Citizens right) মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এ জনদুর্ভোগ আর দ্রব্যমূল্যে জনগণের নাভিশ্বাস, সরকার গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কথা হলো শক্তি নয়, যুক্তি। নিজের মত প্রকাশের যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনি অন্যেরও মত প্রকাশের অধিকার আছে। লগি-বৈঠার ভয় দেখিয়ে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির সাথে গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই নগ্ন প্রকাশ ঘটছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, গত ছয় মাসে সারাদেশে হত্যাকাণ্ডসহ ১৭ হাজার ৫৭৭টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অথচ এই অক্টোবরে নাটোরে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে সাপ মারার মতো পিটিয়ে

www.amarboi.org

বড়াইগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা সানাউল্লাহ নূর বাবুকে হত্যা করার পর সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ঘোষণা করলেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো অবনতি হয়নি। এর আগে সরকারদলীয় এক এমপির লাইসেন্সকৃত পিস্তল থেকে গুলি করে হত্যা করা হলো নিজ দলেরই কর্মী ইব্রাহিমকে। তাকে বাঁচাতেও নানারকম কৌশল অবলম্বন এখনও অব্যাহত আছে। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর- এই নয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৬৫ জন নিহত ও ১১ হাজার ৩০২ জন আহত হয়েছেন। এই নয় মাসে সাংবাদিকেরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এ সময়ে তিনজন সাংবাদিক নিহত, ৬৬ জন আহত, ৪২ জন হুমকির সম্মুখীন ও ৩৩ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন। ১৭ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা, দু'জন গ্রেপ্তার, ১২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ৪৭৬টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩১ জন নিহত ও চার হাজার ৫৮২ জন আহত হয়েছেন। কাজেই দেশের মানুষ চরম এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে অনিশ্চয়তার জীবন অতিবাহিত করছে। ২৮ অক্টোবরের লীগ-বৈঠাধারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকলেও তা রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ দেয়ার উদ্যোগ সরকারের নব্য বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। শহীদের রক্ত কথা বলে, এর আছে নিজস্ব এক শক্তি। ২৮ অক্টোবর ও ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি সেনাসদস্যদের রক্তের বেড়াজাল থেকে আওয়ামী লীগ কখনও রেহাই পাবে না।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আইনের শাসনের বাস্তব প্রতিফলন অপরিহার্য। তিওডোর পার্কার বলেন, চিন্তা করার, কথা বলার, কাজের এবং উপাসনা করার স্বাধীনতা থাকবে এ হবে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ। জনগণের রায় যেহেতু ক্ষমতার মূলভিত্তি তাই গণতন্ত্রে সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না। জনসাধারণের মতের বা স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করলে সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। আবার সরকার স্বৈরাচারী হলে জনগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে । প্রয়োজনে জনগণ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে। এটি জনগণের অধিকার। সরকার এই জনরোষ থেকে বাঁচতে বেছে নিয়েছে পুলিশি দমন পীড়নের। বাংলাদেশ এখন একটি পুলিশি রাষ্ট্র। সরকারের দমন নিপীড়নের পথ জনগণকে খুব দ্রুত সংগঠিত হতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস তাই বলে।

বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রই আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা উন্নত শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র অপেক্ষা কোন ব্যবস্থা যদি উন্নততর অধিকতর উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠতর থেকেও থাকে তবে তা আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। এজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্থবহ ও সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা, রাজনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং স্ব স্ব অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাদের অধিকার আদায় ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল অপচেষ্টার মোকাবেলায় জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হবার অদম্য বাসনা। সেটাই হোক আজ আমজনতার শপথ।

● দৈনিক সংগ্রাম

www.amarboi.org

কুরআনের আন্দোলন
জুলুম নির্যাতন চালিয়ে স্তব্ধ করা যায় না

বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ আল-কুরআন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুরআন বিশ্বকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করলো। কুরআন মানুষকে বাতলে দিল শান্তির পথ। ফলে পথহারারা এলো পথে আর বর্বর হলো সভ্য। এই গ্রন্থটি পাল্টে দিল দুনিয়ার কায়া। মূর্খকে জ্ঞানী, অত্যাচারীকে হৃদয়বান এবং খোদাহীনকে আল্লাহভীরু, শোষককে সেবক আর ভক্ষককে বানাল রক্ষক। এ যেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শক্তি, সৌন্দর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত কুরআন নিজেই। Al Quran the Ultimate miracle. প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক টলস্টয় বলেন, "কুরআন মানবজাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিকদর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটিমাত্র গ্রন্থ থাকত এবং কোনো সংস্কারই না আসতো এ পৃথিবীতে তবু ও মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য কুরআন-ই ছিল যথেষ্ট।" কুরআন নিজেই নির্ভুলতার স্বীকৃতি দিয়ে পরিচয় তুলে ধরেছে।

চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে বিশ্ববাসীর সামনে। আজ বিজ্ঞানের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কুরআনের সেই চ্যালেঞ্জ,এখনো কেউ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. রাশেদ খলিফা কম্পিউটারের কাছে জানতে চান, আল্লাহর দেয়া নিখুঁত ১৯ সংখ্যার বুননে কোন গ্রন্থ মানুষ কি আবিষ্কার করতে পারবে? উত্তরে তিনি বললেন এর সম্ভাবনা হলো- ৬২৬, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০:১ ।

কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে- "আমি আমার বান্দার (দাসের) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান করো।" (২ : ২৩) ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ চ্যালেঞ্জ কেউ কেউ গ্রহণ করলেও সফলকাম হতে পারেনি। সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল লাবিদ বিন রাবী'আর, যিনি তার শক্তিশালী ভাষা ও তেজোদীপ্ত ভাবের জন্য সমগ্র আরবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে একটি কবিতা রচনা করেন, যা কা'বা শরীফের চৌকাঠের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। তখনকার দিনে শুধুমাত্র অতি মর্যাদাসম্পন্ন কবিদের কবিতার

www.amarboi.org

প্রতিই অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। কিন্তু এ ঘটনার পর পরই কোনো একজন মুসলমান কুরআনের একটি সূরা লিখে ঐ কবিতার পাশেই ঝুলিয়ে দেয়। লাবিদ (যিনি তখনও মুসলমান হননি) যখন পরের দিন কা'বার দরজায় এলেন এবং ঐ সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন তখন তাঁর প্রথম কয়েকটি আয়াত (পঙক্তি) পাঠ করার পরই তার মধ্যে এমন এক অস্বাভাবিক ভাবান্তর দেখা দিল যে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'নিঃসন্দেহে এটা কোনো মানুষের কথা নয় এবং আমি এর ওপর ঈমান আনলাম।' শুধু এখানেই শেষ নয়, আরবের ঐ বিখ্যাত কবি কুরআনের ভাব ও ভাষা থেকে এতবেশি প্রভাবিত হন যে, সেদিন থেকে তার কবিতা রচনারও পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী সময়ে একদা হযরত উমর (রা.) তাকে কবিতা রচনার প্রতি আহ্বান জানালে তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন আল্লাহতায়ালা আমাকে 'সূরা আল বাকারাহ' ও 'সূরা আলে ইমরান'-এর মত বাণী দিয়েছেন তখন কবিতা রচনা আমার জন্য আর শোভা পায় না। যামাদ আযদী নামক জনৈক আরব একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসে। তখন পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শুনান। সে এটা শুনে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে তার মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে পড়ে একটি পঙ্ক্তি, যার অর্থ হলো- "খোদার শপথ, আমি জ্যোতিষীদের কথা, জাদুকরদের মন্ত্র এবং কবিদের কবিতা শুনেছি। কিন্তু তোমার কথা যেন অন্য আরো কিছু- এটা সমুদ্রকে পর্যন্ত প্রভাবিত করবে।"

এর মাধ্যমে প্রমাণিত কুরআনের নূরকে নির্বাপিত করতে এসে অনেকেই এই গ্রন্থের কাছে নতি স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করার ইতিহাস রয়েছে অনেক। আর আবু জেহেল আবু লাহাবের উত্তরসূরিও আছে আজকের এ সময়েও। কেয়ামত পর্যন্ত হক ও বাতিলের এ লড়াই আব্যাহত থাকবে।

আল্লাহর ঘোষণা-, "এরা (কাফেররা) তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহর ফয়সালা হলো তিনি তার নূরকে প্রজ্বলিত করবেন।" (সূরা সফ : ৮) কুরআনের আন্দোলনকে নির্বাপিত করার সেই ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১১ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ঠিক তেমনই একটি ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে।

১৯৮৫ সালের ১০ এপ্রিল ভারতীয় দু'জন উগ্রবাদী হিন্দু পদ্মমল চোপরা ও শীতল শিং ভারতীয় আদালতে কুরআন বাজেয়াপ্ত করার মামলা দায়ের করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াত ও সূরা তাওবার ৩১ নম্বর আয়াতের রেফারেন্স দিয়ে। 'কুরআন যেহেতু কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের হত্যা করার কথা বলেছে সেহেতু কুরআন একটি সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা গ্রন্থ।' (নাউজুবিল্লাহ) ভারতীয় সংবিধানের ২২৩ নং ধারা সিআরপিসি ১১৫(ক) ও ২৯৯(ক) উদ্ধৃতি দিয়ে তারা কুরআনকে ভারতীয়

www.amarboi.org

সংবিধানবিরোধী বলে উল্লেখ করে। বিচারপতি পদ্ম খাস্তগীর ভারতীয় সংবিধানে ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে তা আড়াল করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করে এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে এফিডেভিট প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় গোটা ভারত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের প্রতিটি জনপদ প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ইসলামপ্রিয় তৌহিদি জনতার মিছিলে অত্যাচার, নিপীড়ন চালায়। আহত, নির্যাতিতদের গ্রেফতার এবং হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলার শিকার হন কুরআনপ্রেমিক মানুষেরা। সেই সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব হোসাইন আহমদ একটি সভার আহ্বান করেন এবং ১১ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে বিকেল ৩টায় প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। সভার প্রস্তুতির জন্য পুরো জেলাতে লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হয়। এর আগের দিন শুক্রবার মসজিদে জুমার খুৎবায় এবং নামাজ শেষে ইমাম সাহেবেরা পরদিন সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু ১১ মে হঠাৎ করে প্রশাসন উদ্যোক্তাদের জরুরি তলব করে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে তাদেরকে সমাবেশ না করার জন্য মুচলেকা দিতে বাধ্য করেন। প্রতিবাদ সভা করতে প্রশাসন বাধা দিচ্ছে এমন খবরে উত্তেজিত জনতার মাঝে অদম্য স্পৃহা আরো বেড়ে যায়। বাঁধভাঙা জোয়ারের মত হাজার হাজার জনতা ঈদগাহের দিকে আসতে থাকে। তৎকালীন পুলিশ সুপার কুলাঙ্গার আওলাদ হোসেন এবং কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এখানে কোন সভা হবে না বলে নিজেরাই ঘোষণা দেয়। আবেগে উদ্বেলিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ইতিহাস সাক্ষী জনতার জোয়ার পুলিশের বন্দুকের নল, লাঠি বুলেট টিয়ার, আর জলকামান, দিয়ে রোখা যায় না। বরং এ আক্রমণ শক্তি জোগায় জীবন দেয়ার।

ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লা দম্ভ করে চেঁচিয়ে ওঠে। বলে, এই মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করতে হবে নইলে গুলির আদেশ দেবো, "শালা মৌলবাদীদের সাফ করে দেবো"। উত্তেজিত জনতা উচ্চকিত আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দিলো।" গুলির ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করা মানেই আল কুরআনের অপমান। আমরা জীবিত থাকতে এ স্থান ত্যাগ করবো না।" সেদিন জনতার এই আন্দোলনের অগ্রসেনানী ছিল বাংলার মুক্তিকামী তৌহিদি ছাত্র-জনতার প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। কুরআনকে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে শুরু হয়েছিল এই কাফেলার যাত্রা, তারা তাদের সকল কর্মীবাহিনী নিয়ে ঈদগাহ ময়দানে শামিল হয়েছিল কুরআন অবমাননার প্রতিবাদ জানাতে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিলের মাধ্যমে তারা ঈদগাহ ময়দানে জমায়েত হয়। এক পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান বিনা উসকানিতে গুলির নির্দেশ দেয়। পুলিশ একনাগাড়ে প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত

www.amarboi.org

গুলি, রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। মানুষরূপী এই হায়েনাদের নির্মমতায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়লো পনের বছরের কিশোর ছাত্রশিবিরের স্কুলকর্মী আব্দুল মতিন, কৃষক আলতাফুর রহমান, রিকশাচালক মোক্তার হোসেন, দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রশিবিরের কর্মী রাশিদুল হক, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রশিবিরের কর্মী শীষ মোহাম্মদ ও সেলিম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শাহাবুদ্দিন। আহত হয় শামীম, গোলাম আযম বুলু, শরীফুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, মানিক রায়হান, এনামুল হক, মাহবুব, রেজাউল, শাহজাহান, রাজুসহ নাম না জানা আরো অনেকেই। লাশ আর আহতদের স্তূপে ভরে গেল ঈদগাহ ময়দান। শহরের অভ্যন্তরেও গুলি চালাতে থাকে পুলিশ বাহিনী। টুপি, পাঞ্জাবি, দাড়ি দেখলেই নির্মমভাবে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এই চাঁপাইনবাবগঞ্জেই ২০১০ পুলিশের অফিসার নজরুলের বুলেট কেড়ে নিয়েছে রাজশাহী কলেজের মেধাবী ছাত্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হাফিজুর রহমান শাহীনের জীবন।

১১ মে শহীদ ও গাজীদের রক্তে লালে লাল হয়ে যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের পিচঢালা কালো পথ। আহতদের চিকিৎসা জন্যে রাজশাহীতে নিয়ে যাওয়া দুটো মিনিবাস রওয়ানা হলে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট আবারো গাড়ি থামিয়ে গুলির নির্দেশ দেয়। কেবল হত্যা ও জখম করেই ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ, হতাহতদের গুম করে ফেলেছিল সেই দিন। জানাজার মুহূর্তে লাশ কেড়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে। এটি কি ভাবা যায়? এ ঘটনা বলে দেয় সেদিনের চিত্র কতো ভয়াবহ , কতো নির্মম, কতো বর্বর আর কত জঘন্য। এ যেন চেঙ্গিশীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। কারফিউ জারি করা হলো গোটা শহরে। শুরু হলো সেনা টহল। সামরিক জান্তাদের নাজেহাল আর শোকাহত মানুষ মিলে যেন এক মৃত্যুপুরী।

ইতিহাসের বর্বরতম এ ঘটনা পরদিন পত্রিকায় ছাপা হলো না। কারণ সেন্সরশিপ অর্ডিন্যান্স জারি করে পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হলো। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেয় আবার সেই পুরনো বাকশালী কায়দায়। যা এখনো চলছে অব্যাহতভাবে। ১৩ মে সরকার একটি প্রেসনোট করে আসল ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করল। তাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী হতবাক হলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে যেখানে শহীদের সংখ্যা ১১, অসংখ্য নিখোঁজ আর হাজার হাজার জনতা আহত। কিন্তু সেখানে প্রেসনোটে শহীদের সংখ্যা বলা হয়েছে মাত্র ৬।

বিক্ষুব্ধ জনতার জোয়ার মিডিয়ার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী। পরদিন আহ্বান করা হয় হরতাল। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বাজারে ও মসজিদে লিফলেট বিলি করা হয়। গভীর রাতে কারফিউ ভঙ্গ করে সাইকেলে চড়ে হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক ডিসি এ কে এম. শামসুল হক, এসপি আওলাদ হোসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লাসহ খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে। কিন্তু না! আজো তাদের শাস্তি হয়নি। বরং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার খুনি ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লাকে পুরস্কৃত করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান

www.amarboi.org

করেছে। সেদিন মানুষ প্রমাণ করল কুরআনের আন্দোলন জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে স্তব্ধ করা যায় না। পরবর্তীতে ছাত্রশিবিরের ডাকে ১৪ মে সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও ১৫ মে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচি একই সাথে সারা বিশ্ববাসীর প্রতিবাদের মুখে ১৩ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিকে বি সি বাসক বামন উক্ত মামলাটি খারিজ করে দেন। আর তখন থেকেই ছাত্রশিবির ১১ মে দিনটি ঐতিহাসিক 'কুরআন দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি এবং তার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা মুজাদালা : ২১) আল্লাহর রাসূল সাঃ সত্যি সত্যি কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড আল্লাহর রাসূলের অধিকারে এসে গেল। সামান্য কয়েকজন নিঃস্ব গরিব লোক, এ সমস্ত লোককে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল যারা সংখ্যায় ছিল অধিক, সময় ও পরিবেশ ছিল যাদের অনুকূলে এবং যাদের কাছে ছিল উন্নত সমরাস্ত্র ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য। জে. ডব্লিউ, এইচ. স্টোবার্ট (J. W H. Stobart)-এর ভাষায় :"তাঁর কাছে, উপাদান-সামগ্রীর যে স্বল্পতা ছিল এবং তিনি যে বিরাট ও বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করেছেন সে অনুপাতে বিচার-বিবেচনা করা হলে, সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন একটি উজ্জ্বল নাম দৃষ্টিগোচর হবে না যেমনটি ছিল আরবী নবীর।"

আজকের এ সময়ে আমেরিকার চার্চে কুরআন পুড়িয়ে খ্রিস্টান পাদরি মনের ঝাল মেটাতে পারেন বাংলাদেশেও শত নির্যাতন চালিয়ে মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন মুছতে পারবে না। কুরআনকে সংরক্ষণ করার ঘোষণা আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন "নিশ্চয়ই আমি এ বাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হিফাযতকারী।" পৃথিবীর অবিকৃত পবিত্র গ্রন্থের অনুসারী এখন প্রায় ১৩০ কোটি। যুগে যুগে এর মুখস্থকারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ৫০ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সের কোর্ট মহিলাদের হিজাব পরিধান করা নিষিদ্ধ করলেও টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা লরেন বুথ ইসলাম গ্রহণ, স্কার্ফ মাথায় দিয়ে গর্ববোধ করছেন। সম্প্রতি জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা বলেছেন, জার্মানি ইউল বিকাম এ ইসলামিক স্টেট। ১/১১-এর পর সবচেয়ে বেশি লোক আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং কুরআন বিক্রি বিগত ১৮ বছরের তুলনায় বেশি, এসব বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে।

পাশাপাশি কুরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত। কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যেভাবে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, আজও আবার বাংলার কুরআনপ্রেমিক দামাল ছেলেদের গর্জে উঠতে হবে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মীর জাফরদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ইসলাম রক্ষার ঐতিহাসিক সংগ্রামে। আর আওয়ামী লীগকে শতবার ভাবতে হবে, যে দেশে আমজনতা কুরআনের জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা, সেই দেশের সংবিধান থেকে "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, ফতোয়া, হিজাব, ধর্মশিক্ষা, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি বাস্তবায়ন করতে?

● সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ছাত্র সংবাদ

www.amarboi.org

মহাজোটে
মহা বিপদ সংকেত

আমরা কাগজে কলমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও, গণতন্ত্র কখন কখনও এখানে থাকে একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশ সম্ভবত এখন সেই ক্রান্তিকালই অতিক্রম করছে। কারণ আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু কাজে স্বৈরাচারী। বিশ্বাসে বাকশাল আর চরিত্রে ফ্যাসিস্ট। আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে ও দলীয় নেতা কর্মীদের অপকর্ম ঢাকতে ফ্যাসিস্ট নীতিকে একমাত্র বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার অন্যতম ফ্যাসিস্ট নীতি হলো, জেল জুলুম নির্যাতন আর মামলাবাজি। বিপরীত মতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর জুলুম নির্যাতন চালানো। এ জন্য তারা ব্যবহার করছে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে। বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ করতে কথায় কথায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা এ সরকারের অন্যতম হাতিয়ার। অবশ্য আওয়ামী লীগের এ চরিত্র অতীব পুরাতন। আওয়ামী লীগই বাংলাদেশে একমাত্র দল যারা বাকশালী চরিত্র থেকে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়ায়নি। আজ স্বাধীনতার ৪০ বছর পার হলেও আওয়ামী লীগের চরিত্রের খুব একটা উন্নতি ঘটেনি। তাদের আজকের কার্যক্রম যেন পুরনো দিনের প্রতিধ্বনি-ই মাত্র।

আজো আওয়ামী লীগ সেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার পুরনো হাতিয়ার ব্যবহার করে বিরোধী দলকে দমন করে চলছে। আজ কথায় কথায় বিরোধী দলকে হামলা মামলার সংস্কৃতি এক সময় স্বয়ং আওয়ামী লীগের জন্যই কাল হবে। একথা ক্ষমতার লাল ঘোড়ার দাপটে এখন আওয়ামী লীগের অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছে না। বিশেষ করে ১/১১ পথ ধরে এগিয়ে চলছে মহাজোট সরকার। জরুরি সরকারের শাসন ছিল গ্রেফতার, মামলা রিমান্ডের নামে নির্যাতন, হিংসাত্মক প্রতিশোধ, আর দেশের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীদের হেয়প্রতিপন্ন করার মহোৎসব। আর এখন তা চলছে শুধু বিরোধী মত ও পথের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ সকল জনসাধারণের ওপর নির্যাতন। এটাই হলো জরুরি সরকার আর মহাজোট সরকারের মধ্যে পার্থক্য।

মৌসুমী গণতন্ত্র মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মাত্র। বিশেষ করে কালে ভদ্রের এ গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ মিলে নির্বাচনের সময়। এ সময় হলো আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ভরা মৌসুম। বিশেষ করে গণতান্ত্রিকতার নীতি অনুয়ায়ী শাসন করা গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এই নীতি থেকে সরে পড়লে সরকার

www.amarboi.org

রাষ্ট্রীয় যন্ত্র, আর ক্ষমতার দাপট, মিলে হয়ে উঠে স্বৈরাচারী। আর তখন সরকার আর স্বৈরাচার এই দুয়ের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে বিরোধী দল, সংবাদপত্র, দেশের বুদ্ধিজীবী তথা সুশীলসমাজের গঠনমূলক সমালোচনা। এই জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গ।

কিন্তু বর্তমান মহাজোট সরকার যেন এর কোনটির-ই তোয়াক্কা করছে না। সরকারের সমালোচনায় এখন সরব মহাজোটের শরিক দলগুলো, নিজ দলের, কোন কোন এমপি, মন্ত্রী আর আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী, এবং সরবাদপত্র। কিন্তু আওয়ামী লীগ কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। এ যেন সরকার পতনেরই আলামত!। মহাজোটের জন্য মহা-বিপদ সংকেত। আর তা আওয়ামী লীগের জন্য না যত ক্ষতিকর তার থেকে বেশি ভয়ংকর দেশ ও জাতির জন্য। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ড্রাইভারের সিটে থাকে সরকার, আর দেশের সকল জনগণই গাড়ির যাত্রী। সুতরাং সকল ব্যাপারে সরকার ব্যর্থ হলে বিরোধী দল লাভবান হবে এটি কোন দেশপ্রেমিক মানুষ মনে করতে পারে না। বরং জাতীয় ইস্যুতে সরকার ব্যর্থ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের বিরোধী দল আমজনতা সমানভাবে। হুমকির মুখে পড়বে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। সে সমস্ত ইস্যুর মধ্যে টিপাইমুখ বাঁধ, ডিসিসি বিভক্তিকরণ, পদ্মা সেতু নির্মাণ বন্ধ, তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ বিচার নামে জাতিকে দ্বিধাবিভক্তির উদ্যোগ ও দেশ বিরোধী একের পর চুক্তি ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগের কাছে বিরোধী দল দমন করাই যেন এক মহাসাফল্যের ব্যাপার। বিরোধী দল দমনে ব্যবহার করছে বিভিন্ন বাহিনীকে। যেখানে সেখানে আশঙ্কা জনক হারে বাড়ছে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা। এর অধিকাংশই বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের। দেশে এখন '৭২-৭৪ আওয়ামী দুঃশাসনের ধ্বনি শুনা যাচ্ছে।] দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী "খুন, গুম, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির ঘটনা বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে যে কোনো সময় যে কাউকে তুলে নেয়া হয়। সরকারি হিসাবেই ক্ষমতাসীন এ সরকারের ২ বছর ১১ মাসে খুন হয়েছে ১২ হাজার। থানা-পুলিশে রেকর্ডভুক্ত হয়নি এমন সামাজিক খুনের ঘটনা আরও কয়েক হাজার। চলছে নিয়ন্ত্রণহীন চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। প্রকাশ্যে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে জনপ্রিয় প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতাদের নৃশংসভাবে হত্যা ও গুম করার ঘটনা ঘটছে। ফলে সাধারণ মানুষ এখন উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। চলতি বছর ইউপি ও কয়েকটি উপজেলার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৬৫ জন জনপ্রতিনিধি, নির্বাচন প্রার্থী ও সমর্থককে হত্যা করা হয়। এসময় ১০ হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২ বছর ১১ মাসে দেশে ১২ হাজারেরও বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। রাজনৈতিক সহিংসতায় খুন ৫৭০, বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে ১৮৫ জন। বিএসএফ অপহরণ করেছে ৫১ জনকে। এদিকে গত আড়াই বছরে শুধু রাজধানী ঢাকায় ৫ হাজার ৫৭৬টি বেওয়ারিশ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজধানীর বাইরের জেলাগুলোতে উদ্ধার করা

www.amarboi.org

হয়েছে আরও প্রায় ৫ হাজার বেওয়ারিশ লাশ। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম ও বেসরকারি একাধিক সংস্থা এই লাশের দাফন কাজ সম্পন্ন করে। উদ্ধার করা লাশের অধিকাংশই নৃশংস খুনের শিকার। অনেক লাশের হাত কিংবা পা নেই, আবার কারও চোখ উপড়ানো, অনেক লাশের শরীর গুলিবিদ্ধ ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা কিংবা রেলে কাটাপড়া বেওয়ারিশ লাশও আছে। তবে নৃশংস খুনের শিকারই বেশি বলে সূত্র জানায়। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম সূত্রে জানা যায়, গত ৩ বছরে ঢাকায় বেওয়ারিশ হিসেবে মোট ৫ হাজার ৫৭৬টি লাশ তারা দাফন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এ বছর ১ হাজার ৫৭৯ জন, ২০১০ সালে ১ হাজার ৭৮৩ জন ও ২০০৯ সালে ২ হাজার ১৫৬ জন। এছাড়াও গত ৩ বছরে ৩৪৪ জন গণপিটুনিতে হত্যার শিকার হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ ও র‍্যাবের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৩৫ জন। এর বাইরেও ঘটেছে নৃশংস খুন, নারী নির্যাতনের ঘটনা।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী সরকারের ২ বছর ১১ মাসে ৪ সাংবাদিক নিহত, ২৮০ জন সাংবাদিক আহত, ৮৮ জন লাঞ্ছিত ও ৯৫ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ৪০ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা, ১ জন অপহৃত ও ২৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। অধিকারের তথ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ৫৬৫ জন। আহত হয়েছেন পায় ২৮ হাজার ৮৮৮ জন। (সূত্রঃ আমার দেশ, ১৪ -১২-২০১১) আগামীতে অন্য মতের কেউ ক্ষমতায় আসলে এ সব বন্ধ হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় কি? তাহলে আমরা কি জাতি হিসেবে বর্বরতা আর হিংস্রতার প্রতিযোগিতায় এভাবেই এগুতে থাকবো? জেলগেট থেকে গ্রেফতার এ সরকারের নতুন আবিষ্কার। রাজনৈতিক দলের কেউই এখন জামিন পেয়ে অনায়াসে জেলগেটের বিশেষ বাহিনীর গ্রেফতার এড়াতে পারছে না। কিন্তু আওয়ামী লীগকে মনে রাখতে হবে ক্ষমতার পালাবদলে রিমান্ডের নামে নির্যাতন, রাজনীতিবিদদের ডাণ্ডাবেড়ি পরানো আজকে যেমনি বিরোধী দলের জন্য কষ্টকর। আগামী দিনে এ পথ আওয়ামী লীগের জন্য সুখকর নাও হতে পারে। কারণ এই সরকারেই শেষ সরকার নয়।

দেশে এখন রিমান্ডের নামে চলছে নির্যাতন। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। মানুষের মতপ্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দল ও এর নেতাকর্মীদের আক্রমণ এবং বিচার বিভাগের হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাংবাদিকরা। অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে টিভি চ্যানেলগুলোর

www.amarboi.org

ওপর। আজ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধীদল জনগণকে যতটুকু ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে তার নিয়ামক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে সত্য প্রকাশে দুরন্ত সাহসী মিডিয়া, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্টগণ। এজন্য সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর আওয়ামী লীগ খড়গহস্ত। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক আবুল আসাদ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক কামারুজ্জামান, শীর্ষ নিউজের সম্পাদক, একরাম, সোনার বাংলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসনিম আলম-এর মত সম্মানিত ব্যক্তিদের গ্রেফতার রিমান্ড আর নির্যাতন। চ্যানেল ওয়ান, বন্ধসহ সাংবাদিকগণ নির্যাতিত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করায় ইতোমধ্যেই অনেক দৈনিক পত্রিকা ও মিডিয়ার বিরুদ্ধে মামলার নামে হয়রানির শিকার হচ্ছে। কিন্তু জুলুম, নির্যাতনের প্রকটতা যতই ভয়াবহ হোক, জীবন যতই সংকটাপন্ন হোক সাহসী উচ্চারণ যেন বন্ধ না হয়। এগিয়ে যাবার পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন সত্য কথা বলা যেন বন্ধ না হয়। এটাই হোক মহান বিজয় দিবসে তরুণ প্রজন্মের অঙ্গীকার।

www.amarboi.org

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল: বিতর্ক দেশে-বিদেশে

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল যখন নিজেই অপরাধী যা নিয়ে দেশে বিতর্কের শেষ নেই। অবশ্য আইন বিশেষজ্ঞরা ভাল বলতে পারবেন পৃথিবীতে কোন আইন বা ট্রাইব্যুনাল নিয়ে এর আগে এত বিতর্ক হয়েছে কিনা? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এই আইন দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলেও সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত, বিতর্কিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কালো আইন হিসেবে হয়ত গ্রিনিজ বুকে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। এটি হয়ত সরকারের একটি বড় অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই আইন দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা এই সরকার যখন প্রথম বলেছে, তখনই আইনের প্রভুর দেশ হিসেবে খ্যাত যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস এটিকে শুধু কালো আইন হিসেবেই চিহ্নিত করেনি বরং আইনটি সংশোধনের জন্য ১৭টা পয়েন্টে তাদের অবজারভেশন তুলে ধরে বাংলাদেশ সরকারের নিকট তাদের মতামত পাঠিয়ে দিয়েছে। মহাজোট সরকার যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস-এর এ ধরনের মতামতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সরকারের ধারণা ছিল কট্টরপন্থী উগ্র মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের মদদদাতা জামায়াত নেতাদের বিচার হবে, আর সেখানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন দিবে এটাই স্বাভাবিক। শুনা মাত্রই বলবে কট্টরপন্থী উগ্র মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের মদদদাতা জামায়াত নেতাদের বিচারে আবার আইন লাগে নাকি? তাদের বিচারে আবার মানবাধিকার কিসের? পঞ্চম সংশোধনী রায়ের পর সুরঞ্জিত বাবু যেমনি বলছিলেন, জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে। যুদ্ধাপরাধীদের অধিকার বলতে কিছু নেই। যাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে দুই মোড়ল রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের এমন মনোভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মহাজোট সরকারের অতি-উৎসাহী শিবিরে ভাটা পড়ে। আইনমন্ত্রী ছুটে যান আমেরিকায় সেখানে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক করে আসেন এটা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয়, এটা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যখন বলা হলো ভালো কথা এই সময়ে সবচেয়ে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড করছে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ তাদের দিয়েই বিচার শুরু হোক। এমন দাবিতে নড়েচড়ে বসলো সরকার। আবার শুরু করলো যুদ্ধাপরাধীদের জিগির। আইনমন্ত্রী আমেরিকার কাছে দেয়া ওয়াদা এবং মিডিয়াকে বলা কথা থেকে নিজেই সরে এলেন।

১৪ জুলাই ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যালেন ডানকান ঢাকায়

www.amarboi.org

সফরে আসলেন। সরকারের ধারণা ছিল এখন বোধ হয় তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। ব্রিটিশ এ মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করলে চলবে না। ব্রিটিশদের এমন পুরাতন মনোভাবে সম্ভবত খুব ক্ষুব্ধ হলেন আমাদের আইনমন্ত্রী। এজন্য আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ২৯ জুলাই সিপিবি আয়োজিত আলোচনা সভায় সাফ জানিয়ে দিলেন, 'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারে প্রশ্ন তোলার অধিকার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেই' বলে। 'যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে বলে দিতে চাই, ৩৯ বছর আগে যখন এ দেশে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হলো, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত নেয়া হলো, এক কোটি মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো তখন আপনাদের মানবাধিকার কোথায় ছিল? সে দিন কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়নি? সেই ঘটনার বিচার করলে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারোই নেই।'

যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশগুলো ও বাংলাদেশের মহাজোট সরকারের মধ্যে মতানৈক্যের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিলেন মন্ত্রী নিজেই। সরকারের কোনো মন্ত্রী ইতঃপূর্বে কোনো পাশ্চাত্য সরকারের মনোভাব সম্পর্কে এমন কঠোর বক্তব্য এর আগে দেননি। আইনমন্ত্রী তার বক্তব্যে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকারের অধিকার বা এখতিয়ারকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বিদেশীদের পুরোপুরি সমর্থন আছে আইনমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেকবার গাল ভরে এ বক্তব্য দিয়েছেন। এটাই আওয়ামী লীগের চরিত্র। তাদের স্বার্থের বাহিরে গেলে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, আইন, আদালত, বৈধ-অবৈধ সত্য-মিথ্যা কিছুই মানেন না। আমি মূলত যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অনেকগুলো দ্বৈতনীতি তুলে ধরবো।

নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে আওয়ামী লীগ পৃথিবীর মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রকেও তুলো ধুনো করতে দ্বিধা করে না। এবার সেক্টর্স কমান্ডার্স ফোরামের অন্যতম নেতা ও মুখপাত্র অবঃ লে. জে. হারুনুর রশিদ চৌধুরী বীরবিক্রম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগিতা করার অভিযোগ আনলেন। তাহলে জামায়াত নেতা গোলাম আযমের স্বাধীনতা বিরোধিতার দায়ে যদি তৎকালীন তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতা নিজামী, মুজাহিদ, কামারুজ্জামান বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন, তাহলে আমেরিকার (সাবেক প্রেসিডেন্টের) বর্তমানে একই কারণে বিচারের মুখোমুখি করা প্রয়োজন।

গত ৪ জুলাই টরন্টোতে বাংলাদেশীদের সমাবেশে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারে প্রবাসীদের সমর্থন জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে সেক্টর্স কমান্ডার্স ফোরামের অন্যতম নেতা ও মুখপাত্র অবঃ লে. জে. হারুনুর রশিদ চৌধুরী বীরবিক্রম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগিতা

www.amarboi.org

করেছিল এবং কেউ যদি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের সহযোগিতা করার অভিযোগ আনেন, তাহলে আমরা স্বাগত জানাবো। অবশ্য কথাগুলো বলার সময় অবঃ লে. জে. হারুনুর রশিদ চৌধুরী সাহের পুরোপুরি জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না।

এটার নামই আওয়ামী লীগ যারা নিজেদের পক্ষে গেলে অসত্যকে সত্য আর রাতকে দিন বানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। যারা নিজেদের পক্ষে গেলে জাতি সংঘের আবাসিক প্রতিনিধির চিঠিতে ও ১/১১ জরুরি অবস্থার সমর্থন জোগান, আবার নিজেদের বিপক্ষে গেলে পৃথিবীর দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে হেন কথা বলতে দ্বিধা করেন না।

এবার আসুন যারা প্রত্যেকদিন হাঁকডাক দিয়ে জামায়াত নেতাদের প্রায় ফাঁসি দিয়েই ফেলেন। অবস্থা এখন এমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আওয়ামী লীগের জন্য তসবিহ পড়ার সওয়াবতুল্য। এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার আনুকূল্য ও দিদার লাভ করা যায়। যে নেতা যতজোরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে নোংরা বক্তব্য রাখবে তিনি ততই শেখ হাসিনার আনুকূল্য ও আস্থা অর্জন করতে পারবে। এ দিক থেকে শীর্ষ আছেন, আইন প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট প্রতিমন্ত্রীসহ অনেকেই।

এত সব যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে। এমনি এক টানটান উত্তেজনাকর মুহূর্তে আমেরিকা আসলে কি ভাবছে? আমেরিকার হার্ডকোর মুখপাত্র হিসেবে খ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার, ইশান ঠাকুরের লেখা ওই প্রতিবেদনটি টাইম-এর ৩রা আগস্ট অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশ : ব্রিঙ্গিং এ ফরগটেন জেনোসাইড টু জাস্টিস' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়- বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কম্বোডিয়ার মতো বাংলাদেশেও এ বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য বর্তমানে আটক চারজন সবচেয়ে পরিচিত মুখ হলেও তাদের মতো অসংখ্য যুদ্ধাপরাধী এখনও সারা দেশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশ থেকে এসব যুদ্ধাপরাধীকে প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ময়নাতদন্তের প্রমাণের অভাবে বিচারপ্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হবে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে সরকার তার পরিচিত প্রতিপক্ষ এবং রাজনৈতিক শত্রুদেরকে দমন করতেই এ বিচারকে ব্যবহার করছে। আলী রিয়াজ বলছেন, 'এ বিচারপ্রক্রিয়া যতটা সম্ভব স্বচ্ছ হতে হবে। সরকার যদি পুরোপুরিভাবে সেটা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটা সমগ্র জাতির জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে।' বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কম্বোডিয়ার মতো বাংলাদেশেরও এ বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। তবে এগিয়ে যাবার পথ এখনও আঁধারে আচ্ছাদিত। এ রিপোর্টে কয়েকটি বিষয় তাদের সংশয় তারা প্রকাশ করেছে- এক- বিচার প্রক্রিয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। দুই- বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য বর্তমানে আটক চারজন সবচেয়ে পরিচিত মুখ হলেও তাদের মতো অসংখ্য যুদ্ধাপরাধী

www.amarboi.org

এখনও সারা দেশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিন- আশঙ্কা করা হচ্ছে সরকার তার পরিচিত প্রতিপক্ষ এবং রাজনৈতিক শত্রুদেরকে দমন করতেই এ বিচারকে ব্যবহার করছে। চার- 'এ বিচারপ্রক্রিয়া যতটা সম্ভব স্বচ্ছ হতে হবে। সরকার যদি পুরোপুরিভাবে সেটা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটা সমগ্র জাতির জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়ত ভারত ও আমাদের দেশের বাম বুদ্ধিজীবীদের চাপে যে কি কাজ হাত দিয়েছেন তা কিঞ্চিত হলেও মাঝে মধ্যে উপলব্ধি করেন, এবং এ বিচার সমগ্র জাতির জন্য কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে তা ২২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য থেকেই বুঝা যায়। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে 'ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছি' বলে অভিহিত করে ঘোষণা দিলেন, 'জামায়াতকে আমরা নিষিদ্ধ করব না। সবার রাজনীতি করার অধিকার আছে।' সংসদেও তিনি এমন বক্তব্যেই রেখেছেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন আর আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ১৭ জুলাই বলেছেন, 'চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের' চলতি বছরের মধ্যেই বিচারের মুখোমুখি করা হবে। তিনি আরো বলেন, 'পঞ্চম সংশোধনী রায় বাতিলের মাধ্যমে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে।'

এবার আসুন গ্রেফতার প্রক্রিয়া নিয়ে যতখেলা আওয়ামী লীগ খেললো। এতবড় বড় যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার যে কায়দায় করল তা রীতিমতো হাস্যকর। একটি ঠুনকো অসত্য ও জামিনযোগ্য মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার সরকার শক্তিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় নেতাদের গাড়ি পোড়ানো, পুলিশি কাজে বাধা, পুরাতন হত্যা মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশকে খেলো ও পুতুল বাহিনীতে পরিণত করেছে। বর্তমানে আমরা যেন পুলিশি রাষ্ট্রেই বাস করছি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেছেন- দেশে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। বিচার বিভাগের ভেতরেও আইনের শাসন ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। (১১ আগস্ট বিডিনিউজ) এ সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে যে খেলা শুরু করেছে তা মনে হয় আওয়ামী লীগ নিজের জন্যেই শুভ হবে না। আমি এর আগের লেখায় সম্ভবত পুলিশ এখন যেভাবে রিমান্ডে নির্যাতন, হত্যা, গুম, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে তার প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এর গল্পটি তুলে ধরেছিলাম - ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ মহিলা সাহিত্যিক মিসেস মেরী শেলী (১৭৯৭-১৮৫১) তার উপন্যাসে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ডাঃ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এক মানবরূপী দানবের সৃষ্টি করেন, যে-দানব পরিণামে তার স্রষ্টাকেই হত্যা করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা কিংবা এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা বা কর্মকাণ্ড শুরু করাকে বোঝায়-যা পরিণামে তার স্রষ্টা বা উদ্যোক্তার জন্যই ধ্বংস কিংবা

www.amarboi.org

মহাবিপদ ডেকে আনে। সম্ভবত খুব বেশি দূরে যেতে হবে-না মহা-ফ্রাঙ্কেনস্টাইন মহাজোট সরকারের জন্য মহাবিপদ ডেকে আনবে।

তৃতীয়ত- জাতীয় নেতাদের এ ধরনের হাস্যকর মামলায় প্রায় মাসাধিক কাল রিমান্ডে নিয়ে আমাদের জাতীয় রাজনীতিকে কলঙ্কিত করা হয়েছে, যেমন করা হচ্ছে বর্তমানে আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস, শমশের মোবিন চৌধুরীসহ বিরোধী দলীয় আরো অনেকের সাথে। যা কারো জন্যই শুভ নয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী একাধিকবার তার বক্তব্যে বলেছেন "এই সরকারই শেষ সরকার নয়, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে শিখছি আমরা ক্ষমতায় আসলে এগুলো প্রয়োগ হবে।"

আবার আসা যাক, সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে এখনো কোন স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে পারেনি। জাতীয় নেতাদের এ ধরনের হাস্যকর মামলায় প্রায় মাসাধিক কাল রিমান্ড শেষে এবার ভয় হলো কখন যুদ্ধাপরাধীরা জামিনে বের হয়ে পড়ে, তাহলে কি করা যায়, প্রভুদের ইশারায় এবার তড়িঘড়ি করে যুদ্ধাপরাধীদর ট্রাইব্যুনালে হাজির করে গ্রেফতার দেখানো, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন সু-নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। সরকার যুদ্ধপরাধীদর বিচারে শুরুতেই অ-স্বচ্ছতার পরিচয়ই দেয়নি যুদ্ধাপরাধীদর বিচারের ট্রাইব্যুনালে বিতর্কের শেষ পেরেকটি মারলেন এড. টিপু সাহেব। এই জন্যেই মনে হয় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এক আলোচনা সভায় যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর গোলাম আরিফ টিপু সাহেব কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন "ছাগল দিয়ে হাল চাষ হয় না।"

প্রথমেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারে অ-স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুললেন অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। তিনি বলেন- মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আটক জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারের বিষয়টি আইনসম্মত হয়নি। কথায় বলে "ঘরের শত্রু বিভীষণ" তার মন্তব্য নিয়ে সরকারের উচ্চমহলে তোলপাড় চলছে। প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সরকারপক্ষের আইনজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের চার শীর্ষ নেতাকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দেন আদালত। এ আটকাদেশ আইনসম্মত হয়নি বলে বক্তব্য দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান কৌসুলি ও বিশিষ্ট ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল আইনের ১১ (৫) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠনের আগে অভিযুক্ত কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সুযোগ নেই। এ সংক্রান্ত বিধিমালার ৯ নং বিধিতে তদন্তের যেকোনো পর্যায়ে গ্রেফতারি পরোয়ানার যে অধিকার ট্রাইব্যুনালকে দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই মূল আইনের ১১ (৫) ধারার আলোকে হতে হবে। এ কারণে জামায়াত নেতাদের অভিযোগ গঠনের আগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বা গ্রেফতার প্রদর্শনে সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘিত হয়েছে।

www.amarboi.org

বিষয়টি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে কী হতে পারে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, চ্যালেঞ্জ হলে আমরা আদালতে তা মোকাবেলা করব। তবে বিষয়টি চ্যালেঞ্জযোগ্য হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না। এ সময় অ্যাডভোকেট আনিসুল হকের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, তিনি একজন আইনজীবী হিসেবে তার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। এটি একান্তই তার নিজস্ব বিষয়। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই।

পাঠকবৃন্দ এখানেও লক্ষ্য করুন এডভোকেট আনিসুল হক উনি যখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলেন তখন তা তার ব্যক্তিগত মত হয়ে গেল। অথচ এই আনিসুল হক দুদকের একজন আইনজীবী, যতটা না যোগ্যতায় তার চেয়ে বেশি আওয়ামী ভক্তির কারণে। এরশাদের আইনজীবী এবং শেখ মুজিব হত্যা মামলার কৌসুলি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- বাংলাদেশে অনেক হাইপ্রোফাইল লইয়ার থাকা সত্ত্বেও এবং তারা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানার সমালোচনা করলেও কেউ কানের মাছি পর্যন্ত তাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। যেমন বিচারপতি টিএইচ খান, ব্যারিস্টার মওদুদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হকসহ অনেক বাঘ বাঘা আইনজীবী।

কিন্তু যখন আওয়ামী ভক্ত আনিসুল হকের মত কেউ মন্তব্য করে তখন মিডিয়ায় তোলপাড় হয়ে যায় আবার তা নিয়ে আইনমন্ত্রী মিটিং করেন। তাতে এটাই বোঝা যায় আওয়ামী লীগ তার প্যানেলের বাইরের কোন আইনজীবীকে আইনজীবী মনে করে না। আবার আনিসুল হকের মন্তব্যকে তার ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে টিপু সাহেব মন্তব্য করেছেন। একজন আইনজীবীর কথা কি ব্যক্তিগত মন্তব্য হতে পারে? এখন অপেক্ষার পালা আনিসুল হক কখন তার মন্তব্য পরিবর্তন করেন।

এবার দেখুন আওয়ামী লীগের চাপা-বাজির নমুনা। নিজেদের পক্ষে না থাকলে এমনকি রাজাকার না হলেও জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেই তারা যুদ্ধাপরাধী। আওয়ামী লীগের সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলে বসেছেন, যুদ্ধাপরাধের দায়ে বেগম খালেদা জিয়ারও বিচার করা হবে। সাজেদা চৌধুরীর মতে, 'মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের এক জেনারেলের সাথে বেগম খালেদা জিয়া সেনাক্যাম্পে থেকে মুক্তিযোদ্ধা হত্যার পরিকল্পনায় ছিলেন। সেই অপরাধে তার বিচার হবে। রাজাকারের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রুখতে হবে।' অথচ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়েই অন্তরীণ ছিলেন। রাজাকার মানেই যুদ্ধাপরাধী। আর তাই ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার বেয়াই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের বাবা যে বড় রাজাকার ছিলেন সে কথা। সেটি আলোচনায় মাঝে মধ্যে আসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের প্রতিপক্ষ সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী হওয়ার কারণেই। গত ২২ এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখে এ কথা শুনে ক্ষেপে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের বলেন,

www.amarboi.org

দেশে রাজাকার বলে কোনো শব্দ নেই। দেশে কোনো রাজাকার নেই। তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের দাদাশ্বশুর ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম খন্দকার নুরুল হোসেন নুরু মিয়া ফরিদপুরে রাজাকারদের তালিকায় ১৪ নম্বর রাজাকার হলেও তিনি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। একই সাথে তিনি আওয়ামী লীগের ফরিদপুরের নেতাদের কাছে প্রশ্ন করেন, তার ভাই শেখ সেলিম ফরিদপুরের রাজাকার, মুসা বিন শামসিরের ওরফে সুইলা মুসার মেয়ের সাথে ছেলে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা করেছেন, এটা তারা কখনো বলেন না কেন? অথচ শেখ হাসিনার মেয়ের দাদাশ্বশুর নুরু মিয়ার নামে সবাই অভিযোগ করেন, তিনি রাজাকার ছিলেন। শেখ হাসিনা গর্বের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের জানিয়ে দেন, নুরু মিয়া পিস কমিটির সদস্য থাকলেও যুদ্ধের সময় তিনি কোনো অপরাধমূলক কাজকর্ম করেননি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কলামিস্ট বদরুদ্দীন উমর এর লেখায় এবার খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন আওয়ামী থিং ট্যাঙ্কদের মহাগুরু জনাব আব্দুল গাফফার চৌধুরী। তিনি জনাব বদরুদ্দীন উমরকে রাজাকারদের নয়া স্পোকসম্যান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল গাফফার চৌধুরী অন্যের মতের প্রতি কখনই সহনশীলতা প্রদর্শন করতে পারেন না। এটা আওয়ামী লীগের মুদ্রাদোষই বলতে হবে।

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যু কোনো নতুন ইস্যু নয়। বাস্তবত ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই এ বিচারপ্রক্রিয়া শুরু ও তৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত সম্পন্ন হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করলেও তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি। শুধু তাই নয়, এর তালিকা প্রক্রিয়া শুরু করে তারা তালিকাভুক্ত ১৯৫ পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের বিচার না করে তাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছিল। যদিও তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছিল যে সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতেই হবে। সে বিচার হয়নি, তার পরও বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের আটক করা হয়েছিল তাদেরও ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে। এ কাজ শেখ মুজিব তাদের মন্ত্রিসভার কোনো সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করেননি। সাংবিধানিকভাবে ক্ষমা ঘোষণা ছিল রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারভুক্ত, তবু প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই তিনি এ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন নিজে এই কাজের কৃতিত্ব গ্রহণের জন্য। এ ক্ষেত্রে সব থেকে 'চমৎকৃত' হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৭১ সালের সব থেকে বড় ও ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে শুধু মাফ করে দেয়া নয়, ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে ইসলামী সম্মেলনের সময় তাকে পরম বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করে তার গালে চুমু খাওয়া এবং পরে তাকে মহাসম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজসিক

www.amarboi.org

সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা। এর পর বাস্তবত আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো নৈতিক অথবা আইনগত ভিত্তি থাকেনি। ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময়ও তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। শুধু তা-ই নয়, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তারা জামায়াতে ইসলামী এবং অন্য ধর্মীয় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছে।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ না নিলেও এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাপে পড়ে তারা এ উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই সততার জন্য বিখ্যাত নন। কাজেই সুযোগ বুঝে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে অনেক গালভরা কথা বললেও আওয়ামী লীগ সরকারের এই নেতিবাচক কার্যকলাপের বিরোধিতা না করে নিজেরাও এর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন। এ কাজ করতে গিয়ে অনেক ফালতু কথাই তাদের বলতে হচ্ছে। (সূত্র, কালের কণ্ঠ, ০১/০৭/২০১০)

আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ অভিযোগ করেছেন, সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচারকে বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধের মতো একটি বিষয়কে নিয়ে সরকারের এ ধরনের আচরণ জাতির জন্য ভালো পরিণতি বয়ে আনবে না। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে রাজধানীতে 'গার্মেন্ট শ্রমিকদের দাবির ন্যায্যতা' শীর্ষক সংলাপে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপকরা এতে বক্তব্য রাখেন।

আনু মুহাম্মদ বলেন, গার্মেন্ট শ্রমিকরা কোনো অযৌক্তিক দাবি করছেন না বরং তারা বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরির দাবি জানাচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনসহ সারা দেশে যেকেনো ধরনের কর্মসূচিকে ভুল ব্যাখ্যা করে জনসম্মুখে উপস্থাপন করছে। আনু মুহাম্মদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার না করে সরকারকে জনগণের সমর্থন নেয়ার পরামর্শ দেন। (নয়া দিগন্ত, ৫ আগস্ট)

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ২২ জুলাই রাজশাহীতে যুবলীগের সমাবেশে বললেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে জামায়াত যত না বেশি কথা বলে, তার চেয়ে এক শ' ভাগেরও বেশি কথা বলে বিএনপি এবং বেগম খালেদা জিয়া। যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় বেগম জিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছেন।' ইতঃপূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিকবার প্রকাশ্য বক্তব্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য বেগম জিয়া আন্দোলনে নেমেছেন বলে অভিযোগ তোলেন।

আইন প্রতিমন্ত্রী বললেন - জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারের পর জামায়াত-শিবির

www.amarboi.org

দু' একটি মিছিল ছাড়াতো কিছুই করতে পারলো না। আর এখন বলছে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের গন্ডগোল, চবি মারামারি সবই নাকি জামায়াত-শিবির ইন্ধনেই হচ্ছে। তাহলে বুঝা যায় জামায়াত-শিবির অনেক শক্তিশালী। আইন প্রতিমন্ত্রী সাহেব- জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারের পর জামায়াত-শিবির দু একটি মিছিল ছাড়াতো কিছুই করতে পারলো না মানলাম। এর আগে আপনাদের নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গ্রেফতার হওয়ার পর একটা মিছিলও তো আমরা দেখলাম না। বরং তাকে কিভাবে বাদ দেয়া যায় সে চেষ্টাই আওয়ামী লীগের অনেক নেতারা করেছেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করুন দেখেন জামায়াত-শিবির ময়দানে কী করতে পারে। মন্ত্রী সাহেব আপনার অবগতির জন্য বলছি- ২৮ অক্টোবর ০৬, ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র দু-দিনের ব্যবধানে এ পুলিশ বাহিনী বিএনপি জামাতের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি।

আবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন গার্মেন্টস শ্রমিকদের গন্ডগোলের জন্য কিছু এনজিও কে দায়ী করলেন। ৯ আগস্ট বিএনপির গণমিছিলকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের ষড়যন্ত্রর অংশ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ। এমন হাজারো দ্বৈত বক্তব্য নিয়ে মাঠে যখন আওয়ামী লীগ। তাহলে কী বলা যায় আসলে কার বক্তব্যটি ঠিক।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষ অনেক বেশি অপরাধ করলে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের অবস্থা তেমনই মনে হয়। অবশ্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ বলেছেন, "শেখ হাসিনার মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" অবশ্য এর আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে হাইকোর্ট একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এটি পাঠকদের সকলেরই জানা। আমি অবশ্য মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার ভয়ে তা লিখলাম না। কারণ এখন দেশে নাকি মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার মৌসুম চলছে।

সরকার এখন যুদ্ধাপরাধের ভূতে আক্রান্ত। গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ নিয়ে আন্দোলন, আইন-শৃংখলার অবনতি, 'গার্মেন্টস শ্রমিকদের মারামারি, চবি গণ্ডগোল এক কথায় নুন থেকে চুন খসলেই যুদ্ধাপরাধীদের দায়ী করে চলেছে মহাজোট সরকার। কবে যে পারিবারিক কলহের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের দায়ী করে না বসে আওয়ামী লীগের নেতারা। জনগণের সমস্যা সমাধান না করে সরকার যুদ্ধাপরাধের বিচারের রাজনৈতিক ঢাল দিয়ে এখন আর রক্ষা পাচ্ছে না। পানি, বিদ্যুৎ ,গ্যাসের জন্য জনগণ স্ব-উদ্যোগে ইতোমধ্যেই আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণ বিদ্যুৎ এর জন্য ভাংচুর করছে। এটি মনে হয় হুমকি দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সব কিছুতে যুদ্ধাপরাধীদের দায়ী করা, সরকারের এ ফালতু বক্তব্য মানুষ যে গ্রহণ করছে না, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও ২৭ জুনের হরতালের মাধ্যমে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। কথায় বলে "গরম ভাতে বিড়াল

www.amarboi.org

বেজার" আর আওয়ামী লীগ বেজার জোটের অন্যতম শরিক জামায়াত-শিবিরের উপর। ঈদের পর শুরু হবে সরকার বিরোধী আন্দোলন। বিরোধীদলীয় নেত্রী লাখো জনতার গণমিছিল থেকে ইতোমধ্যে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধাপরাধের বিচারের রাজনৈতিক ঢাল দিয়ে সরকার জনরোষ থেকে আর কত দিন রক্ষা পায় সেটিই এখন দেখার বিষয়।

টাইম ম্যাগাজিনের শেষ লাইনটি দিয়েই লেখার ইতি টানছি "তবে যুদ্ধাপরাধের বিচার এগিয়ে যাবার পথ এখনও আঁধারে আচ্ছাদিত"

● **দৈনিক সংগ্রাম ১২ আগস্ট ২০১০**

www.amarboi.org

আক্রোশের রাজনীতির শেষ কোথায়!

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে শুরু করছি-
"অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝ মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
পথের উর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
তাই বলে তারা উর্ধ্বে উঠেছে-কেহ কভু ভাবিও না!
উর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় ওরা বাধা;
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না ক কাদা!"
এই কবিতার লাইনগুলো দেখে মনে হবে কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতা রচনা করেছেন গত ১৩ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া কে বাড়ি থেকে অ-মানবিক কায়দায় উচ্ছেদের পর। কিন্তু তা নয়। আমাদের ভবিষ্যতের কবি নজরুল হয়ত উপলব্ধি করেছেন যুগে যুগে থাকবে সংকীর্ণতা আর অমানবিকতার ইতিহাস। আমি বিশ্বাস করি কবি আজ জীবিত থাকলে বেগম খালেদা জিয়াকে যে অ-মানবিক, নির্লজ্জ, কদর্য, ও স্বৈরাচারী কায়দায় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘ ৩৮ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি থেকে ঈদের ঠিক পূর্বক্ষণে যেভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এর প্রতিবাদে এর থেকে অনেক কঠিন ভাষায় কবিতা রচনা করতেন ।
খালেদা জিয়া ক্যান্টনমেন্ট এর বাড়িটি সাধারণ কোন বাড়ির মত নয়। এটি হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বর্তমান বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বামী হারানোর দুঃখ ও বেদনার স্মৃতি সম্বলিত একটি ঠিকানা। এটিকে মূল্যের তালিকায় ওজন করা, এক ধরনের সংকীর্ণতা ও বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি যেমন খালেদা জিয়ার কাছে অমূল্য রত্ন তেমনি বর্তমান আওয়ামী সরকার, এ বাড়ি থেকে খালেদা জিয়ার উচ্ছেদের টার্গেট ছিল, জিঘাংসার সর্বনিম্ন স্তর। এটিকে আওয়ামী লীগ বাড়ির তালিকায় না রেখে প্রতিশোধের গ্রহণের চরম তালিকার অর্ন্তভুক্ত করেছে। মূলত শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত আক্রোশের শেষ পেরেক ঠুকলেন খালেদা জিয়ার প্রতি। আর বিএনপিও এটিকে শুধুমাত্র বাড়ি হারানোর বেদনায় না রেখে গোটা জাতীয়তাবাদী শক্তির অস্তিত্বের সিম্বলিক বা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করছে। আমাদের প্রত্যেকেরই বাপ দাদার স্মৃতিবিজড়িত ছিন্নকুটিরকে আমরা যেমনি শ্রদ্ধার সাথে হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দেই, সম্ভবত খালেদা জিয়ার কাছেই এই বাড়িটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কান্না বিজড়িত মুহূর্তেও আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার, ব্যঙ্গাত্মক কটূক্তি ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য থেকেও রেহাই পাননি বেগম খালেদা জিয়া। আমাদের সমাজে যত আজন্ম শত্রুই

www.amarboi.org

হোক না কেন, দুঃখ বেদনার সময়ে সহানুভূতি দেখাতে না পারলেও অন্তত আক্রমণ না করাটা ন্যূনতম সৌজন্যনতা হিসাবে বিবেচিত। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই সীমাটিও রক্ষা করতে পারে নাই। একটি বাড়ি হারানোর বেদনায় খালেদা জিয়া যেমনি অশ্রুসিক্ত আর গোটা জাতি এ ঘটনায় হয়েছে মর্মাহত। আর জনগণ উদ্বিগ্ন এই জন্য দেশ আবার হিংসা ক্রোধ ও অনিশ্চয়তার হিমাঙ্কের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাছাড়া শেখ হাসিনা এর আগেরবার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার অস্ত্র ব্যবহার করে গণভবন নিজের নামে এক টাকা মূল্য গ্রহণ করা, আর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদাত বরণ করার পর, তার শোকাহত বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি দেয়া এক কথা নয়। আজকে কেউ কেউ সেই ইতিহাস ভুলে গিয়ে দু'টিকে একই পাল্লাই মূল্যয়ন করছে। এটিও আমাদের সমাজে আরেক প্রকার তথ্যসন্ত্রাস। প্রত্যেকটা বিষয়কে আমরা ওই সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি না। আর না পারলে কোন ঘটনারেই প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এবার পাঠকবৃন্দ আসুন আন্তর্জাতিক মহলে আওয়ামী লীগের এই জঘন্য কাজটিকে কিভাবে দেখছে তার সামান্য বিবরণ-

"ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ইকোনমিস্ট পত্রিকার গত ১৮ নভেম্বর সংখ্যায় এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এতে বলা হয়, ঈদের ঠিক আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে তার সেনানিবাসের বাস-ভবন থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার ওপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে বাংলাদেশে ঘৃণার রাজনীতি ফিরে এসেছে। এতে আরো বলা হয়, বেগম জিয়ার ওপর শেখ হাসিনার প্রতিহিংসাপরায়ণতায় ভারত সরকারেরও সমর্থন রয়েছে। ভারতও চায় জিয়া পরিবারের ধ্বংস। সেনাসমর্থিত দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও কারামুক্তির দুই বছরের বেশি সময় পর বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনৈতিক পরিবারের নেতারা ফের ঘৃণা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। তবে এবার এটা হচ্ছে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে।

বেগম জিয়া প্রায় ৩০ বছর ধরে ঢাকা সেনানিবাসের যে বাড়িতে বসবার করে আসছিলেন, গত ১৩ নভেম্বর সেখান থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হয়। এর প্রতিবাদে বেগম জিয়ার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) হরতাল ডাকে। তার সমর্থন ও শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। শেখ হাসিনা চতুরতার সাথে বেগম জিয়ার বাসভবনের চারপাশের বিশাল এলাকাকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরের এক বিদ্রোহে নিহত ৫৭ জন সেনাকর্মকর্তার পরিবারের বাড়ি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করেন। এই উচ্ছেদ ছিল বিএনপি'র মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার আওয়ামী লীগের মিশনের অংশবিশেষ। বেগম খালেদা জিয়ার মরহুম স্বামী ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক

www.amarboi.org

পরিবারের চিহ্ন মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগ। বেগম জিয়ার একমাত্র আশা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও পুঁজিবাদী দুর্বৃত্তায়নে শেখ হাসিনার সরকারের খোলামেলা সমর্থনে জনগণ হতাশ হয়ে পড়ছে। সরকারের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ইতোমধ্যে কমতে শুরু করেছে। অবশ্য শেখ হাসিনার প্রতিহিংসাপরায়ণতা ভারত সরকারের সমর্থন পেয়েছে, তাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ উন্নত হয়েছে। বেগম জিয়ার রাজনৈতিক পরিবারটিকে ধ্বংস করা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রায় মতাদর্শে পরিণত হয়েছে, দেশটি মনে করে তার পরিবার ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে।

সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার মধ্যে শেখ হাসিনার সমর্থন কমছে, খালেদা জিয়ার বাড়ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ক্ষোভভিত্তিক বিভক্তির রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের লেগে থাকাটা আশ্চর্যের বিষয়।"

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ আওয়ামী লীগ বরাবরই মনে করে আসছে বিএনপি সবসময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনির আনুকূল্যতা পেয়ে আসছে। সুতরাং বিএনপি এবং সেনাবহিনীর দূরত্ব সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ এটিকে মোক্ষম সময় হিসাবে গ্রহণ করে আর উভয়ের ব্যবধানের দেয়াল তুলতে ব্যবহার করে আইএসপিআর কে। সচেতন পাঠকবৃন্দ এবার দেখুন, আইএসপিআরের নানা রকম ভাষ্য- খালেদা জিয়ার বাড়ির দখল নেয়া প্রসঙ্গে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) কয়েক দফায় নানা রকম বক্তব্য দিয়েছে। প্রথমে আইএসপিআর থেকে বলা হয়, খালেদা জিয়া আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছাড়ছেন। বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে আইএসপিআর-এর এই বক্তব্য প্রচার করা হয়। উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলাকালে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে প্রেস ব্রিফিং করে আইএসপিআর পরিচালক শাহীনুল ইসলাম বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জমি ক্যান্টনমেন্ট দখল নিচ্ছে। বেলা সোয়া ৩টার দিকে তিনি আরেক দফা ব্রিফিং করে খালেদা জিয়াকে তার বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জানান।

অন্যদিকে সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানায়, 'বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আদালতের রায় বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেন। তিনি তাঁর সাথে নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ দ্রব্য নিয়ে গেছেন। বাকি জিনিসপত্র কর্তৃপক্ষ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে'।

সকালের প্রেস ব্রিফিংয়ে আইএসপিআর পরিচালক শাহীনুল ইসলাম বলেন, মইনুল রোডের বাড়ি সংক্রান্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, যে যুক্তিতে মইনুল রোডের বাড়িটি বেগম খালেদা জিয়াকে বরাদ্দ দেয়া হয়, শুরুতেই তার প্রক্রিয়া ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তারপরও মানবিক দিক বিবেচনা করে মহামান্য হাইকোর্ট খালেদা জিয়াকে বাড়ি ছাড়ার জন্য এক মাসের সময় দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ১২

www.amarboi.org

নভেম্বর সময় শেষ হয়ে গেছে। সেহেতু শনিবার থেকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্যান্টনমেন্টের জমি পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সচেতন পাঠকবৃন্দ খালেদা জিয়া বের না হওয়া পর্যন্ত আইএসপিআর পরিচালক একরকম বক্তব্য রেখেছেন আর খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলন করার পর আইএসপিআর তাদের বক্তব্য শুধু পরিবর্তনই করেনি রীতিমত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন।

খালেদা জিয়া স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা বলিনি খালেদা জিয়া স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা বলেছি, আমরা আশা করছি তিনি বাড়িটি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবেন।

সাংবাদিক ও আইনজীবীদের ঢুকতে না দেয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে আইএসপিআর পরিচালক বলেন, ক্যান্টনমেন্ট সংরক্ষিত এলাকা। সেখানে তারাই প্রবেশ করতে পারবেন যাদের প্রবেশের অনুমতি আছে।

বাড়ির আসবাবপত্র ভাংচুর সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে আইএসপিআর পরিচালক বলেন, ওখানে যারা আছেন, তারা অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি; সুতরাং সেখানে এ ধরনের ভাংচুরের ঘটনা ঘটার কোনা প্রশ্নই আসে না। (দৈনিক আমার দেশ ১৪ নভেম্বর)

আমার মনে হয় ঐদিন খালেদা জিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনায় জাতি যতটুকু মর্মাহত হয়েছেন তার থেকে কষ্ট পেয়েছেন আইএসপিআর এর নানামুখী ও রাজনৈতিক কৌশলপূর্ণ এ বক্তব্য শুনে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বিরোধীদলীয় নেতা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার উপর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচারের ভার দিয়েছেন আল্লাহ ও দেশবাসীর কাছে। তাই আসুন যাকে এসব আয়োজন তার মুখেই আমরা শুনি সে দিনের ঘটনা ।

বিরোধীদলীয় নেতা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাকে জোর করে এক কাপড়ে দীর্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাড়ি ও বাসার মূল গেট ভেঙে ওরা (আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য) ভেতরে ঢোকে। গ্রিলের নেট কেটে ও বেডরুমের দরজা ভেঙে আমাকে টেনেহিঁচড়ে বের করা হয় এবং ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, ওরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। বলেছে, 'উনি যদি না আসতে চায়- কোলে করে তুলে নিয়ে আসো'। 'আমাকে আজ সারাদিন যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তা বলতে পারছি না। সারাটা দিন আমি কিছু খেতে পর্যন্ত পারিনি। বলপূর্বক যেভাবে আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হলো কার কাছে আমি বিচার চাইব, এই বিচারের ভার আল্লাহ ও দেশবাসীর কাছেই দিলাম।'

নিজের গুলশানের কার্যালয়ে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে

www.amarboi.org

বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, 'আমাকে যেভাবে বাড়ি থেকে বের করা হয়েছে তাতে আমি শুধু অপমানিত ও লাঞ্ছিতই নই, লজ্জিতও হয়েছি।' বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, সাবেক সেনাপ্রধানের স্ত্রী স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার সহধর্মিণী এবং দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের চেয়ারপার্সন হওয়া সত্ত্বেও আমাকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ আজ কত অসহায়, কত কষ্টে আছে।

ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ মইনুল রোডের ৬নং বাড়িটির সঙ্গে তার স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিময় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আবেগ আপ্লুত খালেদা জিয়া বলেন, ৪০ বছরের স্মৃতিময় বাড়ি থেকে আমাকে জোর করে বের করে দিয়ে ওই বাড়ির সঙ্গে ছিন্ন করা হলো আমার সম্পর্ক। দীর্ঘদিনের সংসারের সব মালামাল রেখে আমাকে এক কাপড়ে বের করে দেয়া হয়েছে। এই বাড়িটি নিয়ে সরকার অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকার পরও মামলা নিষ্পত্তির আগেই এ বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিয়ে উচ্চ আদালতের সম্মানকে সরকার পদদলিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার ৯ মিনিটের সংক্ষিপ্ত মর্মস্পর্শীর্ষ বক্তব্যের সময় শুধু তার চোখ বেয়েই অশ্রু আসেনি উপস্থিত নেতাকর্মী এবং সাংবাদিকদের চোখেও পানি এসে যায়। চোখের পানি মুছতে মুছতে খালেদা জিয়া বলেন, ওই বাড়ির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার দুঃখ, বেদনা, সুখ ও আনন্দের নানা স্মৃতি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জীবন দেয়ার পর ওই বাড়িকে ঘিরে আমার আবেগ আরও বেড়ে যায়। আজ জোর করে সেই আবেগ ও স্মৃতিময় বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দেয়া হলো।

খালেদা জিয়া বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহীদ মইনুল রোডে আমার বাড়ি নিয়ে ক্যাবিনেটে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে। বেআইনি নোটিশ দিয়ে আমাকে বাড়ি ছাড়তে বললে আমি আদালতের শরণাপন্ন হই। উচ্চ আদালতে রায় হলেও আইন অনুযায়ী আমি আপিল করেছি। আগামী ২৯ নভেম্বর আপিলের শুনানি হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো। আইএসপিআর কর্মকর্তার বক্তব্য প্রসঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা বলেছে আমি নাকি বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি। তারা মিথ্যা কথা বলছে। এটা বানোয়াট, মিথ্যাচার। জোর করে ধাক্কা মেরে ওরা আমাকে গাড়িতে তুলেছে। এর আগে গ্রিল কেটে ওরা স্টাডি রুমে ঢুকেছে। বেডরুমের দরজা ভেঙ্গেছে। জিনিসপত্র তছনছ করেছে। এমনভাবে এলোমেলো করেছে... বলে মুখ চেপে ধরে খালেদা জিয়া প্রায় ৩০ সেকেন্ড কান্না করতে থাকেন। কাজের লোকদের আগেই ধরে নিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজনকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়"।

আইএসপিআর পক্ষ থেকে জানানো হয়, খালেদা জিয়া বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বলা হয় পুরো বাড়িটি ছিলগালা করা হয়েছে। অথচ পরেরদিন কয়েক

www.amarboi.org

বোতল মদ আর কয়েকটি পর্ণ ম্যাগাজিন খালেদা জিয়ার শোয়ার ঘরে রেখে নাটক সাজিয়ে সাংবাদিকদের দাওয়াত করে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা গোটা জাতিকে হতবাক করেছে, যে জাতি হিসাবে আমরা প্রতিহিংসার কোন পর্যায়ে অবস্থান করছি। এই নির্লজ্জ আঘাতটি সরকার না করলেও পারত।

আমার মনে হয় এদেশের জনগণ এখনো বিশ্বাসের ব্যাপারে এত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে নাই যে, বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, সাবেক সেনাপ্রধানের স্ত্রী স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার সহধর্মিণী এবং দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের চেয়ারপার্সন এর বক্তব্যকে একজন আইএসপিআর পরিচালকের বক্তব্যের তোড়ে সত্যটি বুঝতেই পারবে না। এমনটি হওয়ার কথা নয়। আমাদের দেশের ক্ষমতাসীনদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এদেশের সাধারণ মানুষ যে সব কিছু বোঝে, এটাই আমাদের রাজনীতিবিদরা বোঝেন না।

খালেদা জিয়ার কান্নাকে আজ নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন অনেকেই। কেউ বলেন যিনি জনগণের নেত্রী তিনি সামান্য একটি বাড়ি হারিয়ে এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়বেন ভাবা যায় না। কেউ বলছেন, জনতার সমর্থন আদায়ের এ এক রাজনৈতিক কৌশল। এগুলো খালেদা জিয়ার "কাটা গায়ে লবণের ছিটা" ছাড়া অন্যকিছু নয়। কারণ দেশের মানুষ দেখেছে- স্বামীর কফিনের সামনে দাঁড়িয়েও খালেদা জিয়া ছিলেন অবিচল। ওয়ান ইলেভেনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেননি। কনিষ্ঠ পুত্র হুইল চেয়ারে বসে যখন বুক ধরে কাতরাচ্ছিলেন তখনো খালেদা জিয়ার চোখে কেউ একবিন্দু অশ্রু দেখেনি। তিনি ওয়ান ইলেভেন নির্মিত কারাগারে আপসহীন নেত্রীর মতোই দৃপ্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেই নেত্রী যখন একটি সরকারি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেই সংবাদ সম্মেলনে বসে কান্নায় আঁচলে মুখ ঢাকেন তখন তা নিয়ে রসিকতা, ও ব্যঙ্গ করার সুযোগ কতটুকু সমীচীন তা ও আমাদের ভাবভার বিষয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী যে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন সেই বাড়িটি কি ছিল শুধুই কয়েকটি ঘরের সমষ্টি নয়। শুধুই আঙিনা জোড়া ফুলের বাগান অথবা ৮ বিঘা জমির বিশাল সীমানা অথবা রাত্রিবাসের ঠিকানা নয়। ওই বাড়ির প্রতিটি ইট-পাথরে ছড়িয়ে আছে ৩৮ বছরের হাজারো স্মৃতি। ওই বাড়িতেই মেজর জিয়াউর রহমান ধীরে ধীরে মেজর জেনারেল হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। ওইসব স্মৃতি অর্থমূল্যে কেনা যায়? তাই যারা ওই বাড়িটির আর্থিক মূল্য নির্ণয় করছেন এটি ও এক কদার্য রাজনীতি। তাই মনে হয় একজন বিষন্ন মানুষের নিকট থেকে সম্পদ নয় কেড়ে নেয়া হয়েছে সারা জীবনের স্মৃতি। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া এই বিচারের ভার আল্লাহ ও দেশবাসীর কাছে দিয়েছেন। একথা সত্য, আল্লাহর দরবারে মজলুমের চোখের পানি বৃথা যায় না।

● দৈনিক সংগ্রাম ২৯ নভেম্বর, ২০১০

www.amarboi.org

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব

১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ইতিহাসের বিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ব্যতিক্রম অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র নয় মাসের সংগ্রামের অর্জিত স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। যেখানে ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লাভ করতে লাগে ২৬ বছর। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর আন্দোলন করে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে নয় বছর ধরে লড়াই করে আলজেরিয়া পায় স্বাধীনতা। ইরেত্রিয়া রক্তাক্ত সংগ্রাম করে আজও ইথিওপিয়া থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারেনি। কাশ্মীরসহ ভারতের অনেক রাজ্য অব্যাহত রেখেছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বের ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের যে কয়টি অপরূপ স্বকীর্তি পৃথিবীর মানচিত্রে ঈর্ষনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা আমাদের স্বাধীনতা লাভের আগেও বিশ্ববাসীর অজানা ছিল না। তাইতো বিদেশী শকুনদের এই লোলুপতা এখনো আমাদের সোনার বাংলার প্রতি আর ব্রিটিশদের দুইশো বছরের গোলামি শাসন, পাকিস্তানিদের শোষণ,আর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছিল একই সূত্রে গাথা। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত হাঙ্গরের মত তার আসল চরিত্র নিয়ে হানা দিচ্ছে বাংলাদেশের উপর। এর অন্যতম কারণ আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি। ভারতের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা অবশ্য আওয়ামী লীগের ঐ নেতারাই বেশি প্রকাশ করেন, যারা যুদ্ধ না করে মুন্সিয়ানার মত ভারত পালিয়ে লজিং ছিলেন। এই জন্যে অনেক আওয়ামী লীগারদের-ই সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ভালো লাগে না, এক মন্ত্রীতো সেদিন বলেই ফেললেন "ভারত ও বাংলাদেশ চেতনায় এক ও অভিন্ন"। যাক যে কথা বলছিলাম, ভারত তার অভিন্ন স্বার্থে এগিয়ে চলছে। এর বড় প্রমাণ মিলবে ইটালীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচির "ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরি" গ্রন্থে। যিনি বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন। এই বইটি যে সমস্ত পাঠক পড়েছেন তারা যদি গোড়া আওয়ামী লীগার হন তাহলে সারা জীবন ওরিয়ানা ফালাচিকে অভিশাপ দিবে। আর যদি নরমাল আওয়মী

www.amarboi.org

লীগার হন তাহলে মনে হয় বলবে, শেখ মুজিবুর রহমানের মত ব্যক্তির একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাৎকারটি আরো সুন্দর এবং তার সাথে এমন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা ঠিক হয়নি। অনেক বাংলাদেশী নাগরিক-ই সাক্ষাৎকারটি পড়ে নিজে নিজেই অপমান বোধ করবেন। ওরিয়ানা ফালাচির সাক্ষাৎকারটি নিয়ে অন্য সময় লিখবো। ওরিয়ানা ফালাচি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ আপনার কাঙ্ক্ষিত মিত্র হবে। ইন্দিরা গান্ধী উত্তর দিলেন- "বাংলাদেশ ও আমাদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য একতরফা বন্ধুত্ব হবে না। প্রত্যেকেরই কিছু দেবার ও নেবার থাকে আমরা আমাদের পাওয়ার ব্যাপারে সব সময়ই সচেষ্ট "। যে আওয়ামী লীগের ব্যক্তিরা ১৯৭১ এর আগে বাংলাদেশের সম্ভাবনার কে স্বীকার ই করেন না, আর ভারতের প্রতি অন্ধ ভালবাসায় মগ্ন তারা কি বাংলাদেশে সম্ভাবনা নিয়ে ইতিহাসের এই বক্তব্য অস্বীকার করবেন?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিশ্ব ইতিহাসে বলেছেন, গুপ্ত আমলে আর্য সভ্যতার চরম সমৃদ্ধি ঘটে। এবং ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুপ্ত শাসনাধীনে আসে। গুপ্তদের সময় এ দেশে এক উন্নত সভ্যতা, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা এবং জনসাধারণের মধ্যে অর্থ প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ এক সুমহান ঐতিহ্যের প্রশংসায় বিদেশীরা উচ্চকিত হয়েছেন। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকের গ্রিক ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস বাঙালির রণসম্ভার, বিশেষত যুদ্ধহস্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আবার সতের খ্রিস্টাব্দের শেষে মির্জা নাথান বাহারিস্তান-ই গায়েবীতে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খার নৌবহরের তারিফ করেছেন–যে নৌবহরের অবস্থান ঢাকায়। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ডিগবী সাহেবের অভিমত ছিল বাংলাদেশ ব্রিটেনের চাইতে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী। খ্রিস্টজন্মের পূর্ব থেকে বাংলাদেশ শৌর্য-বীর্য ও সমৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিশ্রুত। প্লিনি, টলেমি, প্লুটার্ক, ডায়োডোরাস প্রমুখ গ্রিক ধ্রুপদী ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিককালের রুশ ঐতিহাসিকগণ এ তথ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসবেত্তা টলেমি বলেছেন, গঙ্গে বন্দরের নিকট ছিল সোনার খনি। "নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা আর ফরিদপুরের সোনারং, সোনারগাঁ, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস সম্ভবত জড়িত। এই সব জনপদের নদীগুলিতে প্রাচীনকালে বোধ হয় গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা পাওয়া যেত।"

মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন (১৫৩৮ খ্রিঃ)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদাবলি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হন এবং এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। এই জান্নাতাবাদ-ই যুদ্ধ পরবর্তীতে পরিণত হলো নরকে। সেই ভয়াবহ চিত্র বিদেশী সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ

www.amarboi.org

বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড বইতে এই ভাবেই বর্ণনা করেন-

"আওয়ামী সশস্ত্র সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দলের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদিতে চতুর্দিক থমথমে হয়ে উঠলো। মন্ত্রিপরিষদ আর সরকারি আমলাদের পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী ১০ দিনের মধ্যে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র সারেন্ডার করার নির্দেশ দিলেন। মানব দেবতার বৃষ্টি হবার নির্দেশ দানের মত এবারের বেআইনি অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশও দারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। সময়সীমা বাড়ানো হলো। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও মুজিবের আনুগত্য স্বীকার করলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩০ হাজার বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র জমা পড়লো। যদিও ধারণা করা হয়েছিল লক্ষাধিক অস্ত্রের। শেখ মুজিব এবং তার পরবর্তী খন্দকার মোশতাক আর জেনারেল জিয়াউর রহমান কেউই বাকি অস্ত্রের সন্ধান করতে পারেননি।

১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি কোলাবরেটর আইন পাস করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে ৯ মাসব্যাপী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন যারা তাদের সক্রিয় সহযোগিতার নামে দালালি করেছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। এ আইনও দেশে গোলযোগ আর গণমানুষের হয়রানির হাতিয়ারে পরিণত হলো। বহু সক্রিয় হানাদার বাহিনীর দালালও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পেল। অন্যদিকে বহু নির্দোষ ব্যক্তিও ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। এমনকি কোর্টে দালালির অভিযোগে রাজাকার, আল-বদর ইত্যাদিদের বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদান করা হতো, সে কোর্টের হাকিম নিয়োজিত হয়েছিলেন রাজাকার সর্দার। সম্পূর্ণ বিষয়টি ন্যায়বিচারের অভিনয়বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত এ অভিযানের সমাপ্তি টানলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছে গেছে।"

এদিকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী বলেন, সরকারকে হটাতে হলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন। তিনি বলেন, তার বয়স ৯১, বয়স থাকলে তিনিই এই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি আরো বলেন, যারা বিপ্লব করবেন তাদের জন্য আমি দোয়া করি। যারা সশস্ত্র হামলা করবে তাদের তিনি বাংলার বীর সেনানী আখ্যা দেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের উল্লেখ করে বলেন, 'ক্ষমা চাই। সমানাধিকার চাই। রাষ্ট্রপতি আদেশের ৫০ ও ৮ ধারা বাতিল করার দাবি জানান। এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন, 'জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত আছেন। মনে হচ্ছে, এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য।' তিনি বলেন, 'যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর

www.amarboi.org

শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না।' তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন বলেন, '১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারে উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাক বাহিনীকে সমর্থন দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগ বাধ্য হয়েছেন।'

এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।' তিনি জাতির এই জরুরি মুহূর্তে 'বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে বর্বরতা চালিয়েছে তার জন্য পাকিস্তানের গভীর অনুশোচনা ও নিন্দা প্রকাশ এবং বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর 'ক্ষমা করো এবং ভুলে যাও' আবেদনে বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে তার বাকি নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। সম্পাদিত দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী ত্রিমুখী লোক বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে তার অবশিষ্ট নাগরিকদের ফিরিয়ে নেবে এবং তার কোনো সংখ্যাসীমা নির্দিষ্ট থাকবে না।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে দু'টি দেশের এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭২ সালে ২রা জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিমলায় একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতদিন ধরে মোকাবেলা ও সংঘর্ষের কারণে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিঘ্নিত হচ্ছিল, সে জন্য তাঁরা সম্পর্ক গড়ে তোলা ও উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার সঙ্কল্পের কথা চুক্তিতে বলা হয়। চুক্তিতে তাঁদের মধ্যকার বিরোধ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা পরস্পরের স্বীকৃত অন্য কোন শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাধান করার কথাও বলা হয়েছে।

১৯৭২ সালে দালাল আইন জারির পর হতে ১৯৭৩ সনের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড়া ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাস পান। অর্থাৎ অভিযোগকৃত ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মাসে

www.amarboi.org

১৩০টি এবং দিনে $^{৩}/_{৪}$টির বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

উত্তেজিত গরম মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো এবং দালাল আইনে ধৃত এবং বিচারে সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলছিলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। তাহলো-

এক. আপাত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুতার নেপথ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ হলো 'কমপ্যাক্ট সোসাইটি। আবহমানকাল থেকে শাশ্বত গ্রাম্য সালিস বিচার ব্যবস্থার প্রচলনে গ্রামীণ সমাজে যে ভারসাম্য বর্তমান ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সময় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা নতুন আঙ্গিকে ও নেতৃত্বে স্থিতিশীল হয়ে আসতে শুরু করলে মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা কেটে যেতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাগণও সমাজের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকেন।

দুই. স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীতে উত্তেজনা প্রশমনে, রক্তের বন্ধন, আত্মীয়সূত্রতা এবং সমাজ গোষ্ঠীর বন্ধনে অপরাধকৃত দালালদের আশ্রয় দেবার ব্যাপক প্রবণতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

তিন. 'ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ' এই মহানুভবতার চিরন্তনী আবহে লালিত বাংলার মানস গঠন শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সামাজিক সালিস ও সমঝোতার পথেই অগ্রসর হয়েছে।

চার. মুক্তিযুদ্ধে একই পরিবারে পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে, অপর দিকে পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পিতা ও পুত্রের এই বিপরীত অবস্থান দীর্ঘদিন আক্রোশী মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাপুত্র দালাল পিতাকে বাঁচানোর জন্য তদবির শুরু করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

পাচ. অনেক দালাল এমন ছিলো যে, তারা গোপনে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে এবং প্রয়োজনমত নিরাপত্তাও দিয়েছে। দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তিটি পরবর্তীকালে ঐ সব মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং আশ্রয় পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থায় বা ভিন্নভাবে যাই হোক না কেন. মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রায় দু'হাতে ধৃত ও অভিযুক্ত দালালদের ছেড়ে দেবার সুপারিশ করতে থাকে। যা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দফতরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে তোলে।

ছয়. গ্রাম্য সালিস, দেন দরবার, তদবির, হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাকার কারণে পরবর্তীকালে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত বাদি পক্ষগণ মামলা চালাতে উদ্যাগ গ্রহণ হতে পিছিয়ে আসে, এমনকি মামলার ন্যূনতম সাক্ষ্য জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সাত. বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সরকারি পর্যায়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ/শীর্ষ পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব ও বঙ্গবন্ধুর নিকট দালাল ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ দালাল আইনে আটক ও

www.amarboi.org

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে বলেন-দলমত নির্বিশেষে সকলেই যাতে আমাদের মহান জাতীয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে পারে সরকার সেজন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ দালাল আদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে এবং আসন্ন ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের উৎসবে যোগদান করতে পারেন বঙ্গবন্ধু সেজন্য তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ ক্ষমায় যারা মুক্তি পাবেন তাদের বিজয় দিবসের উৎসবে একাত্ম হতে এবং দেশ গঠনের পবিত্র দায়িত্ব ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে তিনি উদ্যোগের পেছনে দেশ গঠনের পবিত্র দায়িত্ব পালন ও জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন্ ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, মুক্ত হয়ে দেশ গঠনের পবিত্র ও মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন এবং তাদের অতীতের সকল তৎপরতা ও কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তিনি এটাই কামনা করেন।

তিনি বলেন, বহু রক্ত ত্যাগ তিতিক্ষা আর চোখের পানির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। যে কোনো মূল্যে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এবারের বিজয় দিবস বাঙালির ঘরে ঘরে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আ.সমাজের ভূমিকা পৃ.২৪৮)

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের এই ঘোষণাকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে তৎকালীন জাতীয় নেতারা অভিনন্দিত জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে বলেন, 'আরো আগেই দেশের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিলো। এর ফলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবেন বলে তিনি আশা করেন।

দালাল আইনে অভিযুক্তদের ক্ষমা প্রদর্শন করায় প্রবীণ রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'জনগণের ভাগ্যকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সঠিক পন্থায়ই বেছে নিয়েছেন। গণতন্ত্রের এ উদ্যম বজায় থাকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।'

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের এই ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।

www.amarboi.org

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, 'আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়াছেন, ষোলো হাজারের মতো বন্দীকে মাফ করিয়ে দিয়েছেন, তখন বাকি সবার ক্ষেত্রে তেমনি উদারতা প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চার শ লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হইল, বার বছর পর (৩৭ হাজার দালালের বিচারে ১২ বছর লাগবে)। মানে গ্রেফতারের সময় হইতে চৌদ্দ বছর পর আরো অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে।" (ইত্তেফাক ২ রা নভেম্বর '৭৩।

শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধোপরাধীদের বিচার করতে চাননি এটি বললে হয়ত তার উপর অবিচার করা হবে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি সফল হতে পারেনি। এর অনেকগুলো কারণ ছিল, সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড বইতে এই ভাবেই তা বর্ণনা করেন-"আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাস, দলের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদিতে চতুর্দিক থমথমে হয়ে উঠলো তাছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ব্যর্থ হলেন। দলের অভ্যন্তরীণ ও নিজ আত্মীয় স্ব-জনের বেপরোয়া ভাব ছিল সবচেয়ে আলোচনা ও সমালোচনা ব্যাপার। তাছাড়া সদ্যজাত বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও অবকাঠামো এবং ক্রমাবনতিশীল আইনশৃঙ্খলার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তেলের উর্ধ্বমুখী মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো তারই ভয়াবহ প্রভাব বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে এক বিপর্যয়কর আবর্তে টেনে নেয়। এর সঙ্গে ভয়াবহ খরা এবং অভূতপূর্ব বন্যায় ফসল নষ্ট ও ফসল ডুবে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে।" গোটা পরিস্থিতি বর্তমান সময়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর মতই নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে গোটা সংগঠন। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মওলানা ভাসানীসহ জাতীয় সকল নেতারা প্রবল বিরোধিতা করেন। শেষ অবধি শেখ মুজিবুর রহমান এই বিচারের কাজ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। বলা যায় তিনি প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ও সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কি বাবার সমাধানকৃত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি জাগিয়ে তুলে মূলত বাবার সাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন কি? এখন দেখার ব্যাপার এই প্রতিযোগিতার ফলাফল কি দাঁড়ায়। সম্ভবত শেখ হাসিনা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিযোগিতায় তার বাবাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর না হয় শেখ হাসিনা হলফ করে বলবেন কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে আপনার বাবা মহাভুল করেছিলেন, আর আপনি আপনার বাবার সেই ভুলের সমাধান কল্পে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এই মহৎ উদ্যোগটি গ্রহণ করেছেন।

www.amarboi.org

শেখ মুজিবুর রহমানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে সাংবাদিক অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড বই এর একটি বাক্য দিয়ে লেখাটির সমাপ্তি টানছি- "যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের অভিনয়বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত এ অভিযানের সমাপ্তি টানলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছে গেছে, দেশ নিমজ্জিত হয়েছে গভীর সঙ্কটে।" এখনে কি সরকার ঐ একই পথে হাঁটছে?

● দৈনিক সংগ্রাম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১

www.amarboi.org

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের তথাকথিত
জ্ঞান ও নতুন প্রজন্ম

গত ১৬-ই ডিসেম্বর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট কলামিস্ট জনাব আসিফ নজরুল "যে বিচার করতেই হবে।" শিরোনামে একটি কলাম লিখলেন। আমি তার লেখার একজন নিয়মিত পাঠক। তিনি সাধারণত বড় লেখা কমই লিখেন। কিন্তু এ লেখাটি বেশ বড়। হয়ত তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে একটু বেশি আন্তরিক হওয়াই একটু দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন!! গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রই হলো স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা। সেই জায়গা থেকেই তাঁর লেখার ব্যাপারে আমার মত একজন ক্ষুদ্র পাঠকের এই সামান্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। যে কোন বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে মতামত থাকতে-ই পারে। কিন্তু নিজের মতামতকেই একশতভাগ সত্য মনে করা কোন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়। তাই আমার ব্যাপারে ও সেই একই কথাই প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস জনাব আসিফ নজরুল সাহেব একজন আইনের শিক্ষক হিসেবে এ কথা খুব ভালো করেই জানেন আবেগ ও সংশয় এই দুটো বিষয় বিচার কাজে আলাদা রাখতে হয়। কিন্তু আপনি লেখাটি শুরু করেছেন জাহানারা ইমামের মৃত্যুর আবেগময়ী বর্ণনা দিয়ে আর নিজামী আর মুজাহিদ সাহেব কে যুদ্ধাপরাধী মনে করেন সন্দেহ সংশয়ের ভিত্তিতে।

আমি জানি না জনাব আসিফ নজরুল সাহেব আপনার বয়স কত। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে আপনি একেবারে পাক্কা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না একথা মনে হয় সত্য। আর যদি নিজামী আর মুজাহিদদের অপকর্মের আপনি প্রত্যক্ষ্যদর্শী হয়ে থাকেন তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে ট্রাইবুনালের সাক্ষী তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তি করার। সেই দুঃসাহস দেখাতে পারবেন কি? তাছাড়া শাসক দল রাজনৈতিক বিবেচনায় বিরাধীদল দমন করতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছে। আর আওয়ামী লীগ এখন সব জায়গায় যুদ্ধাপরাধীর গন্ধ খুঁজছে। তারা নিত্যনতুন যুদ্ধাপরাধী আবিষ্কার করেই চলছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের দৃষ্টিতে মেজর জলিল, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী যুদ্ধাপরাধী। মহাজোট সরকারের মন্ত্রীরা হর হামেশায় বলে থাকেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধিনতার ঘোষণাকারী মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে যুদ্ধাপরাধ করেছেন। এমনকি তিনি নাকি পাকিস্তানের দালাল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন!!! এরকম অনেক আজগুবি গল্প আঁটছে ক্ষমতাসীনরা।

www.amarboi.org

জনাব আসিফ নজরুল সাহেব নিশ্চয় জানেন, ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি কোলাবরেটর আইন পাস করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে ৯ মাসব্যাপী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন যারা তাদের সক্রিয় সহযোগিতার নামে দালালি করেছে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা। এ আইনও দেশে গোলযোগ আর গণমানুষের হয়রানির হাতিয়ারে পরিণত হলো। বহু সক্রিয় হানাদার বাহিনীর দালালও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পেল। অন্যদিকে বহু নির্দোষ ব্যক্তিও ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। এমনকি কোর্টে দালালির অভিযোগেরাজাকার, আল-বদর ইত্যাদিদের বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদান করা হতো, সে কোর্টের হাকিম নিয়োজিত হয়েছিলেন রাজাকার সর্দার। সম্পূর্ণ বিষয়টি ন্যায়বিচারের অভিনয় বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত এ অভিযানের সমাপ্তি টানলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছে গেছে। এ ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা।

১৯৭২ সালের ২রা জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিমলায় একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার সঙ্কল্পের কথা চুক্তিতে বলা হয়। ১৯৭২ সালে দালাল আইন জারির পর হতে ১৯৭৩ সনের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড়া ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাস পান। অর্থাৎ অভিযোগকৃত ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের তিন-চতুর্থাংশই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টি এবং দিনে $^{৩}/_{৪}$টির বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমাদের

কলামিস্টদের ভুলে গেলে চলবে আপনারা যেমনি ঘটনার বিশ্লেষণ করেন তেমনি আপনাদের বিশ্লেষণের জন্যেও প্রচুর সচেতন পাঠক সৃষ্টি হয়ে পড়েছে আপনাদের আসল উদ্দেশ্যে উদঘাটন করার। তাছাড়া শর্মিলা বসুরাও রয়েছে ঘটনার নির্মোহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্যে। সেই ইতিহাস কে পাস কেটে যারা হঠাৎ করে রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিরোধ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অতিউৎসাহী হয়ে ওঠেন তখন অনেক প্রশ্নের জন্ম হয় সাধারণ মানুষের মনে।

জনাব আসিফ নজরুল সাহেবরা মনে করেন আন্তর্জাতিক আইনের যে অংশ মানলে নিজামী আর মুজাহিদদেরকে দোষী প্রমাণ করা যাবে না, সেই অংশ মানা যাবে না। জামায়াতে ইসলামীর যে সকল নেতাদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে জেলে নেয়া

www.amarboi.org

হয়েছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব ক্ষমতা পেয়ে, যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে যত মানুষ গ্রেফতার করিয়েছিলেন এবং মাফ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই নেতাদের মধ্য থেকে কোন একজন এক ঘণ্টার জন্যও গ্রেফতার হয়েছিলো কি? বাংলাদেশের কোন থানায় মামলা অথবা জিডি হয়নি। তাহলে ৪০ বছর পর কেন বিচারের নামে এই প্রহসন।

কিন্তু পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের মেহমানদারি করে বিদায় করে দিয়ে আজ দেশের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের দমনই আসল উদ্দেশ্য নয় কি? পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য সহযোগী বাহিনী যেমন আল-বদর, আল-শামস কারা গঠন করেছিল? সাধারণ পাবলিক না তৎকালীন সরকার? যদি সরকার গঠন করে থাকে তা হলে সাধারণ পাবলিক দায়ী হবে কেন? সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, ডিসি, এডিসি, সার্কেল অফিসার যারা নয় মাস সরকারি চাকুরী করেছে, গুণকীর্তন করেছে, আল-বদর আল-শামসকে বেতন দিয়েছে তাদের বিচার হবে কি? তৎকালীন নির্বাচিত চেয়ারম্যানরাই রাজাকার আল-বদর, আল-শামস-এর দায়িত্বে ছিলেন। আর সেই সময় জামায়াতের কোন চেয়ারম্যান আদৌ ছিল কি? পুরা নয় মাস যারা পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানের পক্ষে জয়গান গেয়েছে, লেখালেখি করেছে, রেডিও, টেলিভিশনে আকাম-কুকাম করেছে তাদেরই বা খবর কি? বামপন্থী আর মুসলিম লীগের অবস্থাই বা কী হবে। গবেষণা বলতে আমি ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝি উপরিক্ত ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণ করা। তার মানে প্রতিপক্ষ দমন কোন বিচারের আসল উদ্দেশ্য হলে তা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য অবিচার। আর প্রতিবাদ করা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য।

জনাব আসিফ নজরুল লিখেছেন- "আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেসব প্রভুরাষ্ট্র আমাদের এসব পরিবর্তনের উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে গুরুতর অপরাধের বিচার করে না। কিন্তু বাংলাদেশ সেসব রাষ্ট্রের মতো শক্তি, বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী নয়। ফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড যতটুকু পালন করা বিচারের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, তা মেনে ১৯৭৩ সালের আইনটির সংস্কার করলে তা ভালো হতো।" অর্থাৎ শাস্তি দেওয়াই আপনার কাছে মুখ্য!!! মানদণ্ড রক্ষা করার কোন মুখ্য বিষয় নয়। মজার বিষয় সেই কথাটি জনাব আসিফ নজরুল সাহেব আবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জনাব আসিফ নজরুল লিখেছেন "যেমন, রোম সংবিধি অনুসারে মানবতাবিরোধী অপরাধের শর্ত হচ্ছে অপরাধটি পরিকল্পনা মাফিক ও ব্যাপক (সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড ওয়াইডস্প্রেড) হতে হবে। আমাদের ১৯৭৩ সালের আইনে এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায়? ১৯৭১ সালে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠন করে, রীতিমতো বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। কাজেই এটি অবশ্যই পরিকল্পনা মাফিক হয়েছিল। আবার বহুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল বলে এটি অবশ্যই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ছিল। কাজেই

www.amarboi.org

রোম স্ট্যাটিউটের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে যাদের আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে জানি, তাদের বিচারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না" । অর্থাৎ জনাব আসিফ নজরুল জামায়াত নেতাদের শাস্তি দিতে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় এমন কতকগুলো আইন পরিবর্তন করে নেয়ার পরামর্শ দিলেন যাতে প্রভুরা ও খুশি থাকে আর শাস্তিও দেয়া যায় । বাহ কী চমৎকার বিশ্লেষণ আর নিরপেক্ষ পরামর্শেও উত্তম নমুনা!!! অথচ একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ন্যায় বিচারের পরামর্শ-ই প্রত্যাশা ছিল কিন্তু তিনি আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিরোধের জায়গা থেকে বের হতে পারলেন তা দুঃখজনক ।

জনাব আসিফ নজরুল সাহেব লিখেছেন, "আবার রোম সংবিধিতে অপরাধীর বয়স নির্ধারণ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের অপরাধের দায় থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে । এই বিধান আমরা গ্রহণ করলে অসুবিধা কী? সরকার যাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করেছে, তাদের কেউই ১৯৭১ সালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল না । তাহলে এ ধরনের আইনগত সংস্কার করলে সমস্যা কোথায়? যেসব সংস্কার করলে ক্ষতি নেই, তা করে সরকার বিশ্বব্যাপী এই বিচারের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াতে পারত ।" অর্থাৎ যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে আপনি তাদেরকে অপরাধী হিসেবেই চিহ্নিত করে নিয়েছেন । কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন আইনে বলা আছে- যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নিরপরাধ যতক্ষণ না কোন আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ।

আমরা ইতপূর্বে ১৯৯২ - ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এবং তদানীন্তন এটর্নি জেনারেল জনাব আমিনুল হক বিচারককে বললেন, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে অধ্যাপক গোলাম আযম অনেক অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন । তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তিনি তিন লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ করেছেন..... অধ্যাপক গোলাম আযমের আইনজীবী ব্যরিস্টার এ, আর, ইউসুফ মাঝ পথে এটর্নি জেনারেলকে থামিয়ে বললেন । মাননীয় বিচারক, ৩ লাখ ৮০ হাজার মিনিটের লড়াইয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আর আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে ৩ লক্ষ নারী নির্যাতনের অভিযোগ আনা হল! সেই হিসেবে উক্ত রেকর্ড পরিপূর্ণ করতে প্রতি দেড় মিনিটে একজন করে নারী নির্যাতন করতে হবে । একজন মানুষ হিসেবে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ গ্রহণ যোগ্য নয় । পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষেই এ ধরণের দুরূহ কাজ করা সম্ভব নয় । আপনি এই যুক্তি আমলে নেবেন না । যুক্তির মাধ্যমে কথাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবার ফলে মাননীয় বিচারক সামান্য সময়ের জন্যও এটর্নি জেনারেলের দাবিকে গ্রহণ করেনি । আর সেই গোলাম আযম-ই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক নাগরিকত্ব লাভ করলেন ।

জনাব আসিফ নজরুল সাহেব লিখেছেন "বাংলাদেশের মানুষকে নিষ্ঠুর কিছু দৃশ্য

www.amarboi.org

দেখতে হয় এ সময়ে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত জামায়াতের নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রী হন ২০০১ সালে গঠিত বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারে। যে বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন, সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে পাঁচ বছর তাঁরা ঘুরে বেড়ান রাজকীয়ভাবে।" জনাব আসিফ নজরুল সাহেবের সম্ভবত জানা আছে নিজামী ও মুজাহিদ মন্ত্রী হওয়ার যাতনা যারা সইতে পারে নাই তারা ২০০৭ সালে তারাই তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নতুন করে ভারত থেকে আমদানি করেছে। তাছাড়া ওয়ান ইলেভেনের সেই জাহেলিয়াতের সময়েও নিজামী আর মুজাহিদের বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তা দেখে আপনাদের মতো বুদ্ধিজীবীরা কৃতজ্ঞ হতে পারবেন না। আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীই নিরপেক্ষতার ভেক ধরে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

যারা জোর গলায় বলছেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে বিচারের কাজ চলছে তারা কি বলবেন, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য একজন চুরি ও যৌতুকের মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি, বাটপার ভুয়া মুক্তি যোদ্ধা ছাড়া একজন ভাল মানুষ পাওয়া গেল না কেন? এই সাক্ষীর জেরার উত্তরগুলো শুনলে যে কেউ বলে দিতে পারবে এটা ভুয়া সাক্ষী। আপনাদের ভাষায় আন্তর্জাতিক আদালতে এরকম একটা বাটপারের সাক্ষ্যদান কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তা যদি আইনের ভাষায় জনাব আসিফ নজরুল সাহেব ব্যাখ্যা করতেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম।

জনাব আসিফ নজরুল সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন, "১৯৭৩ সালের আইনটির কিছু দুর্বলতার সমালোচনা দেশে-বিদেশে হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন এই আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল নিজেদের রিসার্চ থেকে এবং হয়তো যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লবিংয়ের কারণে। এসব প্রশ্ন তোলার সুযোগ অনেকাংশে সংকুচিত করার সুযোগ থাকলে তা করা উচিত বলে আমি মনে করি।" জনাব আসিফ নজরুল সাহেবদের মনমত হলে আমেরিকা ন্যায় বললো আর এই আইনের সমালোচনা করলে মনে করেন আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন হয়তো যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লবিংয়ের কারণে আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এই মনগড়া বক্তব্য জাতি আপনাদের নিকট প্রত্যাশা করে না।

তিনি নিজেই লিখলেন-'ট্রাইব্যুনালের সরকারপক্ষের আইনজীবী ও তদন্তকারী দলগুলোর সক্ষমতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এদের অবশ্যই আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞদের আইনজীবীদের দলে কিংবা বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছেন যাঁরা, তাঁদের তদন্তদলে রাখলে কোনো সমস্যা হতো কি? বর্তমান ভবন পুরাপুরি খালি করে সেখানে একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা খুব দূরের কি? বিচার কবে শেষ হবে, কোনো মন্ত্রী কর্তৃক এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়ে বিচার কাজে হস্তক্ষেপের

www.amarboi.org

অভিযোগ উসকে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি? বিরোধী দলের সব কর্মসূচিকে ঢালাওভাবে বিচার বন্ধের ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা সঠিক হচ্ছে কি? এসব প্রশ্ন সরকার যদি নির্মোহভাবে বিবেচনা করে, তাহলে তা বিচারের জন্য সহায়ক হবে।" ন্যায় বিচারের স্বার্থে দেশী বিদেশীদের সেই পরামর্শের সরকার কি কোন তোয়াক্কা করছে? জনাব আসিফ নজরুল সাহেব জাহানারা ইমামের মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন । আমি ও জাহানারা ইমামের মৃত্যুর কালের বর্ণনা দিয়ে শেষ করছি । তার জিহবায় কেনারে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পরে মরা পর্যন্ত আর কথা বলতে পারেনি। জিহ্বা থেকে নাকি দুর্গন্ধ বের হত, পুঁজ পড়ত, পানি গিলার সময় পুঁজসহ গিলতে হত। হাদীসে বলা হয়েছে "আজ জুলমু জুলুমাত।" যে অত্যাচার আর জুলুম তুমি আজ করলে, এটাই একদিন তোমার ওপর আরও বড় অভিশাপ, অন্ধকার হয়ে আসবে। সেটা আখেরাতে না, দুনিয়াতেই। আমাদের আইনেও একথা অন্য ভাবে বলা হয়েছে- "দশ অপরাধীও যেন মুক্তি পেয়ে যায়, কিন্তু একজন নিরপরাধও যেন শাস্তি না পায়।

জনাব আসিফ নজরুল সাহেব লিখেছেন, "লেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি সেভাবে। কিন্তু বিএনপির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের একটি বক্তব্যের পর কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, এ নিয়ে লেখার প্রয়োজন আছে। দেশে বিদেশে এই বিচারের আন্তর্জাতিক মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য জনাব আসিফ নজরুল সাহেবের লেখায় বুঝতে পারলাম না তিনি কোন মানদণ্ডে এই বিচার চান। আবার তিনি নিজেই এই প্রশ্ন গুলো উত্থাপন করে লিখলেন, "শুধু কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া নয়, কেবল ক্ষুদ্র কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, এসব অপরাধের বিচার করতে হয় ঐতিহাসিক অন্যায়কে চিহ্নিত করার জন্য, জাতির ইতিহাসের কলঙ্ক মোচনের জন্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জাতিগত দায়বদ্ধতা পালনের জন্য।" আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও দোহাই দিয়ে আজ জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত আর দুর্বল করার গভীর ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়নের উদ্যোগটিই গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ এবং তার দোসররা। এজেন্ডা বাস্তবায়ন হচ্ছে ভারতের। ছিনিয়ে নিচ্ছে আমার মানচিত্র। প্রতিনিয়ত বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে নিরীহ ফেলানীদের হত্যা, টিপাইমুখ বাঁধ, আর তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে ভারতের এক রোখা নীতি, ভারত নিজেদের স্বার্থেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার সাক্ষ্য বহন করছে না? কারণ আমিও নতুন প্রজন্মের একজন। তথাকথিত জ্ঞান দিয়ে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। নতুন প্রজন্ম এখন গ্লোবাল পৃথিবীর নাগরিক হিসেবে অনেক বেশি সচেতন।

www.amarboi.org

সংবিধান সংশোধনীঃ সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের সবক

বর্তমান সময়ে "ট্যাক অব দ্যা কান্ট্রি" সংবিধান সংশোধনের বিতর্ক। এই নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল প্রতিদিন- ই নতুন নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। সরকার সংবিধান সংশোধনকে জায়েজ করার জন্য বিশিষ্ট নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকদেরসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করছে। তাদের-ই একজন গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক হিসেবে খ্যাত লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেব। অবশ্য সম্প্রতি একটি লেখাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাকে কোর্টে সশরীরে হাজির করে বিভিন্ন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। এ কারণেও সম্প্রতি তিনি আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন। যদিও তার মতো একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে যে ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমিও কষ্ট পেয়েছি। এরপর থেকে তার লেখা খুব একটা নজরে পড়েনি আমার। গত ১০/০৫/১১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো, পত্রিকায় সংবিধান সংশোধন খুউব সাবধান" শিরোনাম প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমি মুখে বলা ছাড়াও সংক্ষেপে লিখিতভাবে কয়েকটি পয়েন্ট দিয়েছি। তাতে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও "সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি' বর্জন করার পরামর্শ রয়েছে।" উল্লেখ্য আমার কাছে এযাবৎ কালে সৈয়দ আবুল মকসুদের এ লেখাটি সবচেয়ে অ-প্রাসঙ্গিক ও খৈই হারিয়ে ফেলা মাঝির মতোই মনে হয়েছে। যদি লেখার শিরোনামের সাথে তিনি সুবিচার করতে তো পারেন নি বরং লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই অ-সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এটি কখন হয়, যখন কোন মানুষ কোন ব্যক্তি, দল বা আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠেন। আর তখনই বে-ইনসাফী আক্রমণ করে মূলত খৈই হারিয়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যান। সৈয়দ আবুল মকসুদ হঠাৎ করে এত ধর্মবিদ্বেষী হয়ে ওঠার উদ্দেশ্য কাউকে পুষিয়ে দেয়া অথবা খুশি করার ওয়াদা থেকে করেছেন কি? তিনি নিজেকে ধর্ম কর্মের ব্যাপারে কি ভাবেন তা আমি জানি না। কিন্তু নামের দিক থেকেও একজন মুসলমান হয়ে তিন সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই বর্জনের পরামর্শ দিয়ে খুবই উল্লসিত হয়েছেন কেন? মনে হচ্ছে এখনই যেন মরহুম শহীদ প্রেসিডন্ট জিয়াউর রহমানের বিচার করতে পারলে তার আত্মা শান্তি পেত। এই জিঘাংসার ভাব কেন সৈয়দ আবুল

www.amarboi.org

মকসুদ সাহেবদের।

অথচ একজন গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক হিসেবে সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের নিশ্চয়ই জানা আছে- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা Fundamental Principles of State Policy আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে অনেকে অনেকভাবে বিশেষায়িত করেছেন; যেমন (ক) প্রণত আদর্শ (bean ideals), (খ) অনুভূতির প্রকৃত 'ডাস্টবিন' (veritable dustbin of sentiments), (গ) সংবিধানের অলঙ্কার (decoratives in the constitution), এবং (ঘ) উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা বা 'ম্যানিফেস্টো' (manifesto of aims and aspirations)।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদে প্রতিফলন ঘটেছে। বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হবে।" এবং "সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি।" অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে এমন কিছু অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করে। এটি এমন কিছু মৌলিক নীতি যেগুলো কোন রাষ্ট্রের সংবিধানের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলসূত্র বা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। সংবিধানের মূলনীতি নিয়ে খেলা করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়নকালে এগুলোকে বিবেচনা ও প্রয়োগ করে তথা এমনভাবে আইন তৈরি করে যাতে করে এসব মূলসূত্রের প্রতিফলন ঘটে। দেশের সংবিধান এবং অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে এগুলো নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এমনকি রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হয়। কিন্তু সংবিধানের অঙ্গ হলেও এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

এগুলো প্রতিটি দেশের মানুষের আস্থা বিশ্বাস, তাহজিব ও তমুদ্দুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঠিক করতে হবে। বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি এদেশের মানুষের আস্থা বিশ্বাস, তাহজিব ও তমুদ্দুনের প্রতিচ্ছবি। এর পরিবর্তনের এখতিয়ার শুধুমাত্র জনগণের অন্যকারো নয়। বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বাংলাদেশের সংবিধানে থাকবে কী থাকবে না তার সাথে কারো ইসলাম প্রীতি ও ভীতির ব্যাপার নয়। এটি ৯০% মুসলমানের দেশের বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলে এদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা তা কখনও মেনে নেবে কি?। তা ভেবেই সংবিধানের সংশোধন করতে হবে।

জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবরা তো কথায় কথায় গণতন্ত্রেও দোহাই দেন।

www.amarboi.org

যদি অধিকাংশের মতের বহিঃপ্রকাশ-ই গণতন্ত্র হয়, তাহলে বাংলাদেশের ৯০% মুসলমানের বিশ্বাস ও আস্থা সংবিধানে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিক নয় কি? এখানে এসে আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ভুলে যাই কেন? বরং বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকাটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অ-গণতান্ত্রিক হয় না? এখানে নিপীড়নমূলক সেক্যুলার ইজমকে টেনে নিয়ে এসে বিচার করলে চলবে না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি এতই উদার হয় তাহলে এ কয়েকটি কথা সংবিধানে যেহেতু আছেই তাহলে থাকতে সমস্যা কোথায়?

পাশ্চাত্যের অন্তত চল্লিশটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্ম হয় ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টবাদ। এর অর্থ হচ্ছে, দেশগুলো ওই সব ধর্মের নীতিবোধ ও মূল্যমান অনুসরণ করবে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বে অনেক দেশে যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়েছে বা বাংলাদেশে করা হয়েছে, তা সঙ্গতই হয়েছে।"

তিনি লিখেছেন, "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অত্যন্ত জঘন্য রাজনীতি। তা উদার গণতান্ত্রিক আদর্শের শত্রু। তা মানুষে-মানুষে বিভেদের জন্ম দেয়। সংহত জাতি গঠনের পথে তা শক্ত বাধা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পৃথিবীর প্রতিটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রয়েছে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি তো ইউরোপের দেশে দেশে আছেই, এখন সেসব দেশে খ্রিষ্টান ফ্যাসিবাদী দলের আবির্ভাব ঘটেছে। পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিত্বও আছে। বর্ণবাদী দলও আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের জয়জয়কার। শ্রীলঙ্কায় হিন্দু-বৌদ্ধ মৌলবাদী দল খুবই শক্তিশালী। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় মুসলিম লীগও রয়েছে। সংসদে তাদের প্রতিনিধি রয়েছে। মন্ত্রী পর্যন্ত আছেন।" অন্যত্র লিখেছেন- তা ছাড়া বাস্তবতা হলো, এখনো ইসলামি মৌলবাদী রাজনীতির সমর্থক বাংলাদেশে পাঁচ-ছয় শতাংশের বেশি নয়, যদিও সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামি পর্যাপ্ত।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই স্ব-বিরোধিতা আছে। তাছাড়া "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অত্যন্ত জঘন্য রাজনীতি আজকের সময়ে এ কথা না যত সহজে কতিপয় ইতিহাস বিকৃতকারী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিরা বলে ফেলেন ইসলামের বিজয় ও সম্প্রসার কিভাবে হয়েছে তা একটু তাকিয়ে দেখেন না।

গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্ব যিনি হিন্দু জাতির মধ্যে সবচাইতে পরিপক্ব বুদ্ধির অধিকারী, তিনিও এ প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলতে থাকেন যে, ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির উৎস আগেও তরবারি ছিল এখনও তরবারিই আছে। আমাদের সৈয়দ আবুল মকসুদ আর গান্ধীজীর সুর ইসলামের ব্যাপারে এক ও অভিন্ন।

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) এর পরিচালিত আন্দোলন কতটুকু শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। রাসূল (সা.) তাঁর মহান শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক,

www.amarboi.org

গঠনমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে মোট ২৩ বছর সময় সব ক'টা যুদ্ধে সর্বমোট ১৫ হাজারের চেয়ে বেশি লোক রাসূল (সা.) এর মোকাবেলায় আসেনি এবং তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৭৫৯ জীবনকে পথ থেকে সরানোর মাধ্যমে আরবের কয়েক লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণরূপে শুধরে যায়।

আরবের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে তিনি যদি জয় করে থাকেন, তবে তাদের হৃদয়ই জয় করেছেন এবং তা করেছেন যুক্তি ও চরিত্রের অস্ত্র দিয়ে। অল্প দিনের মধ্যে দশ বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুলসংখ্যক আদম সন্তানকে ইসলামের অনুসারী বানানো কিভাবে সম্ভব হলো? আসল ব্যাপার হলো, দাওয়াত যদি সত্য ও সঠিক হয়, আন্দোলন যদি মানবকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং এর পতাকাবাহীরা যদি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান হয়, তবে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ বিপ্লবী কাফেলার জন্য অধিকতর সহায়ক হয়ে থাকে।

অথচ আমরা যদি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায়- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে কমপক্ষে দেড় কোটি লোক নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯০ লাখ ছিল সামরিক এবং ৭০ লাখ বেসামরিক। ত্রিপক্ষীয় আঁতাত হারায় ৫০ লাখের বেশি সৈন্য এবং সেন্ট্রাল পাওয়ার্স ৪০ লাখের বেশি। সামরিক মৃত্যু ৮৯,৫১,৩৪৬ বেসামরিক ৬৬,৪৪,৭৩৩ মোট ১,৫৫,৯৬,০৭৯ আহত ২,২৩,৭৯,০৫৩। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি হয় অগণিত মানুষ, তা জনগণের জন্য নিয়ে আসে অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনা। এ যুদ্ধে নিহত হয় ৫ কোটিরও বেশি মানুষ। বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলার। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অসংখ্য শহর আর গ্রাম, বিলুপ্ত হয়ে যায় মানবপ্রতিভার বহু মহান সৃষ্টি। ক্ষত রোগ আর অনাহারের দরুন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। তাহলে এখান থেকে সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবরা স্পষ্ট বোঝতে পারবেন কারা রক্ত পিপাসু ও জঘন্য আর কারা রক্তের মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছে বর্তমান সভ্যতার কে অঙ্গুলি দিয়ে সে হিসাব কষে দিয়েছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবদের কাজের ওপর পশ্চিমাদের মত অস্পষ্ট ভীতির মৌলবাদ নামের ধারণাটি ঢুকে পড়ছে। অথচ "মৌলবাদ" এ কথাটির সাথে গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে হিন্দুত্ববাদ, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতির। ইসলাম ও মৌলবাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট সম্পর্ক পাঠকদের মনে এ ধারণাই নিশ্চিত করে যে, ইসলাম ও মৌলবাদ একই ব্যাপার। ইসলামের বিশ্বাস, এর প্রতিষ্ঠাতা ও অনুসারীদের সম্পর্কে সাধারণীকরণ এবং ইসলামকে কিছু রীতিনীতি ও ছাঁচে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আসার এই যে প্রবণতা তা ইসলামের সাথে জড়িত প্রতিটি নেতিবাচক ব্যাপার কারণ হিসেবে বর্তমান।

www.amarboi.org

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, তার কাভারিং ইসলাম, গ্রন্থে লিখেছেন - পশ্চিমাদের মৌলবাদভীতি ১৯৯১ সাল থেকে আমেরিকান একাডেমি অব আর্ট এন্ড সায়েন্স তার ছাত্রছায়ায় গবেষণারত একদল গবেষক কর্তৃক 'মৌলবাদ' বিষয়ে আবিষ্কৃত মতামত প্রকাশ করছে ৫টি বিরাট খণ্ডে। যদিও ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা আছে, তবু আমার সন্দেহ ইসলামকে মাথায় রেখেই কাজটার সূচনা। সম্পাদকদ্বয় মার্টিন-ই ও স্টট এপলবাই। অনেক নামীদামি প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক এতে অংশগ্রহণ করেন, যার মোট ফলাফল হলো মনোগ্রাহী একগুচ্ছ অভিসন্দর্ভের সমাহার। কারণ অপসত্যের নিজস্ব সংজ্ঞা নেই। সুবিধাবাদীরা একে ধাওয়া করে বেড়ায় প্রতিনিয়ত।

'ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশই সামাজিক বিভক্তির করায়ত্ত, বস্তুগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে পশ্চিমের কাছে হীনম্মন্যতায় নিরাশ, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে মহাত্যক্ত, তার ক্ষোভ দ্বারা চালিত যাকে বার্নার্ড লুইস বলেছেন, 'ক্রোধের রাজনীতি'। তার বিষাক্ত পশ্চিমবিরোধিতা কেবল একট কৌশল নয়।

অথবা মুসলিমবিদ্বেষী ডানিয়েল পাইপ তিনি ইসলামকে 'জানেন' মর্মস্পর্শীভাবে ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার হিসেবে। তিনি দি ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের বসন্ত ১৯৯৫ সংখ্যায় একটি 'ভাবনা খণ্ডে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন এই শিরোনামে 'মধ্যপন্থী বলে কেউ নেই মৌলবাদী ইসলামের সাথে কারবার'। খণ্ডটির কোথাও তিনি মৌলবাদী ইসলামকে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অপরাধ থেকে রেহাই দেননি।

১৯৮৭ সালে জুলাইয়ের ৬ তারিখের ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট। ওখানে লেখা হয়, ইসলামী বিশ্বের প্রায় সবখানে ক্ষমাহীন ও অপরিবর্তনীয় মৌলবাদ জনপ্রিয় আবেগে পরিণত হয়েছে। তা পশ্চিমা বিশ্বকে বেকায়দায় পেয়ে গেছে, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ইসলাম ধর্মের মত্ত আবেগ এক হয়েছে ভয়ঙ্কর ফলাফল সৃষ্টির জন্য। এর থেকে সাবধান না হলে মৃত্যু অনিবার্য।

তিনি লিখেছেন "জামায়াত ও ইসলামি দলগুলো মানুষের শাসন মানে না। তারা আল্লাহর আইন চায়। অথচ মানুষ ও রাষ্ট্র নিয়েই সংবিধানের কারবার।" জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেব কি ভুলেই গেলেন সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান, সব মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সম্পদের সুষম বণ্টন, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবন মান উন্নত করে শোষণ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে

www.amarboi.org

তোলা ও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। আমি জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের কাছে জানতে চাই এ কাজগুলো কি মানুষের শাসনের সাথে সম্পৃক্ত নয়? আসলে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা আমাদের অনেকেরই মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার পরিবর্তনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলের অভ্যন্তরে পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চা করে আসছে। ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়মিত নেতৃত্বের পরিবর্তন, নেতৃত্বের বিকাশ, ও শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সক্ষম হয়েছে। গণতান্ত্রিক চর্চার কারণেই এখানে পরিবারতন্ত্রের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। দলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণে পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনা পদ্ধতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

একারণেই দেশের গণমানুষের অন্যতম একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রতিটি জাতীয় সংসদেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। তৃতীয় জাতীয় সংসদ হতে নবম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪টি আসন লাভ করে। আসলে এত এগিয়ে যাওয়ার কারণেই আমাদের আওয়ামী-বাম বুদ্ধিজীবীদের এ গা জ্বালা সৃষ্টি করেছে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সহিংসতা, দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও জামায়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সকল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সাত দলীয় জোট ও পাঁচদলীয় জোটের বাইরে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীই সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা প্রদান করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেয়। জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতি দমন, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসসহ জনদুর্ভোগ লাঘবের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ, হরতালের মত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাতীয় সংসদকে সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে জনস্বার্থে তৃতীয় ও পঞ্চম সংসদ হতে সদস্যগণ পদত্যাগ করেছিল। দেশের ইসলামী মূল্যবোধকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ইসলাম বিরোধী সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছে। আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে জামায়াতে ইসলামী সবসময় আপসহীন ভূমিকা পালন করেছে। যার মধ্যে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ, ট্রানজিট প্রদান, ফারাক্কার পানির ন্যায্য হিস্যা, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, টিফা ও পিআরএসপি

www.amarboi.org

চুক্তি, ঋণ চুক্তিসহ সকল প্রকার জাতীয় স্বার্থবিরোধী ইস্যুতে ভূমিকার ফলে জামায়াতে ইসলামী এখন জনগণের নিকট স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়েছে।

তিন লিখেছেন- "চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী ছিল মহা ভুল। ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে কথিত পরম বন্ধুদের পরামর্শে মুজিব সরকার, জিয়া সরকার ও এরশাদ সরকার সংবিধান পরিবর্তন করেছিল। তার ফল তাদের জন্যই অশুভ হয়েছিল।" জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেব ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে কথিত পরম বন্ধুদের পরামর্শে মুজিব সরকার, জিয়া সরকার ও এরশাদ সরকার যেমনি সংবিধান পরিবর্তন করেছিল। আর বর্তমানেও আপনাদের মত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শেই শেখ হাসিনার সরকার সংবিধান পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটিও একসময় মহাজোট সরকারের মহাভুল হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়।

www.amarboi.org

প্রত্যয় প্রকাশনী
প্রকাশিত বইসমূহ

- অধ্যাপক গোলাম আযম একটি বিপ্লবী চেতনার নাম
- মজলুমের কারাগার
- মজলুমের জবানবন্দী
- অজুহাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন
- বুলেটিন সিরিজ (বাংলা, ইংরেজী, সাধারণজ্ঞান)
- কবিরা গুনাহ্ (প্রকাশিতব্য)
- রিয়াদুস সালেহীন (প্রকাশিতব্য)
- এন্তেখাবে হাদীস (প্রকাশিতব্য)
- ইসাবেলা (অনুদিত উপন্যাস) (প্রকাশিতব্য)
- শহীদ আব্দুল মালেক (প্রকাশিতব্য)
- বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সংকলন (প্রকাশিতব্য)
- দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস (প্রকাশিতব্য)

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা
প্রত্যয় প্রকাশনী
৬৫ নিউ সার্কুলার রোড (৪র্থ তলা), মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা
টেলি ও ফ্যাক্স: ৯৩৩৯২৪৬, ০১৬৮৪ ৫১১৬৬৮
e-mail : prottoyprokashoni@gmail.com